সমষ্টি উন্নয়ন
ও
সম্প্রসারণ

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতী বুক স্টল
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
ভারতী বুক স্টলের পক্ষে
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ : ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

নিবেদন

পল্লী পুনর্গঠনের উৎস হিসেবে দেশের সর্বত্র সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়েছে। এত ব্যাপক আকারে গ্রাম উন্নয়নের সরকারী প্রয়াস এই প্রথম। পল্লীকে সঞ্জীবিত করে তোলার কথা আমরা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু কাজে আশানুরূপ এগোতে পারছি না। এই গুরু দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা গ্রামে যাচ্ছেন, উৎপাদন বাড়াবার কাজে যাঁরা সহায়ক হবেন, গঠন-মূলক কাজে যাঁরা হাত দিবেন তাঁদের সামনে এই গ্রন্থখানি তুলে ধরছি। তাঁরা যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগের ডেপুটি-ডাইরেকট্র) এই ধরণের একখানি বই লেখার জন্য আমাকে প্রথমে উৎসাহিত করেন। তাঁর নিয়মিত তাগিদ না থাকলে ছাপার আকারে বইটি হয়তো কখনই আত্মপ্রকাশ করতো না। বর্ধমান গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় মানসগোবিন্দ সেন মহাশয় এবং বন্ধু-প্রতিম সহকর্মী মুঃ গোলাম ছত্তার সাহেব এই গ্রন্থ বচনাকালে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সতর্কতা সত্বেও মুদ্রণ-প্রমাদ রোধ করা যায়নি। শুদ্ধি-পত্র দিতে বাধ্য হয়েছি। পাঠকদের কাছে এ-জন্যে আমি লজ্জিত।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী

সূচীপত্র

সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীন ভারতের অগণিত সমস্যা ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বিদায়ী ইংরেজ শাসকের হাতে ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেইদিন পত্তন। দেশেব নেতৃবৃন্দ শাসন-ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন পরের দিন ১৫ই আগষ্ট। জীর্ণ ও ভঙ্গুর আর্থিক কাঠামো, বিধ্বস্ত সমাজদেহ এবং হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভারত সেদিন স্বাধীন হয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতের পল্লীজীবনের দৈন্যদশার কোন তুলনা হয় না। অধিকাংশ লোক দু'বেলা পেটপুরে আহার পায় না। বহুলোকের বাসস্থান বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। রুগ্ন দেহ। শিক্ষার মান একেবারে নীচু। মৌলিক ভারি শিল্প ও ছোট শিল্প কোনটাই ইংরেজ আমলে গড়ে উঠবার তেমন সুযোগ পায়নি। ফলে, জীবিকা নির্বাহের জন্যে কৃষির ওপরে এ-দেশে নির্ভরশীল শতকরা ৭০টি পরিবার। আবাদী জমির ৪/৫ অংশে বছরে মাসচারেক কাজ করা চলে। কেননা কৃষকদের প্রধান ভরসা আকাশবৃষ্টি। দু'টি ফসল তোলবার মত সেচের জল পায় মাত্র ১/৫ অংশ জমি। বেকার অর্ধবেকারের সংখ্যা তাই বিপুল। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত পশ্চাদ্গামী। দুর্বল রেলওয়ে। প্রশস্ত রাজপথের সংখ্যা নগণ্য। দেশের জলশক্তিকে কাজে লাগানোর এবং বন্যানিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা হয়নি। যখন স্বাধীনতা এল তখন এই ছিল দেশের অবস্থা।

ইতালীয়ানদের জীবনমান নাকি বর্ডার লাইন ছুঁয়ে আছে। খুব উঁচুও না, খুব নীচুও না। অনেক পণ্ডিতের এই অভিমত।

(২) সারা বছরে যত সম্পদ দেশে সৃষ্টি হয় কৃষি থেকেই তার প্রায় অর্ধেক আসে।

(৩) এদেশের কতকগুলি শিল্প কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আমাদের বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, শর্করাশিল্প প্রসারের প্রধান কারণ সহজলভ্য তুলা, পাট ও আখ। পেণ্ট, বার্নিস, রং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠবার প্রধান কারণ তৈলবীজের প্রাচুর্য।

(৪) আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান পণ্য কৃষিজাত দ্রব্য। চা, তৈলবীজ, তামাক ও মশলা নিয়মিত বাইরে রপ্তানী হয়।

(৫) উন্নত কৃষির অর্থ হ'ল কৃষকদের আর্থিক সঙ্গতির উন্নতি। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে না।

(৬) শস্য উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি সরকারের বাজেট পরিকল্পনাকে দারুণ-ভাবে প্রভাবিত করে। যে বছর ফসল ভাল হয় না সে বছর সরকারের আয় যায় কমে, ব্যয় যায় বেড়ে। জনসাধারণ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে।

যে-দেশে কৃষির ভূমিকা সর্বোচ্চ সেখানে চাষ-আবাদ চলছে সেই সনাতনী পদ্ধতিতে। বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছি আমরা খুবই কম। তাই গ্রামে গ্রামে এত খাদ্যাভাব, এত অনটন।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণা

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতকে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়।

বৃটিশ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ভারতে সাধারণ নাগরিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। কল্যাণ বলতে স্বভাবতই মনে আসে দেশজোড়া দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অবসান, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সবার জন্যে সমান সুযোগ প্রাপ্তির পথ খুলে দেওয়া। সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) তাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি সুন্দর কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

....to secure to all its citizens :
'Justice, social, economic and political ;
Liberty of thought, expression, belief, faith and worship ;
Equality of status and of opportunity ;
and to promote among them all
Fraternity assuring the dignity of the individual
and the unity of the Nation.'

অর্থাৎ রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের জন্যে সংরক্ষিত করবে :

"সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ;

চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা ;

আইনের কাছে সকলের সমান মর্যাদা এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ। এ-ছাড়া সকলের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ ও ব্যক্তির প্রতি মর্যাদাবোধ যাতে দানা বেধে ওঠে তার জন্যে রাষ্ট্র সতত চেষ্টা করবে।"

সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights : Art. 14 to 35) ও নির্দেশক নীতির (Directive Principles : Art. 38 to 48) আলোচনায় এই কথাকেই আরো পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে যে যে পন্থা অবলম্বন করতে হবে এই নীতিগুলিতে তারই নির্দেশ আছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সব সময় হুঁশিয়ার রাখার জন্যেই এই নীতি।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায়, যেখানে সকল নাগরিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ন্যায়বিচার পাবে। নারী-পুরুষ উভয়েই আপন মর্যাদায় জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাবে। একই ধরণের কাজে, নারী ও

পুরুষ সমান মজুরী পাবে। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল হবে। সকল প্রকার শোষণের আওতা থেকে বালক-বালিকাদের রক্ষা করা হবে। দেশের সম্পদে মালিকানা এবং সম্পদ বিভাজনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে করার চেষ্টা থাকবে, যেন তা প্রকৃতই জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে। অর্থনৈতিক উন্নতির গতি এমন হবে না যার ফলে দেশের সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ জনস্বার্থের বিরোধী হয়ে উঠবে। বহু অন্তরায় ও অসুবিধা থাকা সত্বেও নাগরিকদের নিম্নলিখিত সুযোগ করে দেবার জন্যে নিয়মিত প্রয়াস করতে হবে—প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা, কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া, বেকার-ভাতা, বার্ধক্যে ও অক্ষমতায় সাহায্য এবং ব্যাধিতে চিকিৎসার সুযোগ দান। কৃষি শিল্প ইত্যাদি যে কাজেই লোক নিযুক্ত থাকুক চলনসই জীবন-যাত্রার উপযোগী মজুরী যেন প্রত্যেকে পায় সেদিকে নজর রাখা হবে। বিশ্রামের সুযোগ এবং মনোরঞ্জনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অনুন্নত ও পাহাড়ী জাতির আর্থিক স্বার্থরক্ষায় ও শিক্ষাবিস্তারে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে যেন তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার না হয়। রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ হবে—কৃষি ও পশুপালনে দ্রুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রোগ্রামকে রূপায়িত করা, পল্লীতে পল্লীতে সমবায় ও কুটিরশিল্প গড়ে তোলা এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের এই ছবি আমাদের সংবিধানে আঁকা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন, এমন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হ'লে আমাদের কী ভাবে এগোতে হবে। সুপরিকল্পিত অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া যে দ্বিতীয় পথ নেই সে বিষয়ে অধিকাংশ লোকই একমত।

সুপরিকল্পিত অর্থনীতির কথা :

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিক সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই প্ল্যানিং। সম্মিলিত চেষ্টায় আর্থিক কাঠামোকে সর্বতোভাবে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যই পরিকল্পনার প্রয়োজন। ধনপতি বা পুঁজিপতিদের মুনাফা-লোলুপতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করাই প্ল্যানিং নয়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় :—

১। সামাজিক ও আর্থিক জীবনকে কী ভাবে গড়ে তুলতে চাই এবং তার জন্যে কোন্ নীতি অনুসরণ করা হবে তা স্পষ্টভাবে বলা। অস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোন পরিকল্পনা রচনা করা যায় না।

২। দেশের সম্পদ ও সম্বলের পরিমাণটা যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং সেগুলির যথাযথ বিনিয়োগ করা।

৩। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে পরস্পর সমতা বজায় রাখা।

৪। টার্গেট স্থির করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টার্গেটে পৌছাবার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অর্থনীতির অধিকাংশ পণ্ডিতদের চিন্তা ছিল প্ল্যানিং-বিরোধী। তাঁদের বক্তব্য ছিল—কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্র থাকবে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শাসন করা এবং দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাই সরকারের একমাত্র কাজ। জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে নাক গলিয়ে নাগরিকদের কর্মোদ্যমকে প্রতিহত করা গভর্নমেন্টের উচিত নয়—এই ছিল তাঁদের ধারণা। রুশ-বিপ্লব গোটা বিশ্বে নতুন চিন্তা-স্রোত নিয়ে এল। ১৯২৯-৩০ সালে মন্দাবাজারের তরঙ্গ সারা বিশ্বে বয়ে গেল। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচণ্ড আঘাত খেল। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনায়ক ও অর্থনীতির পণ্ডিতগণ কতকগুলি ব্যাপারে স্টেট কন্ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায়

পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্ববাসীর মনোভাব প্ল্যানিং-এর অনুকূলে নিয়ে যায়।

ভারতে অর্থনৈতিক প্ল্যানিং-এর আইডিয়া সর্বপ্রথম গুছিয়ে প্রকাশ করেন স্যার এম্, বিশ্বেশ্বরাইয়া (Sir M. Visveswarya)। ১৯৩৪ সালে তাঁর 'Planned Economy For India' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। দশবছরের উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামের এক রূপরেখা তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। ১৯১৪-১৮ সালে তিনি ছিলেন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান। সুপরিকল্পিত ভাবে কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে এই সময় হাত দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠন করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন যথেষ্ট বাধাবিপত্তি সত্বেও কমিটি যুদ্ধের পরে রিপোর্ট প্রকাশ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পন্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

১। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এবং আঞ্চলিক স্বাবলম্বন।

২। প্রধান প্রধান শিল্পের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্পের জন্যে স্বায়ত্তশাসিত ট্রাস্ট গঠন।

৩। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-উন্নয়ন।

১৯৪৪ সালে বৃটিশাধীন ভারত সরকার একটা নতুন বিভাগ খোলেন যার নাম—প্ল্যানিং ও উন্নয়ন বিভাগ (Planning and Development Department)। যুদ্ধশেষে সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি (Post war Reconstruction Committee) গঠন করেন।

বোম্বে প্ল্যান (Bombay Plan) :—

১৯৪৪ সালে দেশের আটজন প্রধান শিল্পপতি মিলিতভাবে

পরিকল্পনার এক খসড়া প্রণয়ন করেন যা বোম্বে প্ল্যান নামে পরিচিত। দশহাজার কোটি টাকা লগ্নী ক'রে ১৫ বছরে মাথাপিছু গড় আয় দ্বিগুণ ও জাতীয় আয় তিনগুণ করার এক ছবি এই প্ল্যানে তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের গণ্ডী কতদূর প্রসারিত হওয়া উচিত তার একটা আভাসও দেওয়া হয় এবং দেশের অর্থনীতি-বিদদের নিয়ে কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

গান্ধীয়ান প্ল্যান (Gandhian Plan) :—

শ্রী এস্, এন্, আগরওয়াল একখানি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। দশ বছরে ৩৫০০ কোটি টাকা লগ্নী করার প্রস্তাব তিনি দেন। ভূমির জাতীয়করণ, প্রকৃত চাষীর মধ্যে তা বিতরণ এবং কুটিরশিল্প প্রসারের এক পরিকল্পনা গান্ধীয়ান প্ল্যানে প্রকাশ করা হয়।

পিপল্‌স্ প্ল্যান (People's Plan) :—

শিল্পপতিদের জবাবে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ভারতীয় মজতুর ফেডারেশন ১০ বছরের উপযোগী এক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। ১৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ বছরে জীবনযাত্রার মান তিনগুণ বৃদ্ধি করার কথা এতে বলা হয়। কৃষিতে কলেক্‌টিভ্‌ ফারমিং, জমি ও খনির জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই এইভাবে প্ল্যানিং-এর দিকে জনমত গঠিত হয়ে যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতির আশ্রয় না নিলে যে দেশের ভূমি-সম্পদ ও নদী-সম্পদ ঠিকভাবে মানবকল্যাণের কাজে লাগানো যাবে না, প্রচলিত কৃষি-পদ্ধতির মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচলন ও সহজলভ্য সেচের ব্যবস্থা করা দুরূহ হবে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং দেশের সকল অংশে বৃহৎ শিল্প সমভাবে গড়ে উঠবে না—এ বিষয়ে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ—

ভারত সরকার ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠন করেন। উন্নত জীবনযাত্রায় গণতান্ত্রিক উপায়ে পৌঁছবার উপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই কমিশনের ওপরে। পরের বছর জুলাই মাসে কমিশন দেশবাসীর সামনে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রোগ্রামের সমষ্টিরূপে দেখলে ভুল হবে। পর পর কয়েকটি প্ল্যানের ভিতর দিয়ে ২০ বছরে দেশবাসীর মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করার একটা পথনির্দেশ করেছেন কমিশন। জাতীয় আয় ১৯৭১-৭২ এর মধ্যে এবং মাথাপিছু গড় আয় ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে দ্বিগুণ করা হবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ চালু হবার পরে কমিশন আশা প্রকাশ করেছেন—১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যেই জাতীয় আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কিন্তু মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতে আরো পাঁচ বছর সময় লাগবে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ হবে। কৃষির ওপরে শতকরা ৭০ জন লোক নির্ভরশীল ; এই অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে অন্তত ৬০ জন করা হবে। জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগের জায়গায় ১৮ ভাগ বিশ বছরে লগ্নী করতে না পারলে মাথাপিছু আয় ২৮২ টাকা (১৯৫৫-৫৬) থেকে ৫২০ টাকায় (১৯৭৬) পরিণত করা দুঃসাধ্য হবে বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন। ২৫ বছরে জাতীয় আর্থিক বিকাশের একটা চিত্র কমিশন সবার সামনে তুলে ধরেন।

গণতান্ত্রিক নীতিতে দেশজোড়া প্ল্যানিং এর কাজ কাঁদা বেশ শক্ত ব্যাপার। অধিকাংশ লোককে উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে টেনে নেওয়া, আবার ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখা, পাব্লিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টর, জাতীয় প্ল্যান ও স্থানীয় কর্তৃত্ব—এ সবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা এক জটিল সমস্যা। পরিকল্পনা তৈরী ও

রূপায়নের দিকে গোটা দেশবাসী সক্রিয় হয়ে উঠুক গণতান্ত্রিক প্ল্যানিং-এর এটাই বড় কথা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : মেয়াদ ১লা এপ্রিল ১৯৫১ হ'তে ৩১শে মার্চ ১৯৫৬ :

প্রথম পাঁচশালা যোজনার লক্ষ্য ছিল :—

১। যুদ্ধোত্তর দুর্বল আর্থিক কাঠামোকে সবল করে তোলা, মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করা; পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন; খাদ্যের চাহিদা ও শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

২। উন্নয়ন প্রোগ্রাম রচনা ও রূপায়ণের চেষ্টা এমন ভাবে করা যার ফলে প্রাথমিক বুনিয়াদ যেন দৃঢ় হয়; কেন না পরবর্তী উন্নয়ন প্রোগ্রাম প্রথম ভিত্তির ওপরেই দাঁড় করাতে হবে।

৩। সংবিধানের নির্দেশক নীতি অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার মূলক কর্মধারা গ্রহণ।

৪। পরিকল্পনা রূপায়ণের উপযোগী ক'রে সরকারী শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন।

বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং মূলভারি শিল্পের সুসম বিকাশই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে রাখা হয়। চাষ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

দুইভাগে ভাগ করে আমাদের পরিকল্পনাগুলির ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে—পাব্লিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টর। পাব্লিক সেক্টরে দেখা যায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সেচে ব্যয়িত হবে। তার প্রায় ২৩.৫ অংশ ব্যয় হবে রেলওয়ের উন্নতিতে। প্রথম প্ল্যানে শিল্পোন্নতির দায়িত্ব প্রাইভেট সেক্টরের হাতেই প্রধানত ছেড়ে দেওয়া হয়; সরকার মোট ব্যয়ের মাত্র ৮% নিজ তত্ত্বাবধানে শিল্পের জন্য ব্যয় করবেন বলে স্থির করেন। বাকী ২৩% সমাজকল্যাণ মূলক কাজে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ব্যয়িত হবে বলে ঠিক করা হয়।

প্রথম প্ল্যানে যে যে কাজ করা হয়েছে :—

১। পল্লী পুনর্গঠনের জন্যে সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম এই সময় গৃহীত হয়। জমিদারী ও মধ্যসত্ব লোপ ক'রে কৃষকদের সংগে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অনেক রাজ্যেই কৃষি-জমির উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

গ্রামপঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির সাহায্যে পল্লীগঠনের নীতি গৃহীত হয়। সারা দেশময় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২। কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য ৬টি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড স্থাপন করা হয়।

৩। অনুন্নত জাতিদের কল্যাণের জন্য কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৪। ৪৬৮টি বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়; এই কাজে ৫৫০ কোটি টাকা নির্ধারিত করা হয়। তাছাড়া ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নলকূপ বসানো ও ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

৫। কলকারখানায় শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন বেঁধে দেওয়া হয়। (Industries Regulation and Control Act of 1951).

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : মেয়াদ ১লা এপ্রিল ১৯৫৬ হ'তে ৩১শে মার্চ ১৯৬১ :

অর্থব্যয় বরাদ্দের হিসাবে দ্বিতীয় প্ল্যান প্রথম প্ল্যানের দ্বিগুণ। পাব্‌লিক সেক্টরে মোট ব্যয় হয় ৪৬০০ কোটি টাকা এবং প্রাইভেট সেক্টরে ৩১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে থেকে কল্যাণমূলক কাজে উভয় সেক্টরে ১০০০ কোটি টাকা ক'রে ব্যয় করা হবে বলে স্থির করা হয়। প্রথম পরিকল্পনা কালে আরব্ধ উন্নয়ন কাজের ধারাই দ্বিতীয় প্ল্যানে মোটামুটি বজায় থাকে; তবে মৌলিক শিল্পের উন্নতি, বিশেষত ইস্পাতশিল্পের ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

লক্ষ্য হিসাবে বলা হয় :—

(১) জীবনমান উন্নয়নের সংগে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি

(২) মৌলিক শিল্পের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও দ্রুত শিল্পায়ন

(৩) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ : ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান

(৪) সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য কমানো এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার যথাসম্ভব সুসম বণ্টন।

ভারতের পল্লীজীবন নতুন ক'রে গড়ে তোলা, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা, জনগণের মধ্যে যারা দুর্বল ও অনগ্রসর তাদের সম্ভবপর সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া এবং দেশের সকল অংশের যথাযথ উন্নতি সাধনের কথা এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্ল্যানে পাব্‌লিক সেক্টরে প্রথমে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয় ৪৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু প্ল্যান অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হবার পর কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়—

১। দেশের পূর্বাঞ্চলে ধানের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম হয়, ফলে ধান-চালের বাজার চড়তে থাকে ;

২। যেসব দেশে মেশিন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সেখানে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয় ;

৩। সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব নিয়ে মিশরের সংগে পশ্চিমী শক্তির সাময়িক লড়াই।

এইসব কারণে প্রোজেক্টগুলির ব্যয় বেড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। ফলে, প্ল্যানিং কমিশন সকল দিক বিবেচনা করে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের কোন রদবদল করা হয়নি। প্রথম প্ল্যানে শিল্প, খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ এই চারটি খাতে গোটা প্ল্যানের ⅓ অংশ ব্যয় হয়; দ্বিতীয় প্ল্যানে এই খাতে অর্ধেক ব্যয় হয়। উভয় প্ল্যানেই গোটা

ব্যয়-বরাদ্দের $\frac{১}{৫}$ অংশ জনকল্যাণ বাবদ ব্যয় করা হয়। প্রথম প্ল্যানে সেচের দরুণ $\frac{১}{৩}$ অংশ ব্যয় করা হয়; দ্বিতীয় প্ল্যানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল $\frac{১}{৫}$ অংশ। জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ প্রথম প্ল্যানে লগ্নী করা হয়; দ্বিতীয় প্ল্যানে লগ্নীর পরিমাণ ছিল ১০ ভাগ। সঞ্চয়বৃদ্ধি ও শিল্পপ্রসারের ওপরে দ্বিতীয় প্ল্যানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশের $\frac{১}{৩}$ অংশ গ্রাম সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আওতায় আনা হয়। অর্থসংগ্রহের তাগিদে সরকারকে ৫০০ কোটি টাকা ট্যাক্সবৃদ্ধি করতে হয়। দ্বিতীয় প্ল্যানে নতুন আরো ১৯৫টি সেচ-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: মেয়াদ ১লা এপ্রিল ১৯৬১ হ'তে ৩১শে মার্চ ১৯৬৬:

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ মনে করেন, যে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তার ভিত গাঁথার কাজ শেষ হবে।

লক্ষ্য:

প্রথম দুই প্ল্যানের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় প্ল্যানের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। চাষ-আবাদ ও কলকারখানা দুইএর ওপরই সমান জোর দিয়ে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে:—

১। পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা।

২। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিল্পের জন্যে কাঁচামাল উৎপাদন ও রপ্তানী করা।

৩। ইস্পাত, জ্বালানী শক্তি, মেশিন তৈরীর কারখানা ইত্যাদি এমনভাবে সম্প্রসারণ করা যার ফলে পরবর্তী দশবছরের শিল্পায়ণ আভ্যন্তরীণ সম্পদে নির্ভর করেই সম্পন্ন করা যাবে।

৪। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো এবং সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করা। কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজে প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং কৃষিতে আরো ৩৫ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ দান।

৫। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুসম বিভাজন।

সরকারী খাতে পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

১৯৬০ কোটি	৪৬০০ কোটি	৭৫০০ কোটি
২৯১	৫২৯	১০৬৮
৩১০	৪২০	৬৫০
২৬০	৪৪৫	১০১২
৪৩	১৭৫	২৬৪
৭৪	৯০০	১৫২০
৫২৩	১৩০০	১৪৮৬
৪৫৯	৮৩০	১৫০০
১ম পরি	২য় পরি	৩য় পরি
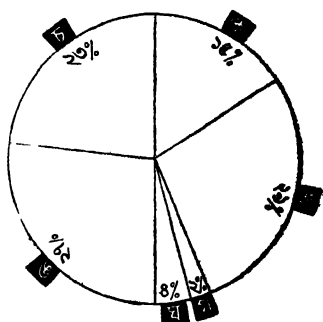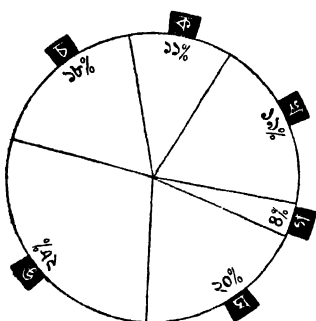
১ম পরিকল্পনা

২য় পবিকল্পনা
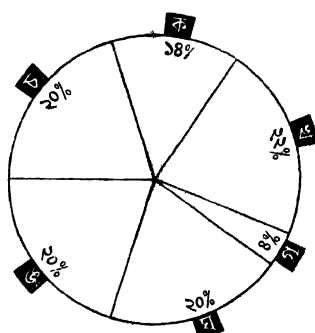
৩য় পরিকল্পনা

(ক) কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন (Agriculture and Community Development)

(খ) { সেচ (Irrigation)
শক্তি (Power)

(গ) কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (Village and Small Industries)

(ঘ) বৃহৎ শিল্প ও খনি (Industries and Minerals).

(ঙ) যোগাযোগ ও পরিবহন (Transport & Communication)

(চ) সমাজ কল্যাণ ও বিবিধ (Social Services and Misc.)

ব্যয়বরাদ্দ ঃ

তৃতীয় যোজনায় পাব্‌লিক সেক্টরে ৭৫০০ কোটি এবং প্রাইভেট সেক্টরে ৪১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এ-ছাড়া কৃষির উন্নতি জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বাবদ তৃতীয় প্ল্যানের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৯০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। প্রথম প্ল্যানে এই খাতে ৬০ কোটি এবং দ্বিতীয় প্ল্যানে ১৩২কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল।

টার্গেট ঃ

তৃতীয় যোজনায় খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১০৫ মিলিয়ন টন হবে ; যতই বিঘ্ন আসুক, ১০০ মিলিয়ন টনের কম না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হবে। ১৯৬৩ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক খোলার কাজ শেষ হবে। ইস্পাত, বিভিন্ন মেশিন তৈরীর কারখানা, জ্বালানী শক্তি ইত্যাদি মূল শিল্পে পূর্বের মত গুরুত্ব দেওয়া হবে। তৃতীয় যোজনায়, লৌহ ও ইস্পাত তৈরী হবে ৯.২ মি. টন এবং লৌহপিণ্ড হবে ১.৫ মি. টন। দ্বিতীয় যোজনায় কয়লা উঠেছিল ৬০ মি. টন, তৃতীয় যোজনায় ৯৭ মি. টনে পরিণত করা হবে। নাহারকাটিয়ার ক্রুড পেট্রোলিয়াম উত্তোলন কেন্দ্র এবং নুনমাটি ও বারাউনির শোধনাগারের কাজ শেষ করা এবং কম্বেতে পেট্রোলিয়াম সন্ধানের কাজ সুরু করা হবে। আশা করা হয়েছে যে এই যোজনার শেষে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে ১২.৫ মিলিয়ন কিলো ওয়াট ; দ্বিতীয় যোজনায় ছিল ৫.৮ মি. কিলো ওয়াট। এই প্রোগ্রামের মধ্যে নিউক্লিয়র শক্তি উৎপাদনেব ০.৩ মি. কিলো ওয়াট ধরা হয়েছে। ৬ থেকে ১১ বয়স্ক ছেলেমেয়ের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পরিবার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় যোজনায় ব্যয় হয়েছিল ৫ কোটি টাকা, তৃতীয় যোজনায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। দ্বিতীয় যোজনায় অর্ধেক হেল্‌থ্‌ সেণ্টারে পরিবার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল, তৃতীয় যোজনায় সকল সেণ্টারেই এই ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিক যোজনায় বৈদেশিক মুদ্রার সহায়তা

দ্বিতীয় যোজনায় বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্য কিভাবে এসেছিল তার একটি হিসাব দেওয়া হল। প্রথমে মজুত স্টার্লিং থেকে ৫৪০ কোটি টাকা প্রথম তিন বছরেই আমরা ব্যয় করে ফেলি। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, কলম্বো-প্ল্যানভুক্ত বিভিন্ন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের নিকট হতে আমবা নানারকম ঋণ ও দান হিসেবে সাহায্য পাই। তৃতীয়—রেলওয়ে, পোর্ট ও অন্যান্য কতকগুলি প্রোজেক্টের ব্যয়নির্বাহের জন্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৮১.৯৪ কোটি টাকা ঋণদানের প্রতিশ্রুতি দেয়; তার মধ্যে ২৩৮.৯৮ কোটি টাকা কাজে লাগানো হয়। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রকফেলার ফাউণ্ডেশন হতেও ঋণস্বরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনার সাফল্য এবং তৃতীয় যোজনা সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে দেওয়া হল।

ইস্পাত ঃ

প্রথম যোজনায় ইস্পাতপিণ্ড তৈরী হয়েছিল ১৭ লক্ষ টন। দ্বিতীয়তে হয়েছে ৩৫ লক্ষ টন, টার্গেট ধরা ছিল ৬০ লক্ষ টন। তৃতীয়তে হবে প্রায় ৯৫ লক্ষ টন।

চিত্তরঞ্জনে রেলের ইঞ্জিন তৈরীর কারখানায় এখন মাসে ১৪-১৫টি রেল ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। পেরাম্বুরের রেল-কামরা তৈরী-করার কারখানায় প্রতি ছ ঘণ্টায় একটা যাত্রীবাহী রেল-কামরা তৈরী হচ্ছে। তৃতীয় যোজনায় এই উৎপাদন দ্বিগুণ করা হবে এবং এছাড়া প্রতিমাসে ছটি করে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনও তৈরী হবে।

কয়লা ঃ

প্রায় ১০২ কোটি মণ কয়লা তোলা হয়েছে প্রথম যোজনায়। দ্বিতীয় পর্বে ১৪৮ কোটি মণ তোলা হয়, টার্গেট ছিল ১৬২ কোটি

বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থসহায়তার হিসাব*

(কোটি টাকায় হিসাব)

যে যে দেশের গভর্ণমেণ্ট ও প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পাওয়া গেছে ১	সুরু থেকে ৩০-৬৬০ সাল পর্যন্ত প্রতি-শ্রুতি পাওয়া গেছে ২	৩০-৬-৬০ সাল পর্যন্ত যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে ৩	৩০-৬-'৬০ পর্যন্ত যে টাকা অব্যয়িত থাকে ৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার	১,৩০৫'২৬	৩৪১'৭৯	৯৬৩'৪৭
সোভিয়েট রাশিয়া "	৩২৩'৭২	৬৫'৮৬	২৫৭'৮৬
গ্রেটবৃটেন "	৮৭'৮০	৮৬'৩১	১'৪
কানাডা "	৯৫'৬৬	৮৩'৫২	১২'১৪
অস্ট্রেলিয়া "	১২'২৭	১১'৩৫	০ ৯২
নিউজিল্যাণ্ড "	৩'৪৩	৩'২২	০'২১
পশ্চিম জার্মানী "	১১০'১৫	৭৫'০৩	৩৫'১২
জাপান "	২৭ ৬১	৫ ১৮	২২'৪৩
নরওয়ে "	১'৬৬	১'৬৬	—
রুমানিয়া "	৫'৩০	—	৫'৩০
চেকোশ্লোভাকিয়া "	২৩'১০	—	২৩'১০
উগোশ্লোভিয়া "	১৯'০৫	—	১৯'০৫
পোল্যাণ্ড "	১৪'৩০	—	১৪'৩০
বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের মোট সাহায্য—	২,০২৯'৩১	৬৭৩'৯২	১,৩৫৫'৩৯
I. B.R.D.+থেকে ঋণ বিশ্বব্যাঙ্ক	২৮১'৯৪	২৩৮'৯৮	৪২'৬৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ	৭৭'৩৩	১৮'৬২	৫৮'৭১
গ্রেটবৃটেন থেকে দুর্গাপুরের জন্য ঋণ (Lazard credit)	১৫'৩৩	১৩'৩৩	২'০০
ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের দান	১৩'৯০	৬'০৮	৭'৮২
মোট বেসরকারী সাহায্য	৩৮৮'৫০	২৭৭'০১	১১১'৪৯
মোট—	২,৪১৭'৮১	৯৫০'৯৩	১,৪৬৬'৮৮

*Planning in India by V. T. Krishnamachari, (Pages 17—18)-

+International Bank for Rehabilitation and Development.

মণ। তৃতীয় পর্বের টার্গেট স্থির করা হয়েছে প্রায় ২৬০ কোটি মণ।

সেচব্যবস্থা ঃ

১৬ কোটি ২৬ লক্ষ বিঘা জমিতে সেচ দেবার মত ব্যবস্থা প্রথম পরিকল্পনায় করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে সেচ-জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ কোটি বিঘা। তৃতীয় পর্বে ৬ কোটি বিঘা বৃদ্ধি করে সেচ-জমির পরিমাণ ২৭ কোটি বিঘা হবে।

বিদ্যুৎ-সরবরাহ ঃ

প্রথম যোজনায় ৭৪০০ গ্রাম ও মফঃস্বল শহরে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যোজনায় ১৯০০০ শহরে ও এবং তৃতীয়তে আশা করা যাচ্ছে প্রায় ৩৪০০০ সহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। পাঁচ হাজার অধিবাসী-বিশিষ্ট ভারতের প্রত্যেক গ্রাম ও শহর তৃতীয় যোজনার শেষে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবে।

পথঘাট ঃ

প্রথম যোজনার শেষে পথঘাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২২ হাজার মাইল। দ্বিতীয় যোজনায় যোগ হয় ২২০০০ মাইল এবং তৃতীয় যোজনাকালে আরো ২১০০০ মাইল যোগ হবে; ফলে তৃতীয় যোজনার শেষে পথের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬৯ হাজাব বর্গমাইল।

সার-উৎপাদন ঃ

রাসায়নিক সার উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৫০ সালে নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল দশ হাজার টন। সেটা ১৯৬৩-৬৪ সালে বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার টন। ফসফরিক এ্যাসিডের উৎপাদন ৪ হাজার ৫ শত টন (১৯৪৬) থেকে বেড়ে ১৯৬৩-৬৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার টন। পটাশ সার সবটাই বাইরে থেকে এখনও আমদানী করতে হচ্ছে। *

---

* Fertiliser News, Feb. 1964

জনস্বাস্থ্য ঃ

প্রথম পরিকল্পনায় সারা ভারতে হয়েছে ছোট-বড় ১০০০০ হাজার হাসপাতাল আর ডাক্তারখানা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হয়েছে ১২৬০০টি, আর তৃতীয়তে হবে ১৪৬০০টি।

প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৪৭টি। দ্বিতীয় পর্বে হয়েছে ১৬০৯টি এবং তৃতীয় পর্বে হবে ৮২০০টি।

লেখাপড়া ঃ

প্রথম পর্বে সাধারণভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ জন। দ্বিতীয় পর্বের শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ। তৃতীয় পর্বে সুযোগ পাবে ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ জন। ১৯৫১ সালে ১৯০ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো; ১৯৬১ সালে ৩৪০ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫০০ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।

পাঁচশালা যোজনাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে কবছি। শুধু তথ্য আর সংখ্যার হিসাবে মানবকল্যাণের পরিমাণ সঠিক করা যায় না; একটা আভাসমাত্র দেওয়া যায়। সকল যোজনাগুলি পরস্পর একই সূত্রে গাঁথা। ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক যোজনার কর্মসূচী রচিত হয়েছে; কাজেই একটির সংগে অপরটি জড়িত। তাই আর্থিক কাঠামোর ক্রমোন্নতির ধারা বজায় রাখার জন্যে পরবর্তী যোজনা আগের চেয়ে ক্রমে বেশী হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশেও তাই হয়েছে। প্রথম পাঁচশালায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেটাই ক্রমবিকাশ লাভ ক'রে তৃতীয় পরিকল্পনার সমৃদ্ধতর পটভূমি রচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি পরিকল্পনা আদর্শ অনুযায়ী

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের টার্গেট ও সাফল্যের পরিমাণ *

		প্রথম পাঁচশালা		দ্বিতীয় পাঁচশালা		তৃতীয়ের টার্গেট
শস্য	যোজনা আরম্ভের আগের বছর)Base year) ১৯৪৯-৫০	টার্গেট ১৯৫৫-৫৬	সাফল্য ১৯৫৫-৫৬	টার্গেট ১৯৬০-৬১	সাফল্য ১৯৬০-৬১	টার্গেট ১৯৬৫-৬৬
খাদ্যশস্য	৫৪.০০ মি. টন (১৯৫০-৫১)	৬১.৬০ মি. টন	৬৫.৭৯ মি. টন	৮০.৫ মি. টন	৭৯ ২৭ মি. টন	১০৫ মি. টন
তৈলবীজ	৫.০৮ মি. টন	৫.৪৮ „ „	৫.৬৪ „ „	৭.৬ „ „	৬.৫৩ „ „	৯.৮ „ „
আখ (গুড়)	৫.৬২ „ „	৬.৩২ „ „	৫.৯৮ „ „	৭.৮ „ „	৮.৬৯ „ „	১০.০০ „ „
তুলা ১ বেল ৩৯২ পাঃ	২.৯১ „ মি বেল	৪.১৭ „ বেল	৪ ০০ „ বেল	৬.৫ „ বেল	৫ ৩৯ „ বেল	৭.০০ „ বেল
পাট ১ বেল ৪০০ পাঃ	৩.২৮ „ „	৫.৩৭ „ „	৪.২০ „ „	৫.৫ „ „	৪.০৩ „ „	৬.২ „ „

* Agricultural Production since Independence, Ministry of Food & Agriculture, Govt. of India. [দৈনিক আনন্দবাজার—১৩ই জুলাই ১৯৬০ এবং Fundamental of Planning in India.]

রূপ দিতে পারলে আমাদের অনুন্নত আর্থিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সজীব ও সক্রিয় করে তুলবার জন্যে নিতান্ত যেটুকু জীবনমান থাকা প্রয়োজন আমাদের তা নেই। নারী-পুরুষ নিজেদের পরিপূর্ণ বিকাশ যাতে করতে পারে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এখনও সম্ভব হয়নি। উন্নত দেশগুলির অগ্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জাতীয় আয়ের ৮ থেকে ১৫ ভাগ বিনিয়োগ না করা পর্যন্ত আর্থিক কাঠামো ঠিক মজবুত ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। মনে হয় তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনায় আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হবে, ঝুঁকিও নিতে হবে ; তবে আর্থিক দিকটা সহজ হয়ে উঠবে।

প্ল্যানিং কমিশন (Planning Commission) :

১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ ভারত সরকারের এক প্রস্তাব অনুসারে প্ল্যানিং কমিশনে গঠিত হয়। কমিশনের ক্ষমতা ও কাজের ধরন এই প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—'The planning Commission will make recommendations to the Cabinet. In framing its recommendations, the Planning Commission will act in close understanding and consultation with the Ministers of Central Government and the Government of the States. The responsibility for taking and implementing decisions will rest with the Central and the State Governments.'

কমিশন পরিকল্পনার খসড়া সুপারিশের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে পেশ করবেন। কেন্দ্রের ও রাজ্যের মন্ত্রীদের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে পরিকল্পনা রচনা করবেন ; কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের যাবতীয় দায়িত্ব হবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের।

কমিশনের কাজ হবে দেশের বস্তুসম্পদ ও মনুষ্য সম্বলের পরিমাণ নির্ণয় এবং তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো, সরকারের আয়ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক দিকে কি নীতি অনুসৃত হবে স্থির করা, সরকারী প্রয়াস ও বে-সরকারী প্রয়াসের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ কবা এবং ক্রমশঃ সুষ্ঠু ও বৃহত্তর প্ল্যান তৈরীর পদ্ধতি আয়ত্ব করা, জনসহযোগিতা, মূল্যায়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।

প্রধানমন্ত্রী কমিশনেব চেয়ারম্যান। তা ছাড়া ৫ জন পূর্ণ ও ৪ জন আংশিক সদস্য বর্তমানে কমিশনে আছেন। সদস্যগণ সরকার মনোনীত ব্যক্তি। ক্যাবিনেটের সেক্রেটারীই এই কমিশনেরও সেক্রেটারী।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (National Development Council) :

প্ল্যানিং কমিশনের প্রস্তাবে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ-গঠন করেন। এই কাজ হবে :—

(ক) যোজনার বিভিন্ন দিক ও কাজেব গতি মাঝে মাঝে পর্যালোচনা।

(খ) সরকারের সামাজিক ও আর্থিক নীতি জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা দেখা।

(গ) প্রতিটি যোজনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং লক্ষ্যে পৌছবাব জন্য যা যা করণীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, প্রত্যেক বাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যগণ দ্বারা এই পর্ষদ গঠিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট

গ্রাম নিয়ে আমাদের দেশ। সাড়ে পাঁচ লক্ষ পল্লীকে সঞ্জীবিত করতে না পারলে পাঁচশালা পরিকল্পনাই করি, আর যাই করি, সবই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এই কারণেই জাতীয় লগ্নীব একটা বড অংশ পল্লী পুনর্গঠনেব দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যয় করা হচ্ছে। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন, রাসায়নিক সার উৎপাদন, ছোট, বড় ও মাঝারি সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ শিল্প, সমবায়, পল্লীতে বিদ্যুৎ সববরাহ ইত্যাদি খাতে প্রত্যেক যোজনাতেই মোটা টাকা ধবা হয়েছে। কৃষি ও শিল্প— উভয়ের উন্নতির দিকে সমান জোর না দিলে শিল্পবিপ্লবেব পথে আমাদের যাত্রা যে অব্যাহত থাকবে না, প্ল্যানিং কমিশন তা উপলব্ধি করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত উন্নয়ন প্রোগ্রামকে জনগণের প্রোগ্রামে পরিণত করার একটা আন্তরিক চেষ্টা চলছে। সমস্ত দিক বিচার করলে দেখা যায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্টকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিটি শব্দের অর্থ কি ?

কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে 'কমিউনিটি'র শব্দের অর্থ জানা দরকার। আমরা হালকা ভাবে নানা অর্থে কমিউনিটি শব্দের ব্যবহার করে থাকি ; যেমন—ধর্মগত অর্থে— হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি ; পেশাগত অর্থে—তন্তুবায়, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কংসকার ; ভাষাগত অর্থে—বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী, মারাঠী ; দেশগত অর্থে—রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান, জাপানী, ইত্যাদি। কমিউনিটির পরিবর্তে আমরা বাংলায় 'সম্প্রদায়' শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এতে সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না ; কেন না ধর্মগত, পেশাগত বা ভাষাগত কোন একটি বিষয়ে মিল থাকলেই কমিউনিটি গঠনের পক্ষে চূড়ান্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয় না।

জাতিগত বা শ্রেণীগত সামাজিক গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সম্পর্কেব চেয়ে কমিউনিটির পরিসর আরো বড়। সমাজ-জীবনের সকল দিক মিলে কমিউনিটির আকার নেয়। কোন এক জায়গায় অনেকদিন বাস. একইভাবে জীবনযাপন, একই ভাষা বলা, একই জাতীয় সমস্যাব সঙ্গে লডাই, একই রকম আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে এক একটি কমিউনিটি গড়ে ওঠে। এইভাবে পল্লীকে ঘিরে প্রথম কমিউনিটির সৃষ্টি হয়, কোথাও কোথাও নগরকে কেন্দ্র করেও কমিউনিটি গডে উঠেছে, তারপর দেখি এক একটা দেশ জুড়ে কমিউনিটি। অধ্যাপক R. M. Maciver বলেন, "Community menas *any circle of common life.* Common life is more than organisation or relationship. 'Community' properly signifies any whole area of social life, such as—village or town or country".* এই সমষ্টি-জীবনের উন্নতি সাধনকেই কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট বা সমষ্টি-উন্নয়ন বলা হয়। আমাদের দেশে সমষ্টি-উন্নয়নের অর্থ পল্লী-উন্নয়ন।

সমষ্টি-উন্নয়ন বা পল্লী-উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় ?

এদেশে শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। তাদের অধিকাংশই গরীব। এখানে জনসাধারণের দৈন্য-দুর্দশা যেমন বিস্ময়কর, গভর্ণমেণ্টের আর্থিক দুর্বলতাও তেমনি ভয়াবহ। প্রাচীন উৎপাদন রীতি আঁকড়ে থাকার ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি গেছে কমে, নতুন কাজে লগ্নী কবার মত টাকাও নেই। সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। বহু গ্রামে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের আলো ঢোকেনি। সমাজ-জীবন ছাড়া ছাড়া, কোথাও আঁট নেই, ভরসা নেই; দ্বেষ-হিংসা, মামলা-মোকদ্দমা ঘরে ঘরে ঢুকেছে। বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার মত জ্ঞান, সম্বল বা ব্যগ্রতা প্রায় নেই বললেই চলে।

*The Elements of Social Science, Pages 7-8.

তাদের নৈরাশ্যময় ও উদ্যমহীন আড়ষ্ট জীবনকে সক্রিয় করে তোলা সমষ্টি-উন্নয়নের প্রধান কাজ।

প্রথমেই বলেছি, বছরের কয়েকমাস কৃষকদের বেকার থাকতে হয়। এই বিপুল লোকশক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। সমষ্টি-উন্নয়নের এটা আর একটি প্রধান কাজ।

কোন কাজ নিজের চেষ্টা ছাড়া হয় না। পল্লীবাসীরা নিজের স্বার্থে তাদের সমস্যা সমাধানের পথ স্থির করবে এবং দল বেঁধে কাজে নামবে। সরকারের তরফ থেকে অর্থ-সাহায্য, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত অভিজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই হবে সমষ্টি-উন্নয়নের পদ্ধতি।

এ ধরণের কাজ সরকারের হুকুমে সম্পন্ন হতে পারে না। ত্রাস সৃষ্টি না করে লোককে বুঝিয়ে কাজে নামাতে হবে।

বিশ্বজাতি সংস্থার মতে জনসাধারণ ও সরকারের মিলিত চেষ্টায় সমষ্টি-জীবনকে উন্নত করার পদ্ধতিই সমষ্টি-উন্নয়ন প্রোগ্রাম। ভাত-কাপড়ে স্বচ্ছলতা এনে, পরিজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে মধুরতর সম্পর্ক স্থাপন করে, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মধ্যে মানবচিত্তকে প্রসারিত করে দিয়ে প্রাণবন্ত জাতীয় জীবন গড়ে তোলাই সমষ্টি উন্নয়ন। অতি সামান্য ও সুন্দর কথায় সমষ্টি উন্নয়নের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন কার্ল. সি. টেলর —'technically aided and locally organised self-help.' অর্থাৎ—

১। আপন সামর্থ ও সম্বল ভরসা করে পল্লীবাসী নিজের অবস্থা ফেরাতে দল বেঁধে কাজে নামবে।

২। এই জনপ্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়ে গভর্ণমেণ্ট সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। এই জনশক্তি ও রাজশক্তির মিলিত প্রয়াসই সমষ্টি উন্নয়ন।

সমষ্টি উন্নয়নে পল্লীবাসীর প্রতি আস্থা চাই :

জনশক্তি সচেতন ও সক্রিয় হ'য়ে গঠনমূলক কাজে নামলে

অসাধ্য সাধন করতে পারে—এই বিশ্বাসই সমষ্টি উন্নয়নের প্রাণ সম্পদ সৃষ্টির কাজে জনসাধারণ যদি নিজের টানে আত্মনিয়োগ করে এবং তাদের চাহিদা অনুসারে সরকারী সাহায্য পায় তবে জীবনযাপনের মান অল্পদিনেই উন্নত করা সম্ভব হবে।

সমষ্টি-উন্নয়ন কাজের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পল্লীর সকল পরিবারকে জড়িয়ে নিয়ে মিলেমিশে উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে নেওয়া। এতে পল্লীবাসীর মনে বল ও ভরসা ফিরে আসবে, হারানো আত্মবিশ্বাস তারা পুনরায় ফিরে পাবে, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। আমাদের পল্লীবাসী রুগ্ন, নিরক্ষর; তারা চির অভাবী এবং বৃহত্তর জগতের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অনেক সময় মনে হয় তারা অলস ও নিরুৎসাহ। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এর জন্য প্রধানত দায়ী। এসব থাকা সত্ত্বেও তারা ভাল করেই জানে কী তাদের প্রয়োজন। তাদের অভাবের কথা, চাহিদার তাগিদ বাইরের যে কোন লোকের পক্ষে ঠিকভাবে জানা শক্ত। তাই সমষ্টি উন্নয়নের মূলকথা, সব কাজে লোকশক্তির প্রাধান্য। স্থানীয় নেতৃত্বে হাজার হাজার গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক যখন সক্রিয়-ভাবে সমষ্টি উন্নয়নের কাজে অংশ নেবে তখন ভুল হবে কম এবং উন্নতি হবে দীর্ঘস্থায়ী। পল্লীবাসী যদি সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম নিজের বোলে গ্রহণ না করে এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে না চায় তাহলে বাইরের চেষ্টায় সত্যিকারের কল্যাণ করা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রের দণ্ডশক্তির জোরে কিছুটা ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খানিকটা বাইরের রং বদলানো যেতে পারে। কিন্তু, রাষ্ট্রের অধঃপতনের সংগে সংগে দেশের ও সমাজের পতন সুরু হবে। সমাজের সম্মিলিত শক্তি যেখানে প্রবল, সেখানে দেশের পতন সহজে ঘটতে পারে না।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য দেখিয়ে সাময়িকভাবে তাদের খুশি রাখা নয়, অথবা—কৃষি, সমবায়, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সরকারী বিভাগের হুকুম তামিল

করার এটা একটা অভিনব কৌশলও নয়। সমষ্টি উন্নয়ন পল্লীবাসীর নিজের কাজ। গোটা গ্রামের এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্ল্যান তৈরী ও রূপদানের চেষ্টা, প্রাচীন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সম্ভাবনা আছে এমন নতুন শিল্পের পত্তন তারাই করবে; সরকারের কাছে চাইবে প্রয়োজনীয় সাহায্য। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, রাস্তাঘাট তৈরী, অধিক ফসল ফলানো, বিপণ-ব্যবস্থা, ছোট শিল্প, গৃহ ও বিদ্যালয় নির্মাণ—এসব নিজেদের ব্যবস্থাপনাতেই গড়ে তোলা যায়। কিন্তু সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কেননা, **স্থানীয় সমস্যার দিকে সকলেরই টান থাকে বেশী**; আর এ-কাজ সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী ছাড়া বাইরের সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সঠিক বোঝাও সম্ভব নয়। এই কারণেই পল্লীবাসীর প্রতি আস্থা না থাকলে সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ ঠিকমত করা যাবে না।

উন্নয়ন-প্রচেষ্টা গ্রামভিত্তিক হবে কেন ?

সমাজ জীবনের অঙ্কুর যদিও পরিবারে, কিন্তু প্রথম সূত্রপাত গ্রামে। এক একটি লোকালয় এক একটি গ্রামের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা ও মিলিতভাবে ধনবৃদ্ধির চেষ্টা লোকালয়ের প্রধান আশ্রয়। গোটা দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে দেশের সমুদয় লোকবল ও বস্তুসম্পদ উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করতে হবে। আর সে কর্মযজ্ঞ যদি জনসাধারণের চাহিদা ও ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হয়, তবে ছোট ছোট জনগোষ্ঠী বা পল্লীকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার আছে। জনসাধারণের যা কিছু সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ ঘটেছে, তা পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট লোকালয়ের মধ্যে। পরিবারের গণ্ডির বাইরে প্রতিবেশীর প্রতি ভদ্রতা, সদিচ্ছা, দরদ ও

সৌজন্যপূর্ণ আবরণ পল্লীপরিবেশে যেমন বিকাশলাভ করেছে নগর-জীবনে তা নজরে পড়ে না। সামাজিক শব্দ দ্বারা যে ধারণা আজ আমাদের মনে ভেসে ওঠে, হাজার হাজার বছর ধরে পল্লীর জীবন-সাধনায় সেটা দানা বেঁধে উঠেছে। যেমন নিঃসন্তান দম্পতির বংশ লোপ পায়, তেমনি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতার বাইরে কেউ বেড়ে উঠলে তার মধ্যে সামাজিকতা কখনও অঙ্কুরিত হতে পারে না।

পাশাপাশি বাস, সব সময় মেলামেশা, পারস্পরিক সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও দরদ, বিপদে আপদে একসঙ্গে দাঁড়ানো, সুযোগ-সুবিধা সকলে মিলে ভোগ করা সামাজিক জীবনের লক্ষণ। এই ভাব ও আচরণ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক মানুষে রূপান্তরিত করেছে। ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজবিধি এমনি করে দিনে দিনে গড়ে উঠেছে। মার্জিত রুচি ও বিচারধারা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে ধীরে ধীরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। শুভেচ্ছা, আস্থা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া মানবসমাজ টিকতে পারে না, তা ভেঙে পড়ে। যে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি এই সব গুণাবলীর অধিকারী, সে সমাজ তত মধুর। কিন্তু এ গুণগুলি জন্মগত নয়, পরিবেশ থেকে অর্জন করতে হয়; আবার যারা অর্জন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আয়ত্ত করতে হয়। মনুষ্যত্ব-অর্জন ও চরিত্র-বিকাশের এই অনুকূল পরিবেশ মানুষ পেয়েছে গ্রামে। দীর্ঘদিনের মানব-ইতিহাসে এই তথ্যই আমরা পাই। বিরক্তিকর গ্রাম্য জীবনে আজও আন্তরিকতা ও ভদ্রতা মেলে, তা শহরে পাওয়া কঠিন। মানবিক সম্বন্ধ বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র শহর নয় যেমন গ্রাম।

গণতন্ত্রে নিষ্ঠা ছাড়া সমষ্টি-উন্নয়ন হতে পারে না :

সাধারণ মানুষকে সম্মান করা, তাদের মতামতকে মর্যাদা

দেওয়া সমষ্টি-উন্নয়নের প্রাণশক্তি। 'যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না, সে মানুষের উপকার করা অসম্ভব।'

রাজদণ্ডের দাপটে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে দিন কয়েকের জন্যে কোন কাজের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় কিন্তু তার উন্নতি করা যায় না। দয়া কিম্বা করুণার দ্বারা কোন জিনিসই স্থায়ী হয় না। বাইরে থেকে একটু সামান্য উপকার করলে দুঃখের লাঘব হয় না। যারা দরিদ্র তারাই নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় দারিদ্র্য জয় করতে সক্ষম। মানুষকে শিখিয়ে বুঝিয়ে তার জড়তা ভাঙতে হবে, তার নৈরাশ্য দূর করতে হবে। সমষ্টি-উন্নয়ন ব্যক্তি ও সমষ্টির উদ্যম ও বুদ্ধিমত্তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায়। এ-কাজের প্রধান ভরসা গণশক্তি এবং প্রধান উদ্দেশ্য সুসংহত কমিউনিটি গঠন ও সহযোগী সমাজের পত্তন।

পল্লীতে বিজ্ঞানের প্রসার চাই :

বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অগণিত পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু এদেশের পল্লীজীবনে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। চাষীর হাতে মান্ধাতার আমলের হাতিয়ার আজও আছে। অথচ শহর ও আধা শহরে যন্ত্রের আবির্ভাব যেভাবে ঘটেছে, তাতে গ্রামবাসীর দুঃখের বোঝা কমেনি বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। পল্লীবাসীর ধন অর্জনের পথগুলি একে একে রুদ্ধ হয়ে এসেছে। সম্পদ অর্জনের যে একটা পথ খোলা, সেখানেও এ-যাবৎ বিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই দেশ কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যে আমরা পরমুখাপেক্ষী। পল্লীর এই জরাগ্রস্ত অবস্থার প্রতিকার করতে হলে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, মজবুত গৃহ ও ভাল পথঘাট নির্মাণ করতে হবে, জলনিষ্কাশন ও সেচের বহুল প্রচলন করতে হবে, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করতে হবে, উর্বরাশক্তি বাড়াতে হবে, পানীয় জল ও জ্বালানী সরবরাহ করতে হবে, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের পত্তন করতে

হবে। এই সকল বিষয়ে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আব দ্বিতীয় পথ নেই। যন্ত্রেব বর্জন নয়, সুচারু ব্যবহার আজ অপরিহার্য। পল্লীবাসীব সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে নজব রেখে উন্নত যন্ত্রপাতির বহুল প্রচলন করা এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতি গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন।

সমষ্টি উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার একই সূত্রে গাঁথা ঃ

যদি সমাজে ও রাষ্ট্র-পরিচালনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে সমষ্টি উন্নয়নের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অপ্রতীকর বৈষম্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়েব মধ্যে বিদ্বেষ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের মধ্যে ভেদ, সমাজবিরোধী ব্যক্তির প্রাবল্য সমষ্টি উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। যেখানে শোষণের পথ সবদিক থেকে উন্মুক্ত সেখানে কমিউনিটি মনোভাব গড়ে ওঠে না। ব্যক্তিস্বার্থ যেখানে অন্ধ ও প্রবল সেখানে সহযোগী সমাজ গড়ে না ; পল্লীবাসীর চিত্ত ঐক্যপ্রবণ করা যায় না। পবিবার পরিজনের পরিধির বাইরে আত্মীয়তা প্রসারিত নাহলে কমিউনিটির একাগ্রতা দানা বাঁধে না। আর এই সমস্ত সহযোগিতা ছাড়া কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট হয় না।

এই কারণেই ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ভূমিহীন চাষীকে ভূমি দান করা দরকার। পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের জমির মালিকানা আনতে হবে। সঙ্গে থাকবে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও উন্নত প্রণালীতে চাষ করার ব্যবস্থা। ফলে উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে এবং বাজারে আমদানীও বেশ বাড়বে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না, শিল্পপতিরা জোট বেঁধে ফসলের দাম কমাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ব্যবসায়ীরা চাষীদের নানাভাবে শোষণ করার রন্ধ্র অনুসন্ধানে রত। গণতান্ত্রিক কাঠামো এই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে সমবায় বিপণন ও সমবায় চাষ প্রবর্তন করা

ছাড়া অন্য পন্থা নেই। দুর্বলদের বঞ্চনা করে সবলেরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তারই জন্য পঞ্চায়েত-ই-রাজ ও সমবায় সংস্থা দৃঢ় ভিত্তির ওপরে খাড়া করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চাই দ্রুত শিক্ষার বিস্তার। সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়বিচারের এই পথ সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রামে অনুসৃত হতে হবে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমের মধ্যে সমষ্টি উন্নয়নের এই মূল নীতিগুলি নিহিত আছে। সমষ্টি উন্নয়নের সার্থক রূপদান করতে পারলে পরিকল্পনার এক বৃহৎ অংশের সফলতা ঘটবে। এই প্রোগ্রাম হঠাৎ গৃহীত হয়নি; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রচনাত্মক কাজের অভিজ্ঞতা এর পশ্চাতে আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমষ্টি উন্নয়নের বর্তমান চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর পিছনে কয়েকজন মনীষীর কর্মসাধনা জড়িত আছে। এঁদের পল্লীপ্রীতি ও রচনাত্মক কাজ সমষ্টি উন্নয়নের পথ রচনা করেছে। সেই ব্যক্তিগত প্রয়াসের ছোট্ট ইতিহাস এবং পরবর্তী সময়ে গোটা দেশজোড়া পল্লী পুনর্গঠন প্রোগ্রামের ক্রমবিকাশের ধারা আমাদের জানা উচিত। স্বাধীনতার পূর্বে কি চেষ্টা হয়েছে এবং স্বাধীনতার পরে কি ভাবে চেষ্টা চলছে সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা না হলে পল্লী-পুনর্গঠন কাজের ধরণটা ঠিক বোঝা যাবে না।

স্বাধীনতার পূর্বে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনার শিলাইদহ ও রাজসাহীর পতিসরে জমিদারী তদারকির মধ্যে দিয়েই পল্লীবাসীর বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগে আসেন। পল্লীর উন্নতি সাধন শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্টের যে আদর্শ এখন প্রচারিত হচ্ছে এবং গোটা দেশ জুড়ে যে উদ্যম সুরু হয়েছে প্রায় ৫০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলার কয়েকটি পল্লীতে অনুরূপ কাজে হাত দেন। "আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই —সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিৎ ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি খুব শক্ত কাজ অথচ না হ'লে নয়।" * শিলাইদহে নতুন শস্যের প্রচলন, উন্নত প্রথায় চাষ ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত উন্নতির নানা কাজ তিনি আরম্ভ করেন। পতিসরে বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম পরগণাতেও উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন। এক একটি পরগণাকে কয়েকটি

---

* পল্লীপ্রকৃতি, ২২৪ পৃঃ।

মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন যুবক অধ্যক্ষকে পল্লীসমাজ স্থাপনের কাজে বসিয়ে দেন। তাঁর পল্লী পরিকল্পনায় পাঁচটি অঙ্গ ছিল—চিকিৎসা-বিধান, প্রাথমিক শিক্ষাদান, পূর্ত-বিভাগ স্থাপন বা কূপাদি খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গল সাফাই, ঋণদায় হ'তে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন এবং সর্বনাশা মামলাসমূহ নিষ্পত্তির নিমিত্ত সালিশী গঠন।

১৯০৭-৮ সালে এ-দেশে যখন সমবায় আন্দোলন সুরুই হয়নি এবং বিদেশী সরকার যখন এ বিষয়ে মোটেই আগ্রহশীল ছিল না, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসর অঞ্চলে তাঁর প্রজাদের সুলভ ঋণপ্রাপ্তির সুযোগের জন্য সমবায় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। প্রজাদের আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'লোকসভা' গঠন করেন। দরিদ্র চাষী প্রজারা একত্র মিলে যাতে নিজেদের দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও অজ্ঞানতা দূর করতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কাজ সুরু হয়। ১৯২২ সালে এলমাহর্স্ট সাহেবের আগ্রহে এবং সিলভা লেভি নাম্নী একজন আমেরিকান মহিলার অর্থানুকূল্যে রবীন্দ্রনাথ সুরুলের শ্রীনিকেতন কুঠিতে গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর বিশ্বভারতীর কল্পনা ও গ্রাম পুনর্গঠনের প্রয়াস পরস্পরের পরিপূরক ছিল। কাজেই শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে আশেপাশের ১৫টি গ্রামে যে কাজ আরম্ভ করা হয়, সেটা ছিল আরো সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। এই কাজের কয়েকটি দিক ছিল—গ্রামে গ্রামে সমবায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, উন্নত সার ও বীজ সরবরাহ, কুটিরশিল্পের পত্তন, গ্রাম্যমেলার পুনঃপ্রবর্তন। তাছাড়াও সেখানে নিবিড়ভাবে গ্রামজীবনের সমীক্ষার কাজ আরম্ভ করা হয়। নিরক্ষর বয়স্ক নারী-পুরুষ যাতে ঘরে বসে শিক্ষা করতে পারে তারই জন্য 'লোকশিক্ষা সংসদের' সৃষ্টি করেন। পল্লীগঠনের কাজকেই

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড় স্বাদেশিকতা বলে মনে করতেন। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা কৃষি। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ কৃষির উপযোগী জমি সীমাহীন নয়। কবি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে না পারলে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হবে না। বনমহোৎসব সরকারের এখন নিয়মিত বার্ষিক বৃক্ষরোপণ উৎসব। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান ও হলকর্ষণ উৎসব প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁর এই পল্লী-উন্নয়ন কাজে কয়েকটি মূলনীতি :—

১। গ্রামবাসীকে আত্মনির্ভরশীল ও ঐক্যপ্রবণ করে তোলা।

২। গ্রাম সংগঠনে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন, কারণ সকল মৌলিক সমস্যার সঙ্গে একই সঙ্গে লড়াইয়ে না নেমে উপায় নেই।

৩। কুটিরশিল্পে তৈরী পণ্যকে এমন রুচিকর, এমন সুদৃশ্য, এমন মনোরম করতে হবে যাতে বাজারে খুব চাহিদা বাড়ে।

মহাত্মা গান্ধীর গঠনকর্ম :

সমষ্টি উন্নয়নের দিকে দেশময় বাতাবরণ সৃষ্টি করেন প্রধানত গান্ধীজী। তাঁর বহুমুখী কর্মসাধনার মূল ভিত্তি ছিল রচনাত্মক কাজ। রচনাত্মক কাজ ছাড়া যে চরিত্র গঠন হয় না, স্বাধীনতাবোধ ও স্বদেশপ্রীতি জাগে না, এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণেই গঠনকর্মকে তিনি সত্য ও অহিংসার পথে স্বরাজলাভের সোপান বলে মনে করতেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তিনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করে টলস্টয় ফার্ম স্থাপন করেন এবং কঠিন শারীরিক শ্রমে আত্মনিয়োগ করেন। মানবতা, ভূমিসম্পদ, গোজাতি, কুটিরশিল্প—এই চারটি সম্পদ প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ গোষ্ঠী-পরম্পরায় লাভ করে এসেছে। দেশে ফিরে সবরমতি ও সেবাগ্রামে তিনি এই চারটির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮ দফা গঠনমূলক কর্মপন্থা দেশবাসীর

সামনে রাখেন। সাম্প্রদায়িক একতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকদ্রব্য নিবারণ, খাদি, অন্যান্য কুটিরশিল্পের উন্নতি, ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা, আদিবাসী, শ্রমিক ও কৃষক কল্যাণ, ছাত্রসমাজ পরিচালন, বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, প্রাদেশিক ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার প্রসার এবং কুষ্ঠরোগীর সেবা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে গান্ধীজী একান্তভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন এবং কয়েক হাজার কর্মীকে এ ধরণের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হরিজন পত্রিকার মাধ্যমে দিনের পর দিন তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি দুর্গত পল্লীবাসীর দিকে আকর্ষণ করেন।

বস্ত্র স্বাবলম্বনের জন্য অখিল ভারত কাটুনী সংঘ; উন্নত গোজাতি সৃষ্টির জন্য গো-সেবা সংঘ; অস্পৃশ্য ও অনুন্নত লোকদের সমাজে সম্মানিত করে তুলবার জন্য হরিজন সংঘ; শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ গড়ার জন্য নঈ তালিম সংঘ; ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি প্রভৃতি সর্বভারতীয় সংস্থা তাঁরই আগ্রহ ও চেষ্টায় গঠিত হয়।

যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধীজী কর্মসাধনায় নিযুক্ত হন সেটা ছিল—

(ক) গ্রামগুলিকে নতুনভাবে প্রাণবন্ত করে তোলা।

(খ) দেশময় এমন একটি সমাজ গড়া, যার লক্ষ্য থাকবে সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের কল্যাণসাধন।

(গ) সমাজে সব চেয়ে অবহেলিত ও দুঃস্থদের সেবা করা।

এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য তিনি কতকগুলি নীতি অনুসরণ করতেন; যেমন—**শরীর-শ্রমের মর্যাদা ও স্বাবলম্বন, সরল ও সৎজীবন, আত্মমর্যাদাবোধ**। সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনের আদর্শ সামনে রাখলে তাঁর মতে এগুলির অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। 'বুদ্ধির সঙ্গে অঙ্গশ্রম সব সময় সমাজ সেবার এক শ্রেষ্ঠ পন্থা'—এই ছিল তাঁর নিজস্ব অভিমত। বর্তমান সমষ্টি উন্নয়ন

কার্যক্রমের মধ্যে গান্ধীজীর চিন্তার প্রভাব অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

মারথানডমে আদর্শ গ্রাম গঠনের প্রয়াস ঃ

১৯২১ সালে ওয়াই. এম. সি. এ. (Y. M. C. A.) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মারথান্‌ডম অঞ্চলে গ্রাম গঠনের কাজে হাত দেয়। কর্মপাগল মিশনারী ডাঃ স্পেন্‌সর হ্যাচ ছিলেন এই কাজের প্রধান হোতা। তাঁর পল্লী উন্নয়ন কাজের লক্ষ্য ছিল—

(১) শিক্ষা বিস্তাব

(২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

(৩) আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি।

(৪) নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি।

এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য ডাঃ হ্যাচ কয়েকটি সুপরিকল্পিত কার্যসূচী অনুসরণ করেন।

(ক) যথাসম্ভব অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় কাজ করা। গ্রামবাসীরা প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেরাই সংগ্রহ করবে।

(খ) উন্নত ধরনের চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন, উন্নত জাতের গো-প্রজনন এবং ঘবে ঘরে সাবান তৈবী আর্থিক উন্নতির জন্য করতে হবে।

(গ) গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক সংঘ গডা হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন পল্লীতে কয়েকদিন করে কাটিয়ে মিলেমিশে কাজ করতেন।

(ঘ) নাটক, মেলা, প্রদর্শনী, পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে প্রতিযোগীতা এবং প্রদর্শনর আয়োজন করা হবে।

(ঙ) গ্রামের মাতব্বর ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রীষ্মের ছুটিতে ছয় সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। গ্রাম সার্ভের দায়িত্ব মূলত তাঁরাই নিয়েছিলেন।

কৃষকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও স্বাবলম্বনের মনোভাব যাতে বৃদ্ধি পায় এবং তারা যাতে আনন্দের সঙ্গে সকল কাজে অংশ নেয় তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। এখানকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

(ক) সব কাজ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হতো।

(খ) কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে তবে কাজে পাঠানো হতো।

(গ) দায়-দেনায় গ্রামবাসীরা যাতে জড়িয়ে না পড়ে তার সাধ্যমত চেষ্টা করা হতো।

(ঘ) সব প্রদর্শনী এত উন্নত ধরণেব হতো যে, আশপাশের পল্লীবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারতো না।

কমিটি ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারী। প্রধান পরিচালক ডাঃ হ্যাচ চলে গেলে সকল উৎসাহে ক্রমশ ভাটা পড়ে যায়।

গুরগাঁয়ে কলেক্টর সাহেবের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ঃ

১৯২৮-৩০ সালে মিঃ এফ্. এল. ব্রেইন (Mr. F. L. Brayne) পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার কালেক্টর থাকা কালে গুরগাঁও জেলায় তিনি কতকগুলি উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন। পরে পল্লীসমস্যা নিয়ে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনাও করেন। তাঁর কাজের কয়েকটি লক্ষ্য ছিল ঃ

(ক) কৃষি জাত উৎপাদন বৃদ্ধি—উন্নত ধরণের বীজ ও যন্ত্রপাতি, গোজাতি সৃষ্টি, গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ, বনসৃষ্টি। সরবরাহ, উন্নত সমবায় সংস্থা গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(খ) ব্যয়সংকোচ—বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে এবং মৃত্যুজনিত পারলৌকিক কাজে ব্যয়সংকোচ এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়।

(গ) জনস্বাস্থ্য—রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, আলোবাতাসযুক্ত শয়নঘর তৈরী, আবর্জনা কুড়িয়ে কম্পোষ্ট সারে পরিণত করা।

(ঘ) গৃহবিজ্ঞান—গৃহের পরিপাটি, গৃহসজ্জার উন্নতি সাধন এবং স্ত্রীশিক্ষা।

প্রধানত এই পন্থার আশ্রয় নিয়ে এই কর্মসূচীকে সার্থক করার চেষ্টা চলে।

(১) লোকসঙ্গীত, নাটক ও সিনেমার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হয়।

(২) ভিলেজ গাইড (Village Guide) নামে একদল কর্মী নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা গ্রাম-উন্নয়ন প্রোগ্রাম জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতেন এবং কাজ পরিচালনা করতেন।

(৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাহায্য নানাভাবে গ্রহণ করা হয়।

মিঃ ব্রেইনের উদ্দেশ্য ছিল শুভ কিন্তু সকল কাজের প্রধান শক্তি ছিল সরকারী ক্ষমতা। ফলে জনসাধারণের মনে তিনি ভীতি ও সন্ত্রাসই সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন নি। অন্যত্র বদলী হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

বরদা রাজ্যে দেওয়ান ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী পল্লীউন্নয়নের এক সুচিন্তিত কার্যসূচী অনুসারে কাজ আরম্ভ করেন।

ফিরকা উন্নয়ন-পরিকল্পনা :

এই ধরনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক কাজের পরীক্ষা চলে মাদ্রাজ রাজ্যে। ফির্‌কা উন্নয়ন স্কীম নামে এটা পরিচিত। বর্তমান মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের মিলিত রাজ্যের (তখনও মাদ্রাজ, অন্ধ্র দু'টি পৃথক রাজ্যে ভাগ হয়নি) প্রভাবশালী কর্মবীর ও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশমজী ১৯৪৬ সালের শেষদিকে এই স্কীম অনুযায়ী পল্লী-উন্নয়ন কাজে হাত দেন। স্কীমটি রচনার মূলে ছিলেন গান্ধীশিষ্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জে. সি. কুমারাপ্পা।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বর্গমাইল সীমানা জুড়ে ২৫-৩০টি গ্রাম নিয়ে এক একটি প্রশাসনিক ইউনিট ফির্‌কা নামে পরিচিত। পল্লী উন্নয়ন কাজের এক একটি ইউনিট হিসাবে এক একটি ফির্‌কাকে নির্বাচিত করে। ১৯৪৬ সালে ৩৪টি ফির্‌কায় কাজ আরম্ভ করা হয়। স্বাধীনতার পুর্বেই এই কাজের সূত্রপাত হয় এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম গৃহীত হবার পূর্ব পর্যন্ত ফির্‌কা উন্নয়ন স্কীম নামেই পরিচিত থাকে। ১৯৫১ সালের মধ্যেই ১০৯টি ফির্‌কায় কাজ বিস্তার লাভ করে। প্রাদেশিক ফির্‌কা উন্নয়ন বোর্ড কাজের নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিতেন এবং একজন ডাইরেক্টর ও দুজন ডেপুটি ডাইরেক্টরের ওপরে প্রোগ্রাম রূপদানের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের প্রধান কর্মচারী ও বিশিষ্ট গঠনকর্মীদের নিয়ে ফির্‌কা ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ড গঠিত হয়। জেলা-শাসকের

হাতে জেলার উন্নয়ন কাজের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারী ও গঠনকর্মীদের মিলিত একটি বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কাজ চালাতেন। ২ থেকে ৪টি ফির্‌কার উন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব একজন ফির্‌কা উন্নয়ন অফিসারের হাতে দেওয়া হতো। তাকে সাহায্য করবার জন্য টেকনিক্যাল স্টাফ্‌ ও কয়েকজন গ্রামসেবক নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক ফির্‌কাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে এক একজন গ্রাম-সেবককে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হতো।

ফির্‌কা উন্নয়ন স্কীমের দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—

(১) শিক্ষামূলক প্রচারের দিকে খুব জোর দেওয়া।

(২) সোজাসুজি গ্রামবাসীদের সহয়তা না দিয়ে, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুমোদিত সকল প্রোজেক্টের জন্য সহায়তা করা।-

(৩) স্বাস্থ্যকর পবিবেশ সৃষ্টি, যোগাযোগ, কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি, বয়স্ক-শিক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েই এইভাবে সরকারী সাহায্য করা।

ফির্‌কা স্কীমের মডেলেই পরবর্তীকালে কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্রোজেক্টের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কার্যধারা রচনা করা হয়। এই স্কীমের লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের বিকাশের মধ্য দিয়ে পল্লীতে সুখী পরিবার ও সুন্দর নাগরিক সৃষ্টি করা। প্রধানতঃ স্থানীয় সম্বল ও স্থানীয় উৎসাহের উপর নির্ভর করেই কাজে নামা হয়। আত্মবিশ্বাসী গ্রাম গঠনই ছিল মূল আদর্শ। পরবর্তী সময়ে Firka Development Scheme-এর নাম বদল করে Rural Welfare Scheme করা হয়।

স্বাধীনতার পরে

নিলখেরী ও ফরিদাবাদ প্রজেক্ট :

১৯৪৭ সালের শেষদিকে করনাল জেলার জংলা ও ডোবা অঞ্চল নিলখেরীতে কিছু ছিন্নমূল পরিবার এসে আস্তানা গাড়ে। বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস. কে. দে নিলখেরীতে একটি আত্মনির্ভরশীল

কলোনী গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন। ৮০টি পরিবার উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে; বাকী পরিবার তাঁত, হোসিয়ারী, সাবান, জুতা ইত্যাদি শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে উপজীবিকা গ্রহণ করে। এইভাবে প্রায় ৬০০০ লোক নিলখেরী কলোনীতে পুনর্বাসন পায়।

ঠিক এই সময়ে দিল্লীর নিকট ফরিদাবাদে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু উদ্বাস্তু (প্রায় ৩০,০০০) ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। একটা বিশৃঙ্খল ক্যাম্পকে আত্মনির্ভরশীল শিল্পনগরে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন গান্ধী-শিষ্য সুধীর ঘোষ। দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণেব সাহায্যে ছিন্নমূল পবিবার মিলিত চেষ্টায় ঘরবাড়ী গড়ে তোলে। কলোনীবাসীব প্রয়োজনীয খাদ্যের প্রায় অর্ধেকটা এখানেই উৎপন্ন হয়। এখানে প্রায় সকলেই কোন-না-কোন অর্থকবী কাজে নিযুক্ত আছে—কেউ বেকাব নেই। সরকারী সাহায্য পেলে সমবেত চেষ্টায় জনসাধারণ অনেক কিছু নিজেরাই গড়ে তুলতে পাবে এই দু'টি কলোনী তারই সাক্ষ্য দেয়।

এটাওয়া প্রোজেক্ট (The Etawah Project) ঃ

উত্তর প্রদেশের এটাওয়া জেলায় ১৯৪৮ সালে যে প্রোজেক্টে হাত দেওয়া হয় তার বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করেন আমেরিকান টাউন-প্ল্যানার মিঃ আলবার্ট মেয়ার (Mr. Albert Mayer)। তিনি ও আর একজন অভিজ্ঞ সম্প্রসারণ-কর্মী মিঃ হোরেস হোমস্ (Mr. Horace Holmes) ছিলেন এব প্রধান পরিচালক। ৬০ হাজার আদিবাসী-অধ্যুষিত ৯৭টি গ্রামের এক বিস্তৃত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে যে প্রোজেক্ট নেওয়া হয় সেটা ছিল যেমন সুপরিকল্পিত তেমনি সুচিন্তিত। সেখানে গ্রামবাসী সাড়াও দিয়েছিল চমৎকার। মেহনতী জনতা প্রতিদিনের জীবনে যে অভাব একান্তভাবে অনুভব করে সেইসব সমস্যাতেই হাত দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ যে পৃথক নয়, পরস্পরের পরিপূরক, সেটা

বিশেষভাবে সকলে অনুভব করেন। এখানকার কাজের ধরণ কেমন ছিল তার একটু পরিচয় দিচ্ছি—

(১) পতিত জমি উদ্ধার, উঁচু জমিতে বাঁধের সাহায্যে চাষ করা, বীজ ও সার সরবরাহ, কৃষিপ্রদর্শনী সংগঠন, ফলগাছ রোপণে উৎসাহ দান ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া হয়। কিছু কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি প্রচলনের চেষ্টা চলে। পশুপালন ও গো-সেবার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) প্রচলিত কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধন এবং নতুন শিল্পের পত্তন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যাতে গ্রামেই উৎপাদন করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়।

(৩) নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে তুলবার জন্য আক্ষরিক জ্ঞানদান, সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য সমাজশিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ-বিদ্যালয়, যুবকসংঘ স্থাপন, বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে রেডিও সরবরাহ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের জন্যে সাফাই ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান, ওষুধ বিতরণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দেওয়া হয়।

(৪) সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে পল্লী পর্যায়ের কর্মী (Village Level Worker) নিয়োগ করা হয়। প্রথমে ট্রেনিং দিয়ে তবে তাদের কাজে পাঠানো হতো। প্রদর্শনীর আয়োজন করা ও তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা ছিল তাদের একটি প্রধান কাজ। বহুমুখী কাজের দায়িত্ব তাদের নিতে হতো।

(৫) কৃষি উৎপাদন কি পরিমাণে বাড়ছে, সাধারণের জীবনমান কি হারে উন্নত হচ্ছে, স্বাবলম্বন ও সহযোগিতার মনোভাব দেখা দিচ্ছে কিনা, এখানকার লব্ধ ফল অন্যত্র পাওয়া সম্ভব কিনা, গ্রামবাসীর আস্থাভাজন হবার উপায় কি —এইসব প্রশ্ন এখানে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হয়।

এটাওয়া প্রোজেক্টে আমেরিকার সম্প্রসারণ কর্মধারা প্রধানত অনুসরণ করা হয়। এখানে অনুসৃত কয়েকটি নীতি সমষ্টি উন্নয়ন কাজের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে—

(১) বহুমুখী উন্নয়ন কর্মের দায়িত্ব নিয়ে গ্রামপর্যায়ের কর্মীকে পল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা এখানেই প্রথম হয়।

(২) জনসাধারণের কাছে কোন কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হবার কতকগুলি সুন্দর পদ্ধতি এখানে গ্রহণ কর হয়, যা পরবর্তী সময়ের সমষ্টি উন্নয়নের কাজে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়েছে।

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট পল হফ্‌ম্যান (Paul Hoffman) ভারতে আসেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করার পর তিনি ফোর্ড কমিশনের তরফ হ'তে এটাওয়ার মত ১৫টি প্রোজেক্ট হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং ৬ মাসের মধ্যে কাজও সুরু হয়ে যায়। মিশনের অর্থসাহায্যে পাঁচটি কৃষি-কলেজে সম্প্রসারণ বিষয়ে ট্রেনিং দিবারও একটা বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯৫২ সালের প্রথমদিকে সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-সংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে ভারত সরকার এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মিঃ চেষ্টার বোলস্‌ সে সময় প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে এদেশে আসেন। এই চুক্তির পশ্চাতে তাঁর আগ্রহ ও উদ্যম ছিল প্রচুর। সর্ত অনুযায়ী স্থির হয় সম্প্রসারণ বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত যুক্তরাষ্ট্র সরকার এদেশে পাঠাবেন এবং কিছু টেকনিক্যাল সরঞ্জামও সরবরাহ করবেন। এই কাজে ৫০০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবার প্রস্তাব আসে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রয়াস, কোন কোন প্রাদেশিক সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্প্রসারণ কর্মধারা—এই সমস্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২রা অক্টোবর (১৯৫২) গান্ধীজীর জন্মদিনে নতুন উদ্যমে ভারত সরকার পল্লী উন্নয়ন কাজে হাত দেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৫৫টি কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্রোজেক্টে এইদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রোজেক্টের সীমানা ছিল ৫০০ বর্গমাইল ও তিন শতটি গ্রাম। প্রায় দু' লক্ষ অধিবাসী-সমন্বিত এক একটি প্রোজেক্ট এলাকাকে প্রোজেক্টস্‌ অ্যাডমিনিস্‌ট্রেশন নামে ভারত সরকার এক নতুন প্রশাসনিক বিভাগ খোলেন এবং মাননীয় এস, কে, দের ওপর প্রোজেক্ট পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্ট

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ৫৫টি কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্ট স্থরু করা হয় তাতে পল্লীকল্যাণের কোনদিকই বাদ পড়েনি। পতিত জমি উদ্ধার, কৃষির উন্নতি, উন্নত গো-জাতি সৃষ্টি, ক্ষুদ্র সেচ, পথঘাট, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, সাধারণ শিক্ষা, সমাজশিক্ষা, কুটিরশিল্প, নারীকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল, আদিবাসী ও অনুন্নত জাতির উন্নতি—সমস্তই প্রোজেক্টের কার্যক্রমের অধীন করে নেওয়া হয়। কাজ স্থরু হবার পর কয়েকমাস যেতে-না-যেতেই পল্লীবাসীর কাছে খুব সাড়াও পাওয়া যায়। প্রথম দিকে স্থির হয় সাধারণত প্রতি প্রোজেক্টে তিন বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, যে ক'টি প্রোজেক্টের সঙ্গে টাউনশিল্পেব পরিকল্পনা থাকবে সেখানে ব্যয় হবে ১১১ লক্ষ টাকা। পল্লীবাসীর উৎসাহ দেখে প্রোজেক্টের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ানোব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু অর্থসমস্যা পথে প্রবল বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই কারণে টাকার পরিমাণ কমিয়ে প্রতি প্রোজেক্টের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা করা হয়। এইভাবে ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি অনেকগুলি নতুন প্রোজেক্টও খোলা হ'য়ে যায়। এদিকে অধিক খাদ্য ফলান অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট সরকারের হাতে এসে পৌছায়। কমিটির স্থপারিশ সরকার গ্রহণ করেন এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়।

অধিক খাদ্য ফলান অনুসন্ধানে কমিটির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আগ্রহে ১৯৫২ সালে 'অধিক খাদ্য ফলান অনুসন্ধান কমিটি' (Grow More Food Enquiry Committee) বসানো হয়। স্বর্গত ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান। সরকার পরিচালিত 'অধিক খাদ্য ফলান'

প্রচারের ফলাফল পর্যালোচনা ক'রে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটা সুচিন্তিত পন্থা নির্দেশ করার দায়িত্ব এই কমিটিকে দেওয়া হয়।

কমিটির মতে 'অধিক খাদ্য ফলান' প্রচার চাষীর মনে বিশেষ কোন রেখাপাতই করেনি। এই বাবদে অর্থব্যয় প্রায় নিষ্ফলই হয়েছে। ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার জীবনমান উন্নত রাখার মত উৎপাদন হার বরাবর বাড়িয়ে যাওয়া এক দুরূহ প্রশ্ন। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই রয়াল কমিশনের সুপারিশ[১], আই. সি. এ. আর[২]-এর কাজকর্ম, জন্‌ রাসেলের পরামর্শ[৩], ফিসকাল কমিশনের রিপোর্ট[৪] এক এক ক'রে কমিটি পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখেন এবং কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন ; প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও সেইভাবে সংগঠিত করে তোলার কথা বলেন।

মূলনীতি

(১) ইংলণ্ড, আমেরিকা, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি এ-দেশে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা উচিত।

---

(১) লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোকে চেয়ারম্যান ক'রে ১৯২৬ সালে রয়াল কমিশন গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

(২) রয়াল কমিশনের পরামর্শক্রমে Imperial Council of Agricultural Research (I. C. A. R) স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে নামের মধ্যে একটু পরিবর্তন করে করা হয়েছে। Indian Council of Agricultural Research (I. C. A. R)।

(৩) ইংলণ্ডের Rothamsted Experimental Station-এর ডাইরেক্টর স্যার জন রাসেল (Sir John Russell) ১৯৩৭ সালে এ-দেশের কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দেন।

(৪) গভর্ণমেণ্টের আয় কীভাবে বাড়ানো যায় তার পথ বাৎলাবার জন্য ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে Fiscal Commission বসানো হয়। ১৯৫০ সালের এপ্রিলে কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন

ওপর থেকে জনসাধারণের ঘাড়ে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে বরং তাদের চাহিদা বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী সরকারী কার্যসূচী রচিত হওয়া দরকার। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করে এবং সুলভ ঋণ সময়মত দিয়ে সরকার উন্নয়নকাজে সহায়তা করবেন।

(২) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিবার সংগে সংগে কুটির ও হস্তশিল্প গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। এতে বেকার ও অর্ধ-বেকারের অনেকেই গ্রামে কাজ পাবে।

(৩) কৃষিই হোক্‌, আর শিল্পই হোক্‌, কোন ক্ষেত্রেই দরিদ্র পল্লীবাসীর পক্ষে—একক চেষ্টা দ্বারা উন্নতি করা খুবই কঠিন। সমবায় সমিতি গঠন করে জোট বেঁধে যাতে তারা কাজে অভ্যস্ত হয় তার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

(৪) রাস্তাঘাট তৈরী, পুকুর খনন, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ—এই ধরণের কাজ করতে হলে সমষ্টিগত চেষ্টাব প্রয়োজন। কাজেই সমষ্টিগত যে-কোন সৎ প্রচেষ্টাকেই উৎসাহিত করতে হবে।

এই মূল নীতি অনুসরণ করে পল্লী-উন্নয়ন কাজকে ভারতের সকল গ্রামে সম্প্রসারিত করার পরামর্শ দেন কমিটি। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সুগঠিত করার জন্য একটা পরিষ্কার ছকও এঁকে দেন। সূচনায় এক-একটি প্রোজেক্টের আওতায় তিনশ'টি করে গ্রাম নেওয়া হয়েছিল এবং একটি প্রোজেক্টকে সাধারণত তিনটি ব্লকে ভাগ করে নিয়ে কাজ করা হতো। বড় বড় প্রোজেক্টের পরিবর্তে কমিটি পরামর্শ দিলেন—একশ' সোয়াশ' গ্রাম নিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উন্নয়ন ব্লক গঠিত হোক্‌। প্রত্যেক ব্লকের দায়িত্বে থাকবেন একজন অফিসার, যার নাম হবে ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের 'কমন এজেণ্ট' হবেন তিনি। কৃষি, সমবায়, পশুচিকিৎসা, গ্রামোদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে বি. ডি. ও.-কে সাহায্য করার জন্য প্রতি ব্লকে নিযুক্ত করা

হবে কয়েকজন শিক্ষণপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মী। এই গোটা টিম পরস্পরের সংগে পরামর্শ করে পল্লীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। পল্লীবাসীর সংগে তাদের সম্বন্ধ হবে ঘনিষ্ঠ। ব্লকের পরেই ৮।১০টি পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে এক-একটি ছোট জোট করা হবে, যার দায়িত্বে থাকবেন একজন করে গ্রামসেবক। সমস্ত বিভাগের ফার্ষ্ট এড্ ম্যান হিসেবে থাকবেন তিনি। বিচার-সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব থেকে মহকুমা শাসককে অনেকটা নিষ্কৃতি দিতে হবে। মহকুমায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রধান দায়িত্ব থাকবে তাঁর। তেমনি, জেলার যাবতীয় উন্নয়নের প্রধানতম দায়িত্ব থাকবে জেলা-শাসকের ওপরে। তাছাড়া, কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট বিভাগের সকল স্তরে, কেন্দ্র থেকে ব্লক পর্যন্ত পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হবে। নেতৃস্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারী থাকবেন এই কমিটিব সদস্য। পরস্পর পরামর্শ করে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হবে।

কমিটির এই প্রস্তাব সরকার পুরোপুরি মেনে নেন। স্থির হয় বড় বড় যে ক'টি প্রোজেক্ট ইতিমধ্যে চালু করা হয়ে গেছে সেগুলি আপাতত ঠিকই থাকবে ; বাকী প্রোজেক্ট স্থুরু হবে এই স্থপারিশ অনুযায়ী, অর্থাৎ প্রতি ব্লকের পরিসর হবে ছোট, অর্থবরাদ্দও থাকবে কম। এইসব ব্লকের নাম হবে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক (National Extension Service Block)। ছ'টি স্তরের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করিয়ে এনে ব্লকগুলিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এন. ই. এস. ব্লকের (N. E. S. Block) প্রথম স্তরের মেয়াদ হবে তিন বছর, টাকা ব্যয় হবে ৪ লাখ। এই সময় উত্তীর্ণ হবার পর কিছু কিছু ব্লকের ললাটে প্রতি বছরই একটা করে তকমা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তখন নামকরণ হবে সি. ডি. ব্লক (C. D. Block) বা আই. ডি. ব্লক (Intensive Development Block)। দ্বিতীয় স্তরের সময়ের মেয়াদও

তিন বছর, টাকা ব্যয় হবে ১২ লাখ। খুব খেটেখুটে কাজ করেও যদি তিন বছরে মোট টাকা ব্যয় না করা যায় সময়ের মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর পুনরায় এগুলি স্বাভাবিক ব্লকে পরিণত হয়ে স্থায়ী ইউনিট হিসেবে কাজ করবে, তখন নাম হবে Post Intensive Block। প্রথম যোজনার আমলেই N. E. S. Block খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঠিক হয় দ্বিতীয় যোজনার পরিসমাপ্তি কালের মধ্যেই সারাদেশে ৫০০০ জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক খোলার কাজ শেষ করা হবে। পশ্চিম বাংলায় খোলা হবে ৩৪১টি ব্লক। ৬০।৭০ হাজার লোক অধ্যুষিত ১৫০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে একশ' সোয়াশ' গ্রাম নিয়ে এক-একটি ব্লক খোলা সুরু হয়ে যায়। কেবল আদিবাসী ও পাহাড় অঞ্চলে ৩০ হাজার অধিবাসী থাকলেই ব্লক খোলা যাবে। এইভাবে N. E. S. ব্লক খোলা সুরু হয়ে যায়। কয়েক বছর কাজ চলার পর আর একটি পরিবর্তনের ঢেউ এসে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমকে একটু নতুন খাতে পরিচালিত করে।

সমষ্টি উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায় ঃ

প্ল্যানিং কমিশন ১৯৫৬ সালে Committee on plan Projects গঠন করেন। উদ্দেশ্য, প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ ঠিকমত এগিয়ে চলছে কি না পর্যবেক্ষণ করা। মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকলে কাজের গতি-প্রকৃতি ঠিক বোঝা যায় না। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের মধ্যে মূল্যায়নকে এই কারণেই একটি বিশিষ্ট ধাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম কিভাবে কার্যকরী হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ কবার জন্য এই কমিটি বলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে এক 'স্টাডি টিম' গঠন করেন ১৯৫৭ সালে।

টিমের প্রথম সুপারিশ—N. E. S. Block-এর কাজ জোরদার করার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সেটাকে Intensive Block-এ রূপান্তরিত না করে বরং N. E. S. Block-কেই দু'টো স্টেজের

মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করিয়ে এনে স্থায়ী রূপ দেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। কোথাও নতুন কোন ব্লক খোলা হ'লে এক বছর সেটা Pre-Extension ব্লক রূপে অভিহিত হবে। তারপর ব্লকটিকে Stage One-এ উন্নীত করা হবে। মেয়াদ থাকবে ৫ বছর, টাকা ব্যয় হবে ১২ লাখ। পাঁচ বছর অন্তে ব্লকটি Stage Two-তে পদার্পণ করবে। এখানেও মেয়াদ থাকবে ৫ বছর, টাকা ব্যয় হবে ৫ লাখ। Pre-Extension সময়ে ১৮,৮০০ টাকা ব্যয় হবে এবং পরে এই টাকা Stage I ব্লক বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। * এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সাল থেকে ব্লকগুলির নতুন নামকরণ হচ্ছে।

এই টিমের দ্বিতীয় সুপারিশ অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সমষ্টি উন্নয়ন কাজকে পুরাপুরি লোকায়ত্ত করার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জনকয়েক মনোনীত বেসরকারী ব্যক্তির সংগে পরামর্শ করে সরকারী প্রোগ্রামকে রূপ দেবার চেষ্টা জনচিত্তে কখনও সক্রিয় সাড়া জাগাতে পারে না, কেননা স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে স্থানীয় প্রচেষ্টা সকলের চাইতে বেশী প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের উৎসাহ, উদ্যম ও নিবিড় সহযোগিতা পেতে হ'লে সমষ্টি উন্নয়নের অধিকাংশ দায় ও দায়িত্ব তাদেরই হতে অর্পণ করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারী নির্দেশে পল্লী পুনর্গঠন হোতে পারে না। কাজেই, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা জেলা, ব্লক ও গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন আকারের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার পরামর্শ দেন কমিটি। পঞ্চায়েত পল্লী-পরিকল্পনা তৈরী করবে; পল্লী-উন্নয়নমূলক যাবতীয় কাজের অধিকারী হবে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান মিলে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে; তাদেরই মধ্য হতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন। ব্লকের সাকুল্য অর্থব্যয়ের ভার থাকবে এই সমিতির

* Pre-Extension, Stage One ও Stage Two ব্লকের বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

হাতে। অবশ্য প্রথম দিকে কিছুদিনের জন্য এস. ডি. ও. থাকবেন ব্লক সমিতির চেয়ারম্যান। আবাব ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের নিয়ে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ গঠিত হবে। জেলার এম. এল. এ., এম. এল. সি., এম. পি.-রাও এই পরিষদের সদস্য থাকবেন। জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন বিভাগসমূহের অফিসারগণও পরিষদের সদস্য থাকবেন, তবে তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন জেলা-শাসক। কমিটি সুপারিশ করেন—উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্ম গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ—এই তিন চাকাযুক্ত লোকসংস্থার ওপরে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে।† গ্রাম অঞ্চলে সরকারী দপ্তরের বহু শাখা প্রসারিত করা হবে এবং তা পঞ্চায়েত-ই রাজের অনুগামী হবে। এই ব্যবস্থাপনাই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (Democratic Decentralization)।

পঞ্চায়েত ও সমবায় বিভাগকে সমষ্টিউন্নয়ন মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়; কেননা, এই দু'টি পল্লী সংগঠনকে ভিত্তি করেই সমষ্টি উন্নয়নের যাবতীয় কাজ করা যুক্তিযুক্ত হবে। স্টাডি টিমের এই সুপারিশগুলি ন্যাশনাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কাউন্সিল গ্রহণ করেন। গ্রাম থেকে জেলা পর্যন্ত পঞ্চায়েত শাসনকে পঞ্চায়েত-ই রাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে সমষ্টি উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব পঞ্চায়েতের হাতে আসছে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রামে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সম্পর্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংগঠনের কাঠামো এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হলো।

---

† পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মাঝখানে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সংগঠন চার চাকাযুক্ত।

সংক্ষিপ্তসার :

সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম গ্রামরচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি, একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। আর C. D. ও N. E. S. Block হলো কতকগুলি এজেন্সি যার মাধ্যমে এই প্রোগ্রামকে রূপায়িত করা হচ্ছে।

প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য :

(১) পল্লীবাসীর আর্থিক উন্নতিসাধন।
(২) জীর্ণ সামাজিক সম্পর্ক ও বিধিব্যবস্থার সংস্কার।
(৩) দেশের সর্বত্র গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

১। বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের একসংগে মিলিতভাবে কাজ করা (Coordinated function)-এর আগে সরকারের উন্নয়ন বিভাগসমূহ আপন আপন প্রোগ্রাম নিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে কাজ-কর্ম করতো। এক বিভাগের সংগে অন্য বিভাগের বড় একটা সংযোগ থাকতো না। উন্নয়ন ব্লক সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এখন সকল উন্নয়ন বিভাগ নিজেদের স্কীম ও বাজেট ব্লক অনুযায়ী করে এবং ব্লকের মাধ্যমে স্কীমকে কার্যকরী করার চেষ্টা নেয়। অনেকগুলি বিভাগের কর্মচারী ব্লকে থাকেন এবং তারা বি. ডি. ও.-র নেতৃত্বে একটা টিম হিসেবে কাজ করেন।

২। পল্লী সমস্যার সংগে মোকাবিলা করার প্রচলিত সরকারী ধারাকে সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রাম একেবারে পাল্‌টে দিয়েছে। পল্লীর সমস্যাগুলি একটির সংগে আর একটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; কাজেই যুগপৎ সকল সমস্যার সংগে একই সাথে লড়াইয়ে নামতে হবে (Integrated approach)—একথা আগে এমন করে কখনও ভাবা হয়নি। পল্লীসমস্যাকে সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে দেখবার চেষ্টা এই প্রথম।

৩। জন সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা (People's Participation)। সরকারের কোন বিভাগ আগে সর্বস্তরে সক্রিয় জন সহযোগিতার চেষ্টা করেনি। সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগই প্রথম জন প্রতিনিধির পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে কাজকর্ম করা সুরু করে এবং কেন্দ্র থেকে ব্লক পর্যন্ত পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে সমষ্টি উন্নয়নের প্রায় যাবতীয় কাজ এখন চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৪। গ্রাম পর্যায়ে ভারতের সকল রাজ্যে একই রকম কর্মী বাহিনী (Village Level Worker.) গঠন সত্যই উল্লেখযোগ্য। শাসনদণ্ডের প্রতীক পুলিশ বাহিনীকে গ্রামবাসী এ-যাবৎ চিনেছে। এখন সেবা ও সহায়তা দানের আদর্শ নিয়ে আর এক বাহিনী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছেন। গ্রামসেবক-গণ ট্রেনিংপ্রাপ্ত বহুমুখী কর্মী। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগ ও পল্লীবাসীর মধ্যে সংযোগের সেতু রচনা করবেন এই কর্মিদল।

৫। পল্লী পুনর্গঠনের সরকারী এজেন্সি হিসেবে সারাদেশে পাঁচ হাজার উন্নয়ন ব্লক গঠন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাবতীয় উন্নয়নকার্য সম্পাদনের এগুলি হবে বেসিক ইউনিট।

৬। সম্প্রসারণ পদ্ধতির সাহায্যে সমষ্টি উন্নয়নের চেষ্টা। মানবিক মূল্যের দিকে নজর দেওয়া, জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনা, স্থানীয় নেতা ও গ্রামের বিভিন্ন সংস্থার সংগে সহযোগিতা করে কাজ করা নিঃসন্দেহে নতুন প্রচেষ্টা।

৭। মূল্যায়নের বিহিত ব্যবস্থা। আগে না ছিল প্ল্যানিং, না প্ল্যান অনুসারে কোন কাজ। কাজেই কোন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের গতি-প্রকৃতি কেমন চলছে তা' পরখ করার কোন প্রশ্নই উঠতো না। কাজের অগ্রগতি, সফলতা ও বিফলতা মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করে দেখা, আত্মসমালোচনা করা সমষ্টি উন্নয়ন প্রোগ্রামের এক বিশিষ্ট অংগ।

প্রতি ব্লকে সরকারী কর্মচারীর তালিকা ঃ

১। ডেভেলপমেণ্ট বিভাগ—(i) ব্লক ডেভেলপ্মেণ্ট অফিসার (বি. ডি. ও.)
(ii) ওভারসিয়ার
(iii) প্রোগ্রেস এ্যাসিস্ট্যাণ্ট
(vi) গ্রামসেবক—১০ জন
(v) গ্রামসেবিকা—২ জন
(vi) হেড ক্লার্ক-কাম-একাউণ্টেণ্ট—১জন
(vii) লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক—১জন
(viii) টাইপিস্ট ক্লার্ক—১জন
(ix) ক্যাশিযাব-কাম-স্টোর-কিপাব—১জন
(x) ড্রাইভার—১জন
(xi) বি. ডি. ও -র অর্ডারলি পিওন—১জন
(xii) আপিস পিওন—১জন
(xiii) দাবোয়ান-কাম-নাইট গার্ড— ১জন

২। কৃষি-পশুপালন বিভাগ—
Agriculture &
Animal Husbandry
Department

কৃষি (i) এগ্রিকালচাবাল একস্টেনশান অফিসাব (এ. ই. ও.)—১জন
(ii) এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এ. ই. ও.—১ জন
(iii) ডিমন্স্ট্রেটর—১জন
(iv) জুট ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যাণ্ট—১জন
(v) ফিটার মেকানিক—১ জন

৩। শিক্ষা বিভাগ—(i) সমাজশিক্ষা সংগঠক—১ জন
(ii) মুখ্য সেবিকা—১ জন

৪। সমবায় বিভাগ—(i) কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি ইন্স্পেকটর—১ জন
(ii) অর্ডারলি পিওন—১ জন

৫। পঞ্চায়েত বিভাগ—(i) পঞ্চায়েত একস্টেনশান অফিসার
(ii) ক্লার্ক—১ জন
(iii) অর্ডারলি পিওন—১ জন

৬। ইণ্ডাস্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্ট—(i) একস্টেনশন অফিসার ইণ্ডাস্ট্রীজ
(ii) অর্ডারলি পিওন—১ জন

সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কৃষি ও পশুপালন—কৃষি ও পশুপালনের বিভিন্ন দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যথা—উন্নত বীজ সরবরাহ, সবুজ সার ও রাসায়নিক সাব ব্যবহার, রোগ ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ, সব্‌জী ও ফল চাষ, বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ।

পতিত জমি উদ্ধার, চাষপদ্ধতির নানাবিষয়ে উন্নতি সাধন, নতুন যন্ত্রপাতির প্রচলন।

স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ সরবরাহ এবং কৃষিজাত দ্রব্যের ঐক্যবদ্ধ বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য সমবায় সমিতি গঠন। গো-খাদ্য উৎপাদন, গোশালা নির্মাণ, গো-প্রজনন এবং বোগ চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা দান। কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য একটি 'ওয়ার্কশপ' স্থাপন।

সেচ ও জলনিষ্কাশন—পুকুর খোঁড়া, ছোটখাটো খাল কাটা, বাঁধ দেওয়া, অগভীর নলকূপ বসানো, পাম্পিং প্ল্যাণ্ট সরবরাহ, বদ্ধ জল বের করে দেওয়া ইত্যাদি।

পল্লীস্বাস্থ্য— স্বাস্থ্যবিধিব সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে অবহিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (Dugwell Latrine)—প্রস্রাবাগার, শোষক গর্ত (Soakage pit), ধূমহীন চুল্লীর প্রবর্তন, পানীয় জল সরববাহ।

শিক্ষা— প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তার। স্কুলগৃহ নির্মাণ এবং বিভিন্ন উপকরণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে সহায়তা দান।

সমাজশিক্ষা— কমিউনিটি স্পিরিট গড়ে তোলবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাজ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ক) আক্ষরিক জ্ঞানদানের জন্য নৈশবিদ্যালয় এবং পাঠাভ্যাস বজায় রাখবার জন্য সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ও পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা।

(খ) সিনেমা, ম্যাজিক লণ্ঠন, পোষ্টার, ফ্লানেলগ্রাফ্‌, ফ্ল্যাসকার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা।

(গ) পল্লীনৃত্য, পল্লীসঙ্গীত, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন।

(ঘ) গ্রামে গ্রামে ব্রতীদল বা কিশোর সংঘ গড়ে তোলা এবং খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প—বিভিন্ন শিল্পে যারা নিযুক্ত আছে তাদের ঋণদান এবং মেহনত লাঘবের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। কারিগর ও নবাগতদের ট্রেনিং দেওয়া এবং সমবায় সমিতি গঠন। নতুন নতুন ডিজাইন করার জন্য উৎসাহ দান।

যোগাযোগ— প্রধান রাস্তার সংগে বিভিন্ন গ্রামের সংযোগ সাধন। রাস্তা তৈরী, রাস্তায় মাটি দেওয়া ইত্যাদির দায়িত্ব নিবে গ্রামবাসী। সরকার সরবরাহ করবেন কালভার্ট, বানিয়ে দেবেন ব্রীজ।

পঞ্চায়েত— পঞ্চায়েত গঠন, পঞ্চায়েতের কার্যাবলী পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ দান।

গৃহবিজ্ঞান ও নারীকল্যাণ—রান্নাঘর ও বাড়ীর আশেপাশে খাবার সব্‌জী করা, ফলগাছ লাগানো, গো-পালন, ছাগ ও হাঁস-মুরগী পালন, তুলোর চাষ ও স্থতোকাটা, তাঁতবোনা, সেলাই ও হাতের কাজ করা, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, আহার্য দ্রব্য সংরক্ষণ, বালোয়াডী বিদ্যালয় পরিচালন, বয়স্ক নারীদের শিক্ষা, সাফাই, লেপা, গৃহসজ্জা, আলপনা, আমোদ-উৎসব, পেন্টিং ইত্যাদি। এক কথায় সুগৃহিণী ও আনন্দময় গৃহ গড়ে তোলবার জন্য যা যা করণীয় প্রায় সবই এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ভিত্তি
বে-সরকারী কাঠামো
সরকারী কাঠামো
CENTRAL OR MAIN
কেন্দ্রে
লোকসভা
(কেন্দ্রীয় কমিটি-এন ডি সির সদস্যবৃন্দ, খাদ্য ও কৃষি বিভাগ এবং সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী)-চেয়ারম্যান, প্রধান মন্ত্রী
BASIC PRINCIPLES
মূলনীতি
সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রক
উন্নয়ন বিভাগ সমূহের সচিববৃন্দ
STATE
রাজ্যে
বিধানসভা
রাজ্য উন্নয়ন কমিটি-(বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী, ইত্যাদি) চেয়ারম্যান-মুখ্যমন্ত্রী
GUIDANCE & DIRECTION
পরামর্শ ও নির্দেশ
কৃষি ও উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের সচিববৃন্দ
DISTRICT
জেলায়
জেলা পরিষদ
(বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলা উন্নয়ন কমিটি জেলা পরিষদের কাজ করছে)
PLANNING GUIDANCE & DIRECTION
পরিকল্পনা, পরামর্শ ও নির্দেশ
জেলা-শাসক
(উন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর) জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মচারীবৃন্দ করবেন তাঁকে সহায়তা
BLOCK
ব্লকে
পঞ্চায়েত সমিতি
PLANNING & IMPLEMENTATION
পরিকল্পনা, রচনা ও রূপদান
সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপার্টদের একটী টীম
(Team of Experts)
VILLAGE
গ্রামে
গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সংস্থা এবং গ্রাম সহায়ক বা নেতা
PLANNING & IMPLEMENTATION
পরিকল্পনা, রচনা ও রূপদান
গ্রাম সেবক ও সেবিকা
Multipurpose Extention Agent

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত কাঠামো

দু'টি বড় গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠিত হতে পারে; আবার ছোট পাঁচ বা সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়েও অঞ্চল-পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে অঞ্চলের সীমানা নির্ধারিত হয়। প্রতি অঞ্চলে একটি ক'রে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হবে।

প্রি-একস্‌টেন্‌শন্‌ ব্লকের বাজেট স্কীম

একবছরে ১৮,৮০০ টাকা

		খরচ
১।	ব্লকের কর্মচারিবৃন্দের দরুন ব্যয়—	
	বি. ডি. ও. প্রতিমাসে ৩০০৲ টাকা হিসেবে—	৩,৬০০ টাকা
	এ. ই. ও. (কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার) প্রতিমাসে ২০০৲ টাকা হিঃ—	২,৪০০ "
	পাঁচজন গ্রামসেবক প্রতিমাসে ১০০৲ হিঃ	৬,০০০ "
	একজন টাইপিস্ট ক্লার্ক প্রতিমাসে ৭৫৲ টাকা হিঃ—	৯০০ "
	একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী—প্রতিমাসে ৫০৲ হিঃ—	৬০০ "
	আপিসের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও টাইপ মেশিন বাবদ—	১৫০০ "
	আপিসের ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা হিঃ—	৬০০ "
	কর্মচারীদের ভ্রমণ, পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য খরচা দরুন ১০০৲ হিঃ—	২০০০ "
		১৮,৮০০

বিঃ দ্রঃ—১৯৬১ সালের পে-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় প্রত্যেক কর্মচারীরই প্রারম্ভিক বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে।

'Stage One' ব্লকের বাজেট স্কীম

৫ বছরে ১২ লাখ টাকা ব্যয়

কি কি খাতে ব্যয় হবে	অঙ্কগুলি হাজার টাকা হিসাবে ধরতে হবে				
	মোট ব্যয়	ঋণ স্বরূপ	এককালীন ব্যয	পৌনঃ পুনিক	মোট ব্যয়
1 ব্লক আপিস					
(ক) ব্লকের কর্মচারীদের দরুন ব্যয়	২৬০.০০	—	—	২৬০.০০	২৬০,০০
(খ) পরিবহন বাবদ (১টি জিপ)	১৫.০০	—	১৫.০৫	—	১৫.০০
(গ) আপিসের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১৫ ০০	—	১৫.০০	—	১৫ ০০
(ঘ) ব্লকের আপিস ঘর ও বীজাগার ইত্যাদি	২৫ ০০	—	২৫ ০০	—	২৫ ০০
মোট	৩১৫ ০০	—	৫৫.০০	২৬০.০০	৩১৫ ০০
2 কৃষি ও পশুপালনে সম্প্রসারণ					
(ক) চাষীর খেতে রেজাণ্ট ডিমন্সট্রেশন বাবদ	৪ ৫০	—	—	৪ ৫০	৪,৫০
(খ) ছোট কারখানা, উন্নত কৃষিযন্ত্রপাতির প্রদর্শন, ডিম তা দেওবা যন্ত্র, রোগ ও কীটনাশক সরঞ্জাম, সাইনবোর্ড ইত্যাদি	২২ ০০	—	১২·০০	১০·০০	২২ ০০
(গ) উন্নতজাতের মুরগী বিতরণ	৩·২০	—		৩·২০	৩ ২০
(ঘ) পশুচিকিৎসালয় ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-কেন্দ্র	৫·৯০	—	১ ৬০	১·৩০	৫ ৯০
(ঙ) বিবিধ কৃষি স্কীম, ফলচাষ ও সবজী চাষে উৎসাহ দান, তুলোর চাষ মৌমাছি পালন সেচ প্রণালী প্রদর্শন	১৪ ৪০	—	১৪ ৪০		১৪ ৪০
মোট	৫০ ০০	—	৩০ ০০	২০ ০০	৫০ ০০
3. সেচস্কীম	২০০ ০০	১৬০ ০০	৪০ ০০	—	৪০.০০
4. Reclamation					
(ক) পতিত জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় নিবারণ সমচাল বাঁধ (contour bunding) ইত্যাদি	১০০ ০০	১০০ ০০	–		
(খ) উৎপাদনবৃদ্ধি-সংক্রান্ত কৃষি স্কীম এবং উন্নত গো-জাতি-সংক্রান্ত স্কীম	৪০·০০	৪০·০০	–		·
মোট	·৪০·০০	১৪০ ০০	—		
5. জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি					
(ক) স্বাস্থ্যকেন্দ্র					
[i] পুনঃপৌনিক খরচা	১৫ ০০	—	—	১৫·০	১৫·০০
[ii] ডাক্তারখানার গৃহাদি	১৫·০০	—	১৫ ০০		১৫·০০
[iii] ডাক্তারখানার সরঞ্জামাদি	১০·০০	—	১০·০০		১০·০০
(খ) পল্লীতে পানীয় জল সরবরাহ	৫০·০০	—	৫০·০০	—	৫০·০০
(গ) গ্রাম সাফাই (Sanitation)	১০·০০	—	১০·০০	—	১০·০০
মোট	১০০ ০০	—	৮৫·০০	১৫·০০	১০০·০০

6. শিক্ষা—					
বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন—	৫০ ০০ঃ	—	৫০·০০	—	৫০·০০
7. সমাজশিক্ষা—					
(ক) সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন— [i] পুরুষদের জন্য ১২·০০ টাকা [ii] মেয়েদের জন্য ১০·০০ ,,	২২·০০+	—	—	২২·০০	২২·০০
(খ) প্রদর্শনী, পুরস্কার, আমোদ-প্রমোদ, ছেলেমেয়েদের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি	১১·০০	—	৫·০০	৬ ০০	১১·০০
(গ) অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট (ইন্‌ফরমেশন সেণ্টার-সহ)	৩৭·০০	—	২৫·০০	১২·০০	৩৭·০০
মোট	৭০·০০	—	৩০·০০	৪০·০০	৭০·০০
8. যোগাযোগ—					
(ক) কাঁচা রাস্তা	৫০·০০	—	৫০·০০	—	৫০·০০
(খ) পাকা রাস্তা	৬০ ০০	—	৬০·০০	—	৬০·০০
মোট	১১০·০০	—	১১০·০০	—	১১০·০০
9. পল্লীর কুটির ও হস্তশিল্প এবং ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন স্কীম	৬৫·০০++	--	৪০·০০	২৫·০০	৬৫·০০
10. গৃহনির্মাণ—					
ব্লককর্মীদের গৃহ এবং পল্লীবাসীর গৃহ নির্মাণ বাবদ	১০০·০০	১০০ ০০	—	—	—
সবসাকুল্যে মোট ব্যয়	১২০০ ০০	৪০০·০০	৪৪০·০০	৩৬০·০০	৮০০·০০

ঃ নারী ও শিশুদের শিক্ষার জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

+ নারী ও শিশুদের দরুন ব্যয় হবে ১০,০০০ টাকা।

++ নারী ও শিশুদের দরুন ১৫ ০০০ টাকা ব্যয় হবে—(১০,০০০ টাকা স্থায়ী ব্যয় এবং ৫,০০০ টাকা পৌনঃপুনিক ব্যয় হবে)।

'Stage Two' ব্লকের বাজেট স্কীম

৫ বছরে ৫ লাখ টাকা ব্যয়

কি কি খাতে ব্যয় হবে	অঙ্কগুলি হাজার টাকার হিসাবে ধরতে হবে				
	মোট ব্যয়	ঋণ স্বরূপ একালীন ব্যয়	ঋণ ছাড়া অন্যান্য বাবদ পৌনঃপুনিক খরচা	মোট খরচা	খরচা
1. ব্লক অফিস					
(ক) ব্লক কর্মচারীদের দরুন ব্যয়	৭০·০০	—	—	৭০·০০	৭০·০০
(খ) জীপ বাবদ ব্যয়	১৫·০০	—	১৫·০০	—	১৫·০০
মোট	৮৫·০০	—	১৫·০০	৭০·০০	৮৫·০০

2. কৃষি ও পশুপালন-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রসারণ খরচ— ফসল ও সব্‌জী চাষে উৎসাহ দান, তুলো চাষ, মৌমাছি পালন, মুরগী পালনকেন্দ্র, সেচজলের সদ্ব্যবহার ও সেচপ্রণালী প্রদর্শন ইত্যাদি বাবদ—	৫০·০০	—	৫০·০০	—	৫০·০০
3. সেচ স্কীম—	৪০·০০	৩০·০০	১০·০০	—	১০·০০
4. পতিত জমি উদ্ধার—					
(ক) পতিত জমি উদ্ধার, ভূমিক্ষয় নিবারণ, সমঢাল বাঁধ (contour bunding) ইত্যাদি—	৩০·০০	৩০·০০	—	—	—
(খ) উৎপাদনবৃদ্ধি-সংক্রান্ত কৃষি স্কীম এবং উন্নত গো-জাতি সৃষ্টি-সংক্রান্ত স্কীম—	১৫·০০	১৫·০০	—	—	—
মোট	৮৫·০০	৪৫·০০	—	—	—
5. পল্লীস্বাস্থ্য ও গ্রাম সাফাই— পানীয় জল সরবরাহ, সাফাই, বদ্ধজল নিষ্কাশন ইত্যাদি বাবদ—গ্রাণ্ট-ইন-এইড স্কীম	৫০·০০		৫০·০০	—	৫০·০০
6. শিক্ষা—বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন	৫০·০০*		৫০·০০	—	৫০·০০
7. সমাজশিক্ষা—					
(ক) সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন বাবদ—	১৪·৪০†	–	—	১৪·৪০	১৪·৪০
(খ) প্রদর্শনী পুরস্কার, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি	৬·০০		—	৬·০০	৬·০০
(গ) অডিও-ভিসুয়াল ইউনিটস (ইন্‌ফরমেশন সেণ্টারসহ)	২৯·৬০	—	১৫·০০	১৪·৬০	২৯·৬০
মোট	৫০·০০	—	১৫·০০	৩৫·০০	৫০·০০
8. যোগাযোগ— যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য গ্রাণ্ট-ইন্-এইড স্কীম	৫০·০০	—	৫০·০০	—	৫০·০০
9. পল্লীর কুটির ও হস্তশিল্প ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন স্কীম	৫০·০০‡		৪০·০০	১০·০০	৫০·০০
10. গৃহনির্মাণ পল্লীগৃহের উন্নতিসাধন ও ব্লককর্মীদের গৃহ-নির্মাণ	৩০·০০	৩০·০০	—	—	—
সর্বসাকুল্যে মোট ব্যয়	৫০০·০০	১০৫·০০	২৮০·০০	১১৫·০০	৩৯৫·০০

নারী ও শিশুদের জন্য ৭,৫০০ টাকা ব্যয় হবে।

† নারী ও শিশুদের জন্য ৬০০০ টাকা ব্যয় হবে।

‡ নারী ও শিশুদের জন্য ৬৫০০ টাকা ব্যয় হবে :—(৫২০০ টাকা স্থায়ী খরচা এবং ১,৩০০ পুনঃপৌনিক খরচা)

2, 5 ও 8 নং স্কীম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য পল্লী-সংস্থার হাত দিয়ে ব্যয় করার চেষ্টা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

এক্‌স্‌টেন্‌শন্‌ বলতে কি বোঝায় ?

এক্‌স্‌টেন্‌শন্‌ শব্দটি ভারতে এখন খুব চালু। শুধু ভারত কেন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপিন, সিংহল ও পাকিস্তানের অধিবাসীরাও শব্দটির সংগে পরিচিত। যদিও বিদেশাগত, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা একেবারে বৈদেশিক নয়। এক্‌স্‌টেন্‌শনের অর্থ সম্প্রসারণ বা বিস্তার। এই শব্দদ্বারা বিদ্যা সম্প্রসারণের বিভিন্ন পন্থাকেই মূলত বোঝান হয়। "Extension is....a means of spreading and enlarging useful knowledge"। দরকারী জ্ঞান সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতিই সম্প্রসারণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিদ্যা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুগঠিত এবং গোটা দেশময় বিস্তৃত। কৃষক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে 'ল্যাণ্ড-গ্রাণ্ট কলেজ' (Land Grant College) গড়ে উঠেছে। পল্লীর বালক-বালিকা কৃষি-বিজ্ঞান ও গৃহ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হবার জন্যে এখানে আসে। সবাব জন্যেই এখানকার দরজা খোলা। ভর্তির পথে কোন বাধা নেই ব'লে একে জনতা কলেজও বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ও উৎসাহে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই ধরণের কলেজের পত্তন হয়। প্রধানত কৃষক-পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তারা এখানে শেখে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করে, গবেষণার ফলাফল দেখে এবং গৃহকে সুখময় ও শ্রীমণ্ডিত করার পন্থাগুলি চর্চা করে। প্রথম প্রথম যা কিছু বিদ্যাচর্চা বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকতো। চাষবাসের ধারাকারা ও ফলনের

রকম বছর কয়েক দেখবার পর আশপাশের, এমনকি দূরবর্তী গ্রামের কৃষকরা পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে সুরু করে। তারাও উন্নত কৃষিবিদ্যার জ্ঞান কিছু পেতে চায়। এই প্রস্তাবে অধ্যাপকমণ্ডলী সাগ্রহে সাড়া দেন। তাঁরা দেখলেন, কৃষকদের খামারে ও গৃহে গিয়ে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন জিনিস শিখিয়ে দিলে লাভ হবে উভয়েরই। যারা চাষবাসে নিযুক্ত আছে তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তায় উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে; আর অধ্যাপকগণ খেত-খামার ও কৃষক-পরিবারের দৈনন্দিন জীবনসমস্যা সম্বন্ধে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। এইভাবে কলেজের চতুঃসীমা পেরিয়ে বিদ্যাদানের পরিসর বিস্তৃত হলো পল্লীবাসীর মাঠে ও কুটিরে। কৃষিবিদ্যা সম্প্রসারণের সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যাণ্ড-গ্রাণ্ট কলেজ ও এক্‌স্‌টেন্‌শন্ সার্ভিস আজ সেখানে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে এবং কলেজগুলি কোন-না-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংযুক্ত। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা বিশজন এখানকার শিক্ষার্থী। সম্প্রসারণের পথ ধরে গত শতাব্দীর অভাবী আমেরিকা আজ প্রাচুর্যের অধিকারী।

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ ক'রে কৃষির উন্নতিসাধনের চেষ্টা তো হচ্ছেই; গো-পালন ও মৎস্য চাষও যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। লাটিন আমেরিকা অবশ্য একমাত্র শস্য উৎপাদন বিষয়েই সম্প্রসারণের আশ্রয় নিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকর্মের সংগে চাষীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চাহিদা থেকে সম্প্রসারণের উৎপত্তি। কৃষি গবেষণা-কেন্দ্রের সংগে কৃষকের ঘরের একটা সবসময়ের যোগাযোগ চালু রাখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য। ভারতে কিন্তু নিছক কৃষির মধ্যেই সম্প্রসারণের কর্মক্ষেত্র নিবদ্ধ থাকেনি। এ-দেশের পল্লীবাসীর বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে, তাদের আপন

বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণের কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। এ-কার্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্ধ অনুকরণ নয়, নিছক প্রতিচ্ছবিও নয়। ভারতের মাটিতে, ভারতের জলহাওয়ায়, ভারতবাসীর জীবনসাধনার ভিত্তিভূমিতে সম্প্রসারণ বিদ্যা নানারকম সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে। বয়স্কশিক্ষা, শিশুশিক্ষা, কৃষি ও মৎস্য-চাষ, পশুপালন, কৃষিঋণ ও সমবায়, পঞ্চায়েত, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, পথঘাট ও গৃহনির্মাণ, বিপণন, শিশুপালন, মাতৃমঙ্গল ও জনস্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণের পথ অনুসরণ করা হচ্ছে।

কাজেই, "Extension is a method of education which relates useful practical knowledge to the needs of the farmer, his family and the community." কৃষকের নিজের, তার পরিবারের ও গ্রামবাসীর সামগ্রিক জীবনের প্রয়োজনে যে যে বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা দরকার—তার পরিপূরণ করার পদ্ধতিই সম্প্রসারণ। এক্‌স্‌টেন্‌শন্ সার্ভিস পরিচালনার জন্য জাপান, কোরিয়া ও ফিলিপিনে এক্‌স্‌টেন্‌শন্ ল' প্রণীত হয়েছে। আইনের মূল বক্তব্য তিন দেশেই এক। চাষ ও চাষীর জীবন-সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব সমস্যা জড়িত এবং যার সমাধান প্রয়োজন তার কার্যকরী তথ্য সরবরাহ করা এবং সেটা ঠিকমত কাজে লাগাতে উৎসাহ দানই সম্প্রসারণ। এখন প্রশ্ন এই তথ্য মিলবে কোথা থেকে? কোরিয়ার আইন বলছে—নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষা এই তথ্য যোগাবে; জাপানের আইন বলছে—এক কৃষকের সংগে আর একজন কৃষকের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে তথ্য বেরিয়ে আসবে। উভয় পন্থাই দরকার। সব দেশে তার চর্চাও চলছে। গবেষণা-গার ছাড়া সম্প্রসারণ হয় না। দেশের মাটির সাথে সম্পর্কিত তথ্য যোগানোর ক্ষেত্রই গবেষণাগার। সুখী পরিবার গড়তে গেলে, উন্নত চাষ-আবাদের গতি অব্যাহত রাখতে হলে এবং শিল্প ও

শিক্ষার প্রসার উত্তরোত্তর বাড়াতে চাইলে যা যা করণীয় তার পথ বলে দেবে গবেষণাগার। আর কৃষকের ক্ষেতে ও কুটিরে সেই তথ্য সহজ ভাষায় তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে সম্প্রসারণ। আমাদের বহু আচরণ বিচারগ্রাহ্য হয় না, যুক্তিসহ বিচারের ধোপে টেঁকে না। বিচার ও আচারের মধ্যে এই ব্যবধান ও পার্থক্য অজ্ঞতারই পরিচায়ক; এটা কমিয়ে ফেলবার ভার সম্প্রসারণের। বিদ্যার ক্ষেত্রকে ওপর থেকে নীচে আনা, আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নতুন নতুন সমস্যাকে নীচে থেকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বহন করে সম্প্রসারণ।

আগের দিনে বাপ-দাদার ক্ষেত-খামারে বা চালু কারিগরের কর্মশালায় কিছুদিন সহকারী হয়ে অভ্যাস করলেই কাজ মোটামুটি রপ্ত হতো। কেউ চাষী, কেউ বা কারিগর বনতো। আনবিক যুগে একদিকে যেমন সব দ্রুত তালে চলছে, তেমনি চাহিদাও এখন অফুরন্ত ও প্রচুর। প্রাচীন মন্থর গতি অচল হয়ে উঠছে। বিপুল চাহিদা ও গতিশীলতার সংগে তাল রেখে যদি এগোতে চান তাহলে সরকারকে এ-বিষয়ে অনেকটা দায়িত্ব নিতে হবে। বিদ্যার দীপশিখা যদি ছড়িয়ে দিতে চান তাহলে তিনটি বিষয়—গবেষণা, বিদ্যাচর্চা ও সম্প্রসারণের নিবিড় সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। কৃষির উৎপাদন স্থায়িভাবে বাড়াতে হলে আপনাকে কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণা, কৃষিবিষয়ে শিক্ষা ও কৃষিবিদ্যার সম্প্রসারণ —এই তিনটির উপরই সমান জোর দিতে হবে এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

সমষ্টি উন্নয়নে সম্প্রসারণের স্থান ঃ

সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়, আমাদের সরকার তার জন্যে কতটা উদ্যোগী হয়েছেন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার কিছুটা আলোচনা করেছি। সমষ্টি উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য কি তাও উল্লেখ করেছি। পল্লীর ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের এক বিশিষ্ট
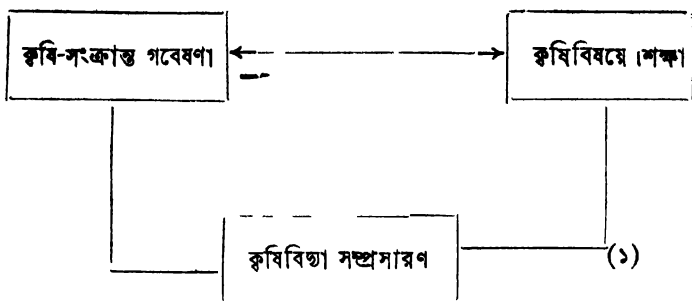
এই তিনটির সম্পর্ক যত নিবিড় হবে সম্প্রসারণের তত অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হবে।

পদ্ধতি হিসাবে এদেশে সম্প্রসারণ গ্রহণ করা হয়েছে। Extension has been accepted as a method and technique of Community Development। গ্রামের লোকের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য। সম্প্রসারণ এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক বিশেষ পদ্ধতি। যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সম্প্রসারণ এগিয়ে চলতে চায়—তাকে মোটামুটি তিন-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১। উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকে তরান্বিত করা এবং বৃদ্ধির গতি যাতে অব্যাহত থাকে সেই চেষ্টা করা।

২। পল্লীর সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা, কর্মনৈপুণ্যের উন্নতিসাধন এবং বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণার পরিবর্তন ঘটানো।

৩। স্থানীয় সংস্থা, যেমন পঞ্চায়েত, সমবায়, যুবসংঘ, মহিলা সমিতিগুলিকে সংঘবদ্ধ ও সংহত ক'রে সমষ্টি-জীবনকে শক্তিশালী করে তোলা।

---

(১) এই ছকটি FAO-এর আঞ্চলিক পরামর্শদাতা C. W. Chang-এর প্রবন্ধ হ'তে গৃহীত।

সম্প্রসারণের তিন দিক :

তিনটি দিকের মিলিত প্রচেষ্টায় সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই ত্রিধারাকে যতটা অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে সেইভাবে সম্প্রসারণের রাজপথ তৈরী হবে। পণ্ডিতদের এই অভিমত। এই তিনটি দিকের সম্পর্কে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করি।

সহায়তা দান বা সেবা (Extension Service)	জ্ঞানের বিস্তার (Extension Education)	লোকসংস্থা গঠন (Community Orgainsation)
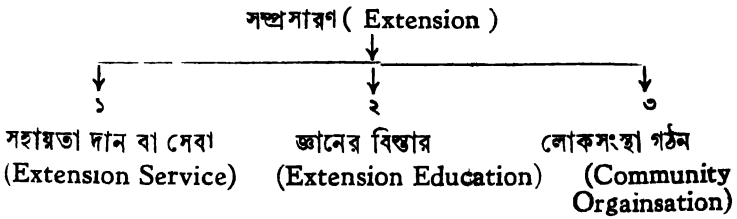
সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মূলকেন্দ্রে আছে জ্ঞানের বিস্তার অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তার বিস্তার। জ্ঞান বিস্তারকে সার্থক করার জন্য দরকার সুষ্ঠু সরকারীসহায়তা ও সক্রিয় লোকসংস্থা।

১। সহায়তা দান (Extension Service) :

কোন কাজ করতে গেলেই চাই অর্থ ও উপকরণ। এ-দুটির সহায়তা ছাড়া কিছু বড় একটা করা যায় না। শস্যের ফলন বাড়াতে হলে ভাল বীজ ও সারের যোগান সময়মত আসা চাই। সময়মত সুলভে ঋণ কৃষকদের দেওয়া চাই। মাঠে জলের ঘাটতি না পড়ে অথবা হঠাৎ জলস্ফীতিতে শস্য ডুবে না যায় তার জন্য সেচ ও জল নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা চাই। মাটি উত্তমরূপে চষতে গেলে ভাল লাঙ্গল চাই, বলিষ্ঠ বলদ চাই অথবা উপযুক্ত যন্ত্র চাই। যদি মনে করি খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবো তবে যাবতীয় উপ-করণের যোগান ঠিক রাখতে হবে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে এইসব দায়িত্ব বহন করবে সরকার। সহায়তাদানের এই উদ্দেশ্য নিয়েই

দেশের সর্বত্র সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক খোলা হয়েছে এবং দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে প্রতি ব্লকে অনেক শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, অর্থ ও উপকরণ সরবরাহ-ব্যবস্থাকে সুন্দর করবার চেষ্টা চলছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এটা নতুন অঙ্গরাগ। নতুন বিদ্যা বা নতুন প্র্যাক্‌টিস গ্রামবাসীকে গ্রহণ করাবার জন্যে সহায়তা দান একান্ত আবশ্যক। সম্প্রসারণের এটা সেবার দিক, যাকে বলা হয় এক্‌স্‌টেন্‌শন্ সার্ভিস।

২। জ্ঞানের বিস্তার (Extension Education):

২। এ-যুগের রঙ্গমঞ্চে রাজা নয়, বণিক নয়, রাষ্ট্রনেতা নয়, যন্ত্রশক্তি নয়, সাধারণ মানুষকে যদি প্রধান অভিনেতারূপে স্বীকৃতি দিতে চাই, তবে জনসাধারণকে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ক'রে গড়ে তোলা সবচেয়ে জরুরী কাজ। উদ্যোগী ও দায়িত্বশীল নাগরিক শিক্ষামূলক কর্মসূচী ছাড়া কখনও গড়ে ওঠে না। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই পথে ভাষা পায়। দিনে দিনে এগিয়ে চলার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের আলো আপামরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, বিচার-শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে সজীব ক'রে তোলা এবং স্বকীয় চেষ্টায় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার প্রযত্ন করা লোকতন্ত্রের মর্মকথা। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, বিপুল উৎপাদন ও টেক্‌নোলজির বিস্ময়কর উন্নতি নিয়ে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, মূলকথা এগুলি সাধারণ মানুষের কতটা কাজে লাগছে, তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে। সমস্ত সম্পদ যদি গুটিকতক কেন্দ্রকে আলোকসম্পাতে ঝলমলিয়ে দিয়ে গোটা দেশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখে তাহলে দেশের গৌরব বাড়ে না। এটা লজ্জারই কথা। বিদ্যার ব্যাপ্তি দেশময় ছড়িয়ে না পড়লে আর্থিক উন্নতি, সামাজিক সুবিচার ও গণশক্তির বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। জ্ঞানের স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রকে প্রসারিত ক'রে সাধারণের সামগ্রী ক'রে দেওয়া সমাজ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কারণ, শিক্ষাই সকল

শক্তির আধার। বিদ্যা প্রসারের এই দিকটাকে বলে—এক্‌স্‌টেন্‌শন্‌ এডুকেশন (Extension Education)।

৩। লোকসংস্থা (Community Organisation):

সমাজ উন্নয়নের অপরিহার্য অঙ্গ লোকসংস্থা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। লোকসংস্থা ছাড়া লোকশক্তির প্রকাশ হতে পারে না। আমলাতন্ত্র স্মার্ট আমলা গড়তে চায়—যারা চায় ক্ষমতা ও প্রতাপ। তারা রুটিন মাফিক কাজ করবে, ফাইল-দুরস্ত রাখবে, মাসপয়লায় মুঠো ভরে বেতন নিয়ে হাসিমুখে বাড়ী যাবে। সাধারণ মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতার কোন ভাবাবেগ সেখানে নেই। নিজের পদোন্নতি সেখানে মুখ্য, জনকল্যাণ বাই-প্রোডাক্ট। ধনতন্ত্র ধনতান্ত্রিক মানুষ গড়তে চায়—যে মানুষ দিনরাত বলছে, 'যত পার অর্জন করো, সঞ্চয় করো, ভোগ করো। সাধারণের দুর্বলতাই আমাদের বল ও সম্ভোগের উৎস।' কাজেই জনসাধারণ যত বিচ্ছিন্ন থাকবে ততই আমলাতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের লাভ। মানুষের মনে ভরসা, হাতে বল ও মুখে ভাষা দিতে গেলে পল্লীতে পল্লীতে তাদের নিজস্ব সংস্থা গড়ে ওঠা চাই-ই চাই। সম্প্রসারণের প্রকৃত আদর্শ সহযোগী ও সহভোগী মানুষ গড়া। তাই সজীব ও সক্রিয় লোকসংস্থা গঠন সম্প্রসারণের আর একটা দিক। এইদিক অপুষ্ট থাকলে সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

প্রাচীন ভারতে পল্লীগুলি ছিল জোটবদ্ধ। জনশিক্ষাও রক্ত-চলাচলের মত সমাজের সর্বদেহে স্বতঃসঞ্চারিত ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, পুরান-ভাগবতের কাহিনী সাধারণের মধ্যে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন সন্ন্যাসীর দল, কথকের দল, বাউলের দল, কীর্তনীয়ারদল, ফকির-দরবেশের দল। বিশিষ্ট জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে একটা চলাচল বরাবর বজায় ছিল। ইংরেজের শাসনাধীনে পড়ার আগে জীবনসংগ্রাম কখনও কঠিন হয়নি। কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা ও যজন-যাজন ছিল অনেকটা বংশগত। সমাজের

সর্বত্র একটা সন্তোষের ভাব তখন বজায় ছিল। এই অনুকূল পরিবেশ পেয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ভারতবাসীর ঝোঁক এসেছিল বেশী। বৈষয়িক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন উপকরণের উৎকর্ষসাধনের একটা দেশজোড়া চেষ্টা আগে কখনও তেমন হয়নি। দীর্ঘদিন পরাধীনতা ও কর্মবিমুখতার ফলে দেশ অনেক পিছিয়ে গেছে। আজ বহু সমস্যায় আমরা জর্জরিত। এই বহু সমস্যা-পীড়িত পল্লী উন্নয়নের কাজে আমরা সম্প্রসারণ-পদ্ধতি গ্রহণ করেছি।

সম্প্রসারণের পেছনে একটা দর্শন আছে

দর্শন কথার সহজ অর্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টি যাকে ইংরেজীতে বলে philosophy। এই তত্ত্বটা কি? বিশ্ব-নিয়মে ও সমাজজীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা, তার সাধারণ নীতি ও নিয়ম-কানুন বিশ্লেষণ করা দর্শনের কাজ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পেছনে যে অন্তর্নিহিত নীতি থাকে তার সমষ্টিই দর্শন। রাজনীতি বলুন, অর্থনীতি বলুন, সমাজনীতি বলুন, গার্হস্থ্যনীতি বলুন সকলের মূলে কোন-না-কোন একটা দর্শন আছে, যা থেকে আপনি বিচার করতে পারবেন এইসব তত্ত্বের প্রকৃতি। সম্প্রসারণের পশ্চাতেও এই রকম একটা তত্ত্বদৃষ্টি আছে যেটা প্রথমেই আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত; কেননা, দর্শনকে অবলম্বন ক'রে নীতি গড়ে ওঠে। আর নীতি অনুযায়ী কাজের পদ্ধতি স্থির করতে হয়। কাজেই সম্প্রসারণের পেছনে যে দর্শন আছে তা যদি আগে না জানি তাহলে সব চেষ্টাই শূন্যে ঘর বাঁধার সামিল হবে।

সম্প্রসারণ একটা ধারাবাহিক শিক্ষা-প্রচেষ্টা (An Educational Process) :

শিক্ষার পথ রাজপথ। সম্প্রসারণের এটা সবচেয়ে বড় ভিত্তিভূমি। শিক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করে। হৃদয়,

মন ও দেহে বোধ করি খুব বেশী তারতম্য নিয়ে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয় না। এ যেন একটি মাটির ডেলা। কুমোরের কুশলী হাত ও চাকের গুণে নানা বিচিত্র জিনিস গড়ে উঠতে পারে।

মানসিক ও শারীরিক গঠন, নিজেকে বড় করার জন্যে রোখ, সর্বোপরি পরিবেশ—এই তিনটি প্রতি মানুষের জীবনকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। কাউকে দেখি ধনীর ঘরে দুলাল হয়ে জন্মেছে, কেউ বা শাকান্নে মানুষ, শিক্ষিত সুসংস্কৃত পরিবারে কেউ মানুষ হচ্ছে, কারো ভাগ্যে জুটেছে বিদ্যাহীন আলোহীন পরিবার। পরিবেশের এই বিরাট পার্থক্য মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। ভবিষ্যৎ সমাজের ছবি মানসপটে রেখে সমান সুযোগের মধ্যে শিশু-দের গড়ে তুলতে পারলে সবাই ঋজু হয়ে বেড়ে উঠতো। জীবিকার জন্যে সুস্থ ও পরিচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম করতে শিখতো। কেননা, অনুকূল পরিবেশও বাস্তবানুগ শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণতা দেয়। বিদ্যা সম্প্রসারণের পেছনে আছে এই বিশ্বাস। পল্লীর কৃষককে নিছক ফসল-উৎপাদক চাষী হিসেবে এবং তার স্ত্রীকে কেবল কৃষক-পত্নী হিসেবে বিচার করলে সম্প্রসারণ কর্মীর ভুল হবে। ওরা বৃহত্তর সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওদের জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে হবে। এই পরিপূর্ণ বিকাশের কথা স্মরণে রেখে রচিত হবে ওদের যাবতীয় পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী।

গণশক্তির বিকাশ সম্প্রসারণের প্রাণ (A Democratic Process):

জনমতকে মর্যাদা দান, গণশক্তির বিকাশ সাধন, গণশক্তির হাতে ক্ষমতা সমর্পণ এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মানবিক গুণাবলীর স্ফুরণ গণতন্ত্রের লক্ষ্য। সম্প্রসারণ এই আদর্শের অনুগামী। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'

সম্প্রসারণ দর্শনের এটাই সার কথা। সম্প্রসারণ-কর্মীর কাছে তাই পথের দিশারী হবে আমাদের প্রিয় কবির জ্বলন্ত বিশ্বাস—

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।*

জাতিভেদ, ধর্মভেদের বাধা সম্প্রসারণ-কর্মীর চিত্তকে পঙ্কিল করবে না। গ্রামবাসীর সংগে তার গড়ে উঠবে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক। সম্প্রসারণের কাজে জুলুম নেই, শঠতা নেই; আছে শুভেচ্ছা ও অনুরাগ। সম্প্রসারণ-কর্মী জোর ক'রে কারো ওপরে কিছু চাপিয়ে দেবেন না। বন্ধুর মত মানুষকে শিখিয়ে দেবেন, হিতৈষীর মত বুঝিয়ে দেবেন, প্রিয়জনের মত সমঝিয়ে দেবেন। পল্লীতে হবে তার বাস, পল্লীবাসীর সংগে করবেন কাজ। তাদের অভাব-অসুবিধা দরদী মন নিয়ে জেনে নেবেন ও বুঝে নেবেন। গণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্প্রসারণের উৎস-শক্তি।

নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতাই সম্প্রসারণের ধর্ম (A continuous Process) :

সাধারণ মানুষ বা কোন পরিবার যে অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা থেকেই সম্প্রসারণের সুরু। আর এই অবস্থার যেমনতর পরিবর্তন হওয়া দরকার সেইদিকে সম্প্রসারণের গতি। অর্থাৎ পাওয়া থেকে চাওয়ার দিকে মানুষের মনকে টেনে নেওয়া। তার মানে, জমি থেকে এখন যা ফলন পাচ্ছি তার দেড়গুণ বা দু'গুণ পেতে চাই; ছোট একখানা দোচালা ঘরে এখন ঘরকন্না নির্বাহ করছি, একটু বেশী জায়গা জুড়ে একখানা চারচালযুক্ত শয়নঘর ও একখানা রান্নাঘর আমার একান্তই চাই। বর্তমান অবস্থা থেকে ইপ্সিত অবস্থায় পৌঁছানোর ধাপে ধাপে সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস রচিত

* 'সাম্যবাদী'—কাজী নজরুল ইসলাম।

হয়। সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতির যাত্রাপথে কোনদিন দাঁড়ি পড়বে না। অজানা থেকে জানার দিকে, না-পাওয়া থেকে পাওয়ার দিকে মানুষের চিরন্তন গতি। সম্প্রসারণ এই গতির বাহন। গতিশীল সমাজে বিদ্যা সম্প্রসারণের কাজ কখনও ফুরোয় না। সব জাতিরই প্রাণস্পন্দন ও শিক্ষা পায়ে পায়ে মিলিয়ে চলে। নিত্য পরিবর্তনশীল মানব-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা নিয়ে সম্প্রসারণের কারবার। এটা একঘেয়ে কাজ নয়।
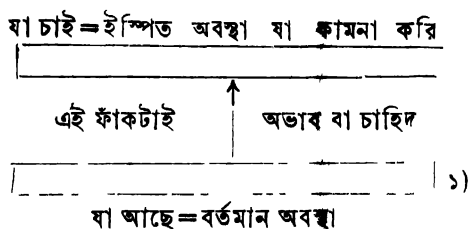
নিয়ত এই ফাঁক পুরণ করে যাওয়াই সম্প্রসারণের কাজ। এ-চলার শেষ নেই। উৎপাদন উপকরণের বিবর্তন ঘটেছে। প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ, লৌহযুগ, কয়লা ও ইস্পাতের যুগ পেরিয়ে আমরা অ্যাটমিক যুগে এসে পৌঁছেছি। শিকারী মানুষ পশুপালন সুরু করলো, তারপর যাযাবর জীবন ছেড়ে নিল কৃষি; এখন শিল্পের যুগ চলছে। রুচির বদল হচ্ছে, চাহিদার উঠতি-পড়তি ঘটছে, হাতিয়ারের চেহারা পাল্‌টাচ্ছে। এই গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাক, সমাজ-জীবন যেন স্থিতিশীল হয়ে না পড়ে তারই জন্যে সম্প্রসারণ।

শিক্ষা গণতন্ত্র ও গতিশীলতায় বিশ্বাস সম্প্রসারণের বুনিয়াদ। এই দর্শনের উপরই সম্প্রসারণের যাবতীয় নীতি গড়ে উঠেছে।

১। এই ছকটি FAO-এর আঞ্চলিক পরামর্শদাতা C. W. chang-এর প্রবন্ধ হতে গৃহীত।

সম্প্রসারণের কয়েকটি মূলনীতি ঃ

১। স্থানীয় অবস্থা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে নিয়ে কার্যক্রম স্থির করতে হবে (Extension is based on analysis of facts that exist locally.)

অতীত অবস্থার ইতিহাস ও অনাগত জীবনের সুখস্বপ্ন নিয়ে সম্প্রসারণের কারবার কম। কোন গাঁয়ের যে জোতভূমি, যে মানুষ, যে ঘরদোর, যে সমষ্টি-জীবন এখন দেখছেন, এ-অঞ্চলের মানুষের সংঘজীবন, ধর্মজীবন, সামাজিক রীতিনীতি, আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান যা প্রত্যক্ষ করছেন তা দ্বারা এক-একটি পরিবার কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং সমষ্টি-জীবনেই বা তার কতটা প্রতিফলন হচ্ছে সেটা ভাল ক'রে বুঝে নেওয়া প্রথম কাজ। স্থানীয় অবস্থা ঠিকমত জেনে নেওয়া সম্প্রসারণ-কর্মী হিসেবে আপনার কাজের একটা প্রধান অঙ্গ।...to learn about the environment is a very important part of the job।

মনে করুন, আপনি একজন সম্প্রসারণ-কর্মী। কোন গ্রামে গিয়ে দেখলেন, ঘরে ঘরে জ্বর-জ্বারিতে অনেকে ভুগছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় কেউ বললো, 'ম্যালেরিয়ায় শেষ হ'য়ে গেলাম।' কেউ বললো, 'খেতেই পাই না, রোগ সারবে কেমন করে ?' আবার কেউ জানালো, "উঃ, কি যে মশার উৎপাত হয়েছে।" ঘুরতে ঘুরতে এমনিতর আরো অনেক তথ্য আপনার সংগ্রহ হলো ; গ্রামের চারপাশের অবস্থাও নিজ চোখে দেখে নিলেন। তারপর মনে মনে সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ ক'রে একটা যোগসূত্র খুঁজে বের করুন। দিনকয়েক পরে ওদের জনকয়েককে এক জায়গায় জমায়েত ক'রে সমস্যার চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরুন এবং বলুন, ভাই,—

১। মশার দ্বারাই প্রধানত ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

২। আর বদ্ধ-জলই যত মশার জন্মস্থান।

৩। আপনাদের গাঁয়ে এমনি ৮টি হাজামজা পুকুর আছে; তাতে যেমন পাঁক তেমনি কচুার পানা।
৪। মাছ মশককীট খেতে কিন্তু খুব ভালবাসে।
৫। সাফ ও টল্‌টলে জল না হ'লে মাছের চাষ ভাল হয় না।
৬। এইসব পুকুরগুলি সংস্কার করা যায় নাকি ?
৭। একটা বুদ্ধি বাতলাতে পারেন ?

এইভাবে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ বের করা সম্প্রসারণের প্রথম নীতি। এতে সমস্যার গোড়ায় হাত দেওয়া যায়।

২। সম্প্রসারণ মানুষের অনুভূত প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করবে (Extension aims at meeting the felt needs of the people.):

মানুষের তৃষ্ণার শেষ নেই, প্রয়োজনেরও অন্ত নেই। কিন্তু সব প্রয়োজনের জন্যে মানুষ সমান অস্থির হয়ে ওঠে না। এমন কতকগুলি প্রয়োজন আছে যা আপনার বিচারে মনে হবে খুবই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত; কিন্তু দেখতে পাবেন সবগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট মানুষটির সমান তাড়না নেই। আবার এমন প্রয়োজন দেখতে পাবেন যার কষাঘাতে সে অস্থির হয়ে উঠেছে, এবং যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই শান্ত হতে পারছে না। যে প্রয়োজনে আপনাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, আপনাকে অস্থির ক'রে তোলে, যার তাড়নায় আপনার কর্মশক্তি জেগে ওঠে, তাকেই বলে অনুভূত প্রয়োজন বা felt need। আর যে প্রয়োজনের কথা আপনার শান্ত মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, অপরের বিচারে যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় সেটা যদিও real need কিন্তু unfelt need।

যে-কোন পল্লীর দিকে নজর দিলেই দেখতে পাবেন পল্লীবাসী নানা সমস্যায় জর্জরিত। পরিবারপিছু জমির পরিমাণ কম, সেচের

জল নেই, সুলভে ঋণ মেলে না, বাসোপযোগী ঘর নেই, পরণে উপযুক্ত কাপড় নেই, শিক্ষা নেই, রাস্তাঘাট নোংরা, এমনি কত কি। সবগুলিই অত্যন্ত মৌলিক ও যুক্তিসঙ্গত সমস্যা এবং সমাধান করা প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সঙ্গে সবগুলিতে হাত দেওয়া সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। যেগুলিতে দেখবেন গ্রামবাসীর গরজ বেশী সেইসব সমস্যা সমাধানের কথাই আগে ভাববেন। চল্‌তি কথাতেই বলে—'গরজ বড় বালাই।' যেখানে গরজ আছে সেখানে দায় বইবার ঝোঁকও মিলবে। এই কারণেই অনুভূত প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা উচিত; যে প্রয়োজনের অনুভূতি স্থানীয় লোকের মধ্যে কম তাতে হাত দিলে সাড়া তেমন পাবেন না।

৩। চোখে দেখে ও হাতে করে শেখা (Seeing is believing & Learning by doing):

সম্প্রসারণ আগে চোখে দেখে তবে বিশ্বাস করতে বলে। নিজ হাতে করে শিখতে বলে। "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক তফাৎ।"* দুধের কথা শোনা, দুধ দেখা, আর দুধের মধ্যে কলা ফেলে ভাত দিয়ে মেখে খাওয়া—তার কি কোন তুলনা হয়! এই কারণেই রেজাণ্ট ডিমনস্‌ট্রেশন্‌ ও মেথড্‌ ডিমন্‌স্‌ট্রেশন্‌কে সম্প্রসারণ শিক্ষায় খুব বেশী মূল্য দেওয়া হয়।

৪। সম্প্রসারণের সবকিছু কার্যক্রমের পেছনে সুচিন্তিত কর্মসূচী থাকবে (Extension should have a plan of action):

ভাবনা নেই, চিন্তা নেই কোন রকম প্রস্তুতি নেই হঠাৎ করে কিছু করা সম্প্রসারণ নীতি-বিরুদ্ধ। প্রোগ্রাম ক'রে, প্ল্যান ক'রে কাজে নামা সম্প্রসারণের একটি প্রধান নীতি। সম্প্রসারণে বলে—Plan your work and work your plan; কাজে নামবার

*ঠাকুর রামকৃষ্ণ—কথামৃত ১ম, ১৩৯ পৃঃ।

আগে প্ল্যান তৈরী কর, তারপর প্ল্যানকে রূপ দাও। প্ল্যানবিহীন কাজ কখনও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় না।

৫। ক্রমবিবর্তনের পন্থা অনুসরণ ক'রে সম্প্রসারণ এগিয়ে চলতে চায় (Extension develops programme gradually):

এমন উন্নয়ন প্রোগ্রাম নির্বাচন করতে হবে যা পল্লীবাসী সহজে বুঝতে পারে, যার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং যেটা হাতে নেবার মত সামর্থ্য তাদের আছে।—এধরনের প্রোগ্রাম নিতে হলে ধীর স্থিরভাবে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে জনসহযোগিতা হারাতে হবে। তাই সম্প্রসারণের প্রোগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হয়। সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে রদবদল করে নিতে হয়। অনমনীয় প্রোগ্রাম ও মনোভাব সম্প্রসারণে সম্পূর্ণ অচল। গণতান্ত্রিক কাঠামো যার ভিত্তি সেখানে অনমনীয় কোন কার্যসূচী গ্রহণ করলে কখনও কাম্য ফল লাভ করা সম্ভব হবে না। "The programmes are to be flexible to meet the changing needs, attitude and capacity. *

৬। সম্প্রসারণের কর্মধারা কখনও একতরফা হবে না; আদান ও প্রদান উভয় দিকই নিষ্ঠার সংগে অনুসৃত হবে (It is a two-way channel):

গবেষণাগারে পরীক্ষালব্ধ ফল, যা পাওয়া গেছে, তা সহজ সরল ভাষায় কৃষকদের মধ্যে যেমন বিস্তার করা হবে, তেমনি বাস্তব জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চাষবাসের নিত্য নতুন উদ্ভূত সমস্যা অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের গোচরে আনতে হবে। এই দু'টো দিক সমান তালে না চললে সম্প্রসারণ বাস্তবশূন্য হয়ে পড়ে। এই হিসেবে একে two-way education বলা যেতে পারে।

* The scope of Extension—National Institute of community Development—Govt. of India—Page 6.

সম্প্রসারণ-কর্মী যেমন কতকগুলি সমস্যা সমাধানের উপায় শেখাবে, তেমনি বহু সমস্যা সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করবে :

৭। প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কারের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করাই সম্প্রসারণের নীতি (Extension wants to work in harmony with culture and tradition of the people) :

সমাজ-জীবনে সংস্কারের প্রভাব প্রবল। এক-একটি জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে দিনে দিনে নানা রীতিনীতি গড়ে ওঠে, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। লোকের রুজি রোজগারের পদ্ধতি, হাতিয়ারের ব্যবহার, তার আচার-আচরণ, চাল-চলন, পরন-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, রুচিবৃত্তি, ধর্মবিশ্বাস, গোষ্ঠীপ্রীতি, দৃষ্টিভঙ্গী সব জড়িয়ে সংস্কৃতির প্রকাশ। এর পেছনে সমাজের একটা সমর্থন থাকে, একটা অনুমোদন থাকে। রীতিনীতি ও সংস্কৃতির আবার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু আচম্‌কা আঘাত দিয়ে রূপান্তর ঘটাতে গেলে সমাজের প্রতি-ঘাত এসে বাধা দেয়। কাজেই প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নতুনের প্রবর্তন করা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য। যা-কিছু পুরাতনকে ফুৎকারে ঝাঁটিয়ে বের ক'রে দিয়ে নতুন সব কিছুকে নিমেষে বরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

আমাদের দেশে, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে, দেব-দেবীর প্রতি গভীর বিশ্বাস পল্লী অঞ্চলে দেখতে পাবেন। গাঁয়ের ঘরে ঘরে শনি, ষষ্ঠী, সাওনাই, সুবচনী পুজোর অন্ত নেই। সাপের ছোবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মনসা পুজো, বসন্তের আক্রমণ এড়াবার জন্যে শীতলা পুজো, কলেরার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ওলাদেবীর অর্চনা। পল্লীরমণীর দীর্ঘদিনের এই সংস্কারে সম্প্রসারণ-কর্মী সোজাসুজি কখনও আঘাত দেবেন না। তাঁর কথা বলার ধরণ হবে—মাগো, একুল ওকুল দুকুল রাখ। পুজোও কর, ডাক্তারও দেখাও। দেবীকে ডাকো, ওষুধও খাও। ওষুধে হেলা করো না। যে দিক দিয়ে

হোক্‌ দেবীর কৃপা আসুক। এইভাবে সংস্কারের মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করতে হবে।

হতাশায় নৈরাশ্যে আমাদের দরিদ্র চাষীর মুখ দিয়ে হামেশাই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে—'হা খোদা!' সে প্রাণপাত করে খেটেখুটে বিঘেকয়েক জমিতে ধান রুয়েছে বড় আশা মনে নিয়ে। আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি আর এল না, মাঠের ধান মাঠেই পুড়ল। দুঃখী চাষীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—'হা খোদা!' ভগবান অকরুণ হলেন তাই ফসল মারা গেল। আপনি যদি জবাবে বলেন—'সেচের কোন ব্যবস্থা করোনি, আবার খোদা কি, আল্লা কি করবেন?' তাহলে ওদের আজন্ম সংস্কারে আঘাতই লাগবে, কোন কাজই হবে না। খোদার নাম করে এমন আওয়াজ তার মুখে আপনাকে তুলে দিতে হবে যা তার বাহুতে দেবে বল, চিত্তে দেবে ভরসা। আপনি বলবেন, 'বল ভাই, ইলাহী ভরসা! চলো জোট বাঁধি, সবাই মিলে আগামী-বার সেচের ব্যবস্থা করি, আকাশ-বৃষ্টির ওপরে আর নির্ভর করে থাকবো না। এতে ভগবান সহায় হবেন। সোনার ফসল ঘরে তুলতে পারবে।' এইভাবে সংস্কারে সোজাসুজি আঘাত না দিয়ে মানুষকে সক্রিয় করে তোলা সম্প্রসারণের নীতি।

৮। সমাজের সকল শ্রেণী ও জাতির মধ্যে সম্প্রসারণের কর্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে (Extension work is with all the classes of society)।

সম্প্রসারণ-কর্মী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ধনী ও দরিদ্র, আদিবাসী, হরিজন, বয়স্ক ও তরুণ সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করবেন। আমাদের পল্লীতে শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিভেদ ও ধর্মান্ধতা বেশ আছে। সম্প্রসারণ-কর্মী এই ভেদবুদ্ধি কমিয়ে তার কাজের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব আনবার চেষ্টা করবেন।

৯। উদ্যমী লোককে সহায়তা দান সম্প্রসারণের একটি নীতি (To help people is to help themselves)।

কথায় বলে আছাড় না খেলে কেউ হাঁটাতে শেখে না। আমাদেরও সব গড়া ও সব শিক্ষার মূলে এই একই কথা। যার পেছনে চেষ্টা নেই সেখানে কোন মমতা জন্মে না, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আপনার গ্রামে ৩০।৪০ ঘর গরীবের এক ছোট্ট পল্লী আছে। তাদের দুর্গতি দেখে আপনার এক ধনী বন্ধুর প্রাণ কেঁদে উঠল। লোকলস্কর, টাকা-পয়সা, মালপত্র নিয়ে এসে তিনি ওদের সকলের জন্য একটা করে পাকাবাড়ী, স্যানিটারী পায়খানা, পাকা ড্রেন, কলের জল, সব করে দিলেন। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করালেন। প্রত্যেকের বাড়ীতে একপ্রস্থ ধুতি-শাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, ব্যাঙ্কে একটা করে একাউন্ট খুলে দিলেন। ওরা বিস্ময়ে দেখল যে, একটা ভৌতিক কাণ্ড ঘটে গেল। এই যে কষ্ট না করে কেষ্ট পাওয়া—এতে কি ওদের দরদ জন্মাবে, না আত্মবিশ্বাস বাড়বে? এই সব জিনিস কি ব্যবহার করতে শিখবে? বাইরের জৌলুষ এইভাবে বদলে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি মানুষের সত্যিকারের উন্নতি করা যায়? এই কারণেই সম্প্রসারণের নীতি জনপ্রচেষ্টার পিছে পিছে সহায়তা দান অর্থাৎ aided self-help. সম্প্রসারণ-কর্মীর লক্ষ্য হবে—'to work with the people and not for the people'.

১০। সম্প্রসারণ-কর্মী নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন না, স্থানীয় নেতার সাহায্যে কাজ করবেন। (Extension worker does not assume leadership but works through local leaders)

সম্প্রসারণ কর্মী কখনও সোজাসুজি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন না, কিন্তু সকল কাজেই তার পরোক্ষ নেতৃত্ব থাকবে। প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব করতে গেলে গ্রামবাসী কোন কাজই আর নিজের বলে গ্রহণ করবে না। সব কিছুই কর্মীর দায় হ'য়ে দাঁড়াবে। এই কারণেই স্থানীয় নেতাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা উচিত। তারা থাকবেন সামনে, আর সম্প্রসারণ-কর্মী থাকবেন অন্তরালে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ?

সম্প্রসারণ মানে শিক্ষার প্রসার, পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের বিস্তার। এখন প্রশ্ন, শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ? বহু মনীষী শিক্ষার বহু সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের প্রকাশভঙ্গীতে তফাত আছে, কিন্তু সকলেরই সুর প্রায় একতানে বাঁধা। এই মনীষীদের পথ ধরেই শিক্ষার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করুন। গোড়াতেই মনে রাখবেন—জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা একই সূত্রে গাঁথা। শুধু পুঁথিগত যে শিক্ষা, জীবন ও জীবিকা থেকে বিচ্যুত যে শিক্ষা—সেটা শিক্ষাই নয়। যে শিক্ষা মানুষ তৈরী করতে সক্ষম, জীবনী-শক্তি প্রদানে সমর্থ, সবল চরিত্র গঠনে পটু, তাকেই আপনি সত্যিকারের শিক্ষা বলবেন। স্বামীজীর কথা মনে করুন—'It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want.' মানুষ গড়ার তত্ত্ব চাই। যে শিক্ষা সম্পূর্ণ মানুষ গড়তে পারে সেই শিক্ষাই আমাদের দরকার। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার কৌশল শিক্ষা দিল না, যে শিক্ষায় প্রতিবেশীর প্রতি দরদ জন্মালো না, তাকে স্বামীজী শিক্ষা বলতে নারাজ।

কবি রবীন্দ্রনাথের মানসপটে বিদ্যালয়ের যে চিত্র ছিল তা একবার দেখুন।—"ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবন-যাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল

লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সংগে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।"* এই আদর্শে শিক্ষাদান ও এই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কামনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন।

বর্তমান কালে সম্প্রসারণ বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ডঃ জে. পল. লিগান্সের সংজ্ঞাটি অনুধাবন করে দেখুন, "চারিদিকের পরিবেশকে মানুষ যে চোখ দিয়ে দেখে, তা থেকে প্রতিনিয়ত যেসব তথ্য ও তত্ত্ব সে আহরণ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে অর্জিত এই জ্ঞানকে যতটা কাজে লাগাতে পারে সেই অনুপাতে জীবন ও জীবিকার পথ রচিত হয়। এই অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যলাভের ধাপ-গুলিকেই শিক্ষা বলে।" গতিশীল দুনিয়ায় আমরা নিজের আচার-আচরণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মনিপুণতাকে এইভাবে দিনের পর দিন ঝালাই ক'রে বাজিয়ে নিচ্ছি, মার্জিত করছি। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব পড়ছে আমাদের মনে ও জীবনে; আবার আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মরীতি পরিবেশকে করছে রূপান্তরিত। এই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করছে, শিক্ষিত হচ্ছে। এমনিভাবে 'মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি উৎসব চলছে।' তাই শিক্ষাকে গান্ধীজী জীবনের আমরণ সঙ্গী বলেছেন; জীবন ও শিক্ষা পাশাপাশি চলে। "Education for life, and through life—as co-extensive with life itself."

সম্প্রসারণ শব্দের মধ্যে শিক্ষার এই অর্থই নিহিত আছে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে এমন ইপ্সিত (desired) পরিবর্তন ঘটাতে চায় যা তার আচরণ বদলে দেবে, কর্ম-প্রণালীতে নূতনত্ব আনবে। লোকের জ্ঞানে, মনোভাবে, কর্মকুশলতায় ও কর্মপ্রবণতায় বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনাই সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য। মহামতি প্লেটোর ভাষায় '...it (education) means teaching them to behave as

* রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

they do not behave.' সময়কালে যে আচরণ করা মানুষের উচিত সেদিকে প্রবুদ্ধ করাকেই তিনি শিক্ষা বলছেন।

সকল মানুষের মধ্যেই বিপুল সম্ভাবনা নিহিত থাকে। প্রত্যেকেই এক একটি শক্তির আধার। সে শক্তি কেবল অজ্ঞতার আবরণে থাকে ঢাকা। এই আবরণ উন্মোচন কবাই শিক্ষার বড় কাজ। এতে মানুষে মানুষে তফাতের গণ্ডি ক্রমশ কমে আসে। এই বিশ্বাসই সম্প্রসারণের ভিত্তিভূমি। নিছক আক্ষরিক জ্ঞান, শিক্ষার আদিও নয়, অন্তও নয়। তাই জোরের সঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—"Every soul is a sun covered with clouds of ignorance; the difference between soul and soul is due to the difference in density of these layers of clouds."

কাজেই সম্প্রসারণ শিক্ষার আদর্শকে সঠিক রূপ দিতে পারলে সমাজজীবনে প্রতি মানুষের মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তন দেখা দেবে—

(১) নিজের সম্বন্ধে এবং পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বদল ঘটবে, পরিবর্তন দেখা দেবে।

(২) যে যেমন কাজে রত আছে সেখানে কর্মরীতিতে পবি-বর্তনের ছোঁয়াচ লাগবে।

(৩) মানসিক বিকাশ ও দৈহিক কর্মকুশলতার পথ উন্মুক্ত হয়ে উঠবে।

(৪) দেশ, সমাজ ও লোক-প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হবে।

চলতি শিক্ষার সঙ্গে সম্প্রসারণের পার্থক্য কোথায়?

শিক্ষার কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধরাবাঁধা স্কুল-কলেজের এক ছবি, যেখানে অনেক বছর ধরে ছেলেমেয়েরা পড়া-শোনা করে। পড়তে হয় ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা; চর্চা চলে দেশের ঐতিহ্য, পুরাতন প্রথা, আচার-আচরণের

ক্রমবিকাশের ধারা নিয়ে। ছেলেমেয়েদের এখানে আসতে বাধ্য করা হয়। এখানে শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়ভেদের বেড়া আছে। কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে সকলকে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর 'চাপরাশ্' জোটে। ভবিষ্যৎ জীবিকার প্রস্তুতির স্থান এই বিদ্যালয়।

সম্প্রসারণ শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। স্কুল-কলেজের বাইরে ঘরোয়া আবহাওয়ায় শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। গ্রামের বয়স্ক ও যুবকদের প্রয়োজনের তাগিদে এই শিক্ষা। শিক্ষা নেওয়া বা না-নেওয়া পল্লীবাসীর ইচ্ছাধীন। জীবিকার প্রস্তুতির জন্যে সম্প্রসারণ শিক্ষা নয়; জীবিকাকে উন্নত ও মার্জিত করার পথ দেখায় সম্প্রসারণ। ব্যবসায়ী বা দোকানীরা আপন আপন সামগ্রী বেচার জন্য ক্রেতার সামনে তুলে ধরে। এর পেছনে মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশা থাকে। সম্প্রসারণ-কর্মী কিন্তু জিনিস বেচে না। পণ্য হিসেবে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যায় এমন সব সংবাদ ও তথ্য, এমন টেক্‌নিক্ ও চিন্তাধারা যা তাদের চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করবে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে, প্রচলিত হাতিয়ারকে উন্নত করার প্রণালী বলে দেবে, জীবনযাত্রার রীতিতে পরিবর্তন ঘটাবে। এখানে উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়; পল্লীবাসীর মনোভাবে, কর্মধারায় ও জ্ঞানের পরিধিতে এমন পরিবর্তন আনা যা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর করবে।

চাষ-আবাদ করতে গিয়ে চাষীরা, জিনিসপত্র গড়তে গিয়ে কারিগররা, ঘরকন্না চালাতে গিয়ে গৃহিণীরা, রোজকার জীবনে হামেশা যেসব বিষয়ে হোঁচট খায়, যার অভাব অত্যন্ত অনুভব করে সে-ই সব সমস্যা সমাধানের পথ বলে দেওয়াই বিদ্যাসম্প্রসারণ। আর গ্রামবাসী আপন খামারে, কর্মশালায় ও সংসার জীবনে এইজ্ঞান যাতে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারে সেটা নিজের হাতে করে দেখিয়ে ও শিখিয়ে দেওয়া সম্প্রসারণ-কর্মীর কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় বা

কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ না পেলেও জ্ঞানের আলো ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাই সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য।

পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে সম্প্রসারণ:

গাছ বলতে আমাদের মনে ভেসে ওঠে—মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—এই পাঁচ উপাদানের সমন্বয়ে জীব-দেহ। ঠিক তেমনি পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে সম্প্রসারণ শিক্ষার একটা আবর্ত সম্পূর্ণ হয়। কোন একটাকে ছাঁটাই করবার জো নেই। একটা আবর্তের শেষে দেখা যায়—কোথা থেকে কোথা এলাম। যা বাসনা করেছিলাম তা পেলাম কি না। "কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব তার নাই ঠিকানা"—কবির এই ভাবপ্রবণ উক্তি সম্প্রসারণের কথা নয়। কোথায় আছি বুঝে নেওয়া, কোথায় যাব স্থির করে ফেলা, কেমন করে যাব ঠিক করা, কতটা এলাম পরখ করা, আবার যাত্রায় নতুন পথে পা বাড়িয়ে দেওয়া সম্প্রসারণের কথা। একটা রেখাচিত্র এঁকে কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করি।
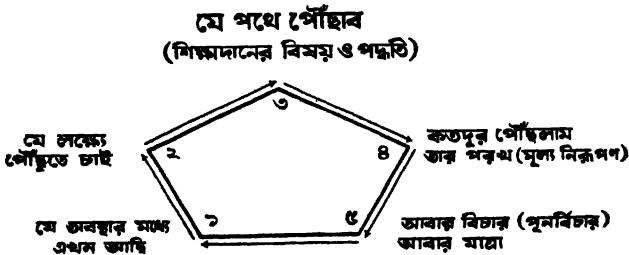
এই পাঁচটি মিলিয়ে তবে সম্প্রসারণের একটা পাঠ। এ আবর্তের শেষ নেই। উপনিষদের ভাষায় অনবরত বলছে—"চরৈবেতী, চরৈবেতী।"—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।*

---

* অধ্যাপক J. Paul Leagans লিখিত প্রবন্ধ "Extension Education—Why and How" হ'তে নক্সাটি গৃহীত হয়েছে।

(১) ভাবের জাল বুনে সম্প্রসারণ শিক্ষা চলে না। এতে স্বপ্ন-বিলাসের স্থান কম। মাটির রস থেকে বিচ্যুত হ'লে সম্প্রসারণ দাঁড়াতে পারে না। কাজেই যে অবস্থার মধ্যে এখন আছি তাই নিয়ে সম্প্রসারণের সুরু। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণে এর আরম্ভ। কোথাও বেরুবার আগে যেমন অনেক জিনিসপত্র গোছ-গাছ কবে নিতে হয়, সম্প্রসারণ শিক্ষা অভিযানের গোড়াতেই তেমনি অনেক তথ্য কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয়—স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থ, শিক্ষার মান, তাদের চাওয়া, তাদের চিন্তা, তাদের অভাব-অভিযোগ, তাদের সংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতি সব কিছু। তাছাড়া দেখা দরকার—সেখানকার মাটির প্রকৃতি কেমন, চাষবাসেব ধরণ কেমন, কোন শিল্প চালু আছে কি না, নতুন কোন শিল্পেব সম্ভাবনা কেমন আছে, বেচা-কেনার সুবিধা কি, এক একজন চাষীব জোতজমির পরিমাণ কত, কি কি ফসল জন্মাচ্ছে, ঘরদোরগুলি কেমন, দলবদ্ধ হয়ে কাজের দিকে ঝোঁক কতটুকু, পথঘাটের অবস্থা কি? সব খুঁটিয়ে জোগাড় করা চাই। পঞ্চায়েত, সমবায়, কিশোর সংঘ, মহিলা সমিতি জাতীয় কোন লোকসংস্থা গ্রামে গড়ে উঠেছে কি না; উঠে থাকলে, তারা কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং কি ধরণের কাজ করছে তা বুঝে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে সরকারী কোন্ বিভাগ কাজকর্ম কতটা কি করছে। এইসব তথ্য সংগ্রহ না করলে কোন পল্লীর সমস্যা সঠিক ধরা যাবে না।

বর্তমান অবস্থার এমনিভাবে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে সমাজ বিবর্তনের পথরেখা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সম্প্রসারণ-কর্মীর পক্ষে তখন আশু লক্ষ্য স্থির করা সহজ হবে। সমস্যার সঙ্গে লড়বার নতুন উদ্দীপনা তিনি জাগাতে পারবেন।

(২) সমস্যা চেনার পরেই সমাধানের প্রশ্ন আসে। সমস্যা তো অনেক। কোন্‌টাতে বা কয়টাতে সবার আগে হাত দেওয়া

হবে এবং যাতে হাত দেওয়া হবে তার কতটা সমাধান করা যাবে, এই সময়েই সেটা স্থির করে ফেলতে হয়। একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার—লক্ষ্য হিসেবে যেটুকু ধরবো তাতে যেন পৌঁছতে পারি। নইলে ক্ষোভ দেখা দেবে।

(৩) লক্ষ্য যখন ঠিক হ'ল তখন যাত্রা হবে সুরু। এবার আমাদের স্থির করতে হবে—কী শেখাব, কেমন করে শেখাব। স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে কর্মীকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও টেক্‌নিক বেছে নিতে হয়। কোন পরিবারের সঙ্গে যদি অন্তরঙ্গ হয়ে মিশতে চাই কী হবে আমার পথ? ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার রেওয়াজ যদি আনতে চাই কোন্ পথ অবলম্বন করবো? আবার বহু লোকের কাছে আমাব বক্তব্য একই সময়ে পৌঁছে দেবই বা কেমন করে? এই সময় তার প্ল্যানও হবে, কাজেও নামতে হবে। . . .

(৪) 'মা ফলেষু কদাচন'—শাস্ত্রের এই পবামর্শে আমাদের চিত্ত ভরে না। আমবা প্রায় সবাই হাতে হাতে ফল দেখতে চাই। সম্প্রসারণেও এবার সেই ফলাফল পবখ করার পালা। নিশানায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো গেছে কি না, পদ্ধতিগুলি কি পরিমাণে কার্যকরী হয়েছে, কাজেব শেষে সেটা যাচাই কবা একান্ত প্রয়োজন। স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীর মান নিরূপণ করা হয় পরীক্ষার উত্তরপত্রে, সম্প্রসারণে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হয় কর্মের ধরণ ও সাফল্যের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককেও আত্মসমালোচনা করে নিজের মূল্যায়ন করে নিতে হয়।

(৫) সবার শেষে আগাগোড়া পর্যালোচনা করা দরকার। সুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কী দাঁড়ালো এখন হবে তার যাচাই। আগের অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে, সেটা বুঝে নতুন লক্ষ্য আবার স্থির করতে হবে। তারপর পুনরায় যাত্রা। এ-যাত্রার আরম্ভে দেখা যাবে—সম্প্রসারণ-কর্মীর অভিজ্ঞতা বেড়েছে, স্থানীয় লোকের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলেছে, বাস্তব অবস্থারও কিছু রূপান্তর ঘটেছে।

কোন সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচীতে এই পাঁচটি দিক থাকা চাই-ই। যে-কোন একটি বাদ দিলে সম্প্রসারণের অঙ্গহানি ঘটবে।

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কি কি প্রয়োজন :

যদি কাউকে কিছু শেখাতে চান, অথবা নিজেই কিছু শিখতে চান, উভয় ক্ষেত্রেই অনুকূল পরিবেশ আপনার চাই। পরিবেশ যত অনুকূল হবে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পথ তত সুগম ও সহজ
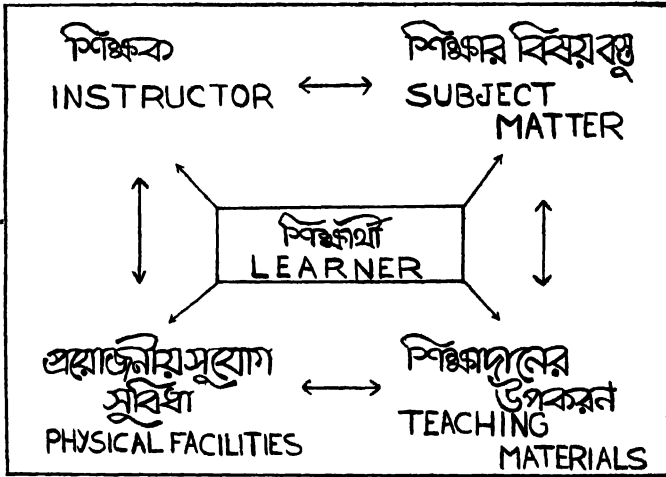
হবে। পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়; যেমন—শিক্ষার্থী, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাদানের উপকরণ, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষক। এই পাঁচটির নিবিড় সংযোগ শিক্ষার অনুকূল বাতাবরণ তৈরী করে।*

শিক্ষার্থী :

সম্প্রসারণের শিক্ষার্থী সাধারণত পল্লীর বয়স্ক নারী ও পুরুষ,

* অধ্যাপক J. Paul Leagans লিখিত প্রবন্ধ "Extension Education—Why and How" হ'তে নক্‌সাটি গৃহীত হয়েছে—Extension, Quarterly Supplement, Sept. 1960 সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিশেষতঃ কৃষক সম্প্রদায়। তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও অবশ্য কর্মক্ষেত্র বিস্তারের চেষ্টা চলছে। সম্প্রসারণ কাজে শিক্ষার্থীরূপে আপনি পাবেন একই সঙ্গে নানাধরণের লোক, যাদের মধ্যে দেখবেন শিক্ষা, বয়স, শক্তিসামর্থ্য, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় নানা পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য সত্বেও তাদের সকলের মধ্যে আবার কতকগুলি মিলও দেখতে পাবেন। একই জায়গায় একসঙ্গে অনেকদিন বাস করার ফলে দেখতে পাবেন, একটা আন্তরিকতা দানা বেঁধে উঠেছে। একই সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে এবং অনেক সময় একই ধর্মমতের আওতায় মানুষ হবার ফলে দেখবেন জীবনযাত্রায় একটা সংস্কার চালু হয়ে গেছে। সহর থেকে যে গ্রাম যতদূরে সেখানে এই বাঁধুনির আঁট তত বেশী। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজে নামবার সময় কয়েকটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন।

(i) **বয়স্করা ভাল শেখে তখনই, যখন তাদের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহ জন্মে ; আর সেই সময় শেখেও তাড়াতাড়ি।**

আগ্রহ ছাড়া কাউকেই কিছু শেখানো যায় না। তবু ছোটদের আদর করে, ভয় দেখিয়ে বা তাড়না করে কিছুটা এগিয়ে নেওয়া যায়। বড়দের বেলায় এ-জিনিস খাটবে না। আগ্রহ জন্মালে বড়রা দৈহিক ও মানসিক শক্তি দুই-ই প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়। তাই যেখানে দেখবেন আগ্রহ কম, সেখানে নতুন কিছু শেখাবার চেষ্টা প্রথমে না ক'রে আগ্রহ যাতে জন্মে এমন চেষ্টাই করবেন।

(ii) **সামনে কোন একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য রাখতে পারলে বয়স্করা বেশ মনোযোগ দিয়ে শেখে।**

যারা লক্ষ্যটা একবার পাকা করে নিয়েছে তাদের চলার মধ্যে আর সহজে ছেদ ঘটে না। যা নিতান্ত প্রয়োজন এবং যেটা না

হ'লে আর চলছে না, সেটা যখন সঠিকভাবে কেউ বুঝতে পারে, তখন তা লাভ করবার জন্য আপন আগ্রহেই পথ খোঁজে। অভাব মেটাবার জন্য রোখ এলেই কাজে শক্তি জাগে। ছোটখাটো সহজসাধ্য লক্ষ্য সামনে নিয়ে প্রথম প্রথম এগোতে হয়। এতে আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কঠিন ও বড় লক্ষ্য সামনে রেখে চলার সাহস জন্মে। নিশানা স্থির করার ওপরে বয়স্কদের কাজে নামবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেকখানি নির্ভর করে। বয়স্করা অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াতে চায় না।

(iii) **বয়স্করা যখনই যত্নের সঙ্গে চেষ্টা করে তখনই সুন্দর শেখে।**

কোন বিদ্যা বা কোন অভ্যাস নতুন করে আয়ত্ত করার দিকে বড়দের বড় একটা মন সরে না। কিন্তু একবার যদি ঝোঁক আসে তাহলে ধৈর্যের সঙ্গে প্রচেষ্টা সুরু করে। শিক্ষা ও সাধনা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ বিষয়ে বড়রা অনেক নির্ভরযোগ্য। প্রথমদিকে নতুন কিছুতে টেনে আনাই যা মুশকিল, একবার টেনে কাজে নামাতে পারলে আর ভাবনা নেই। একনিষ্ঠভাবে নিজের গরজে সুন্দরভাবে কোন কিছু রপ্ত করে নেয়।

(iv) **কোন শিক্ষায় হাতেনাতে সুফল পেলে বয়স্করা আরো শেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।**

সবাই আপন কাজের ফল দেখতে চায়; সফলতা পেতে চায়। কেউ-ই জেনে-বুঝে বিফলতার পথে যাত্রা করে না। এমন শিক্ষা মানুষ চায় যা থেকে নিশ্চিত ভাব কিছু লাভ হবে। জলে এন্‌ড্রেক্স মিশিয়ে পাটে ছড়ালে শুঁয়ো পোকা ও ঘোড়া পোকা মরে যায়—এটা একবার শেখবার পর এন্‌ড্রেক্স দেবার কথা আর কৃষককে বলতে হবে না। পোকা লাগলে নিজের গরজেই সে পাট বাঁচাতে সচেষ্ট হবে। কোন রোগ বা ফসলে পোকা দেখা দিলে প্রতিকারের পথ খুঁজতে সে নিজেই সচেষ্ট হয়ে উঠবে।

শেখার জন্যে, জানার জন্যে বা পাবার জন্যে আগ্রহ দেখা দিলে আশু লক্ষ্য স্থির করতে আর বেগ পেতে হয় না। লক্ষ্য পাকা হ'লে বেচালে আর পা পড়ে না। আর স্থির নিশানার দিকে নিয়মিত চেষ্টাই সাফল্যের উপায়। সফলতা লাভ করলে চিত্ত তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে কোন্ ধরণের কাজে মানুষ আগ্রহ পায় বেশী? মানব-মনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে প্রত্যেকেই কামনা করছে:

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৬-চণ্ডী

হে দেবি! আমাকে বিদ্যাবান্, যশস্বী ও শ্রীমান্ কর; রূপ, জয় ও যশ প্রদান কর এবং শত্রু নাশ কর। সকলেই বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও বহু গুণাবলীর অধিকারী হ'তে চায়। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুনাম ও কর্মে সাফল্য সকলেরই কামনা। শঙ্কা ও বিপদ থেকে মুক্ত হ'তে সকলেই চায়। মানব-প্রকৃতি সকল দেশেই মূলত এক। বিশ্বের সকল দেশে প্রত্যেক মানুষের মনে লুকিয়ে আছে:

(১) নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা
(২) স্নেহ-প্রীতি লাভের প্রত্যাশা
(৩) কর্মের স্বীকৃতি পাবার ইচ্ছা
(৪) নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বাসনা
(৫) সুযোগ-সুবিধা পাবার কামনা
(৬) আত্মসম্মান লাভের ইচ্ছা

মানুষের এই প্রকৃতি, বিশেষতঃ বয়স্কদের কাজের ধারা ভালো করে বুঝে না নিয়ে সম্প্রসারণ কাজে অগ্রসর হ'লে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু:

দেহের পুষ্টির জন্য আপনার কাছে আহার্য দ্রব্যের যে মূল্য, বিদ্যা সম্প্রসারণে বিষয়বস্তুরও ঠিক একই মূল্য।

আমেরিকা ও ইউরোপে কৃষির বিভিন্ন দিকে এবং পশুপালন বিষয়ে সম্প্রসারণ কাজ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। সম্প্রসারণের বিষয়বস্তু এই দু'টি সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের অবস্থা ও পল্লীর পরিস্থিতি এমন যে, কৃষি ও পশুপালনের সাথে সাথে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, পথঘাট তৈরী ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়কে সম্প্রসারণের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। 'বর্জন নয়, বিজ্ঞানকে অর্জন কর'—সর্ব বিষয়ে এই আহ্বানই ভারতে সম্প্রসারণের বিষয়বস্তু। অবশ্য কৃষির স্থান যে সকলের আগে সে কথা বলাই বাহুল্য। কৃষি সম্প্রসারণ বলতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বোঝানো হয়ঃ

(১) উন্নত বীজের প্রচলন ও প্রচার।

(২) রাসায়নিক সার ও অন্যান্য জৈব সারের প্রবর্তন ও প্রচার।

(৩) উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রচলন।

(৪) চাষ-আবাদে নতুন নতুন টেক্‌নিকের প্রচলন।

(৫) সব্‌জী ও ফল চাষের উন্নতি সাধন।

(৬) উপযুক্ত সেচ ও জলনিষ্কাশনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

(৭) কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা গঠনের দিকে উৎসাহিত করা।

(৮) গোজাতির উপযুক্ত যত্ন লওয়া এবং উন্নত প্রজনন ব্যবস্থার প্রচলন।

(৯) রোগ ও কীটের আক্রমণ হ'তে শস্য রক্ষা, শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দান।

শিক্ষাদানের উপকরণঃ

উপযুক্ত উপকরণ ছাড়া শিক্ষাদানের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। বিনা উপকরণে শেখাতে গেলে খুব ভাল ও প্রয়োজনীয় তত্ত্বও শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া যায় না। মুখের কথা মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। কৃষির অনেক মূল্যবান তথ্য গবেষণা কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকতে পারে। পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ সাধারণ কর্মী বা কৃষকদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কৃষি-সংক্রান্ত নতুন

কথা, সমাজবিজ্ঞান ও গৃহবিজ্ঞানের কথা সহজ সরল ক'রে জনসাধারণকে বোঝাতে হ'লে নানারকম উপকরণের প্রয়োজন।

লিপিকার আকারে কর্মতালিকা, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, পরিপত্র, চার্ট, পোষ্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, বিজ্ঞপ্তি ফলক, বুলেটিন বোর্ড, ফ্লানেল গ্রাফ, ফ্ল্যাসকার্ড স্লাইড, ফিল্মষ্ট্রীপ, চলচ্চিত্র মডেল, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি উপকরণের সহায়তা নিলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিস্তারে খুব সুবিধা হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে আরো করা হবে।

প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ঃ

বিদ্যালয়-গৃহে যদি আলো-হাওয়া না ঢোকে, ক্লাসঘরে যদি বসবার আসন না থাকে, বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে যদি জল পড়ে তাহ'লে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ধরুন, গ্রামে উন্নত বীজ, রাসায়নিক ও সবুজ সারের ফল প্রদর্শন করা হ'লো, কোন যন্ত্রচালনা-পদ্ধতি দেখানো হ'লো। পল্লীবাসীর মধ্যে বেশ আগ্রহও জন্মালো। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য সরকার সময়মত জিনিসগুলি যদি গ্রামে পৌঁছাতে না পারেন, তবে কোনও প্রদর্শনই সার্থক হবেনা। এমন একটা লাঙ্গলের ডিমন্‌স্ট্রেশন দেওয়া হ'লো যা খরিদ করার মত সামর্থ্য সাধারণ কৃষকের নেই। এতে শেখবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না ক'রে প্রতিকূল আবহাওয়া আনে। পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়। সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা যত দোষমুক্ত হবে সম্প্রসারণ কাজ তত কার্যকরী হয়ে উঠবে।

শিক্ষক ঃ

অশিক্ষিত জনতা দিয়ে গণতন্ত্র চলে না। গণতন্ত্রের জন্য গণশিক্ষার প্রয়োজন; আর গণশিক্ষার তাগিদেই সম্প্রসারণ। গণশিক্ষা সহজ কাজ নয়। হেলায়-ফেলায় একাজ হয় না। দুনিয়া গতিশীল; সর্ববিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। জীবন-সংগ্রামে তীব্র প্রতিযোগিতা সর্বত্র দেখা দিয়েছে। সাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু থাকলে গণতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। অল্প সময়ে অনেক বিদ্যা,

অনেক জ্ঞান গ্রামবাসীর মধ্যে এখন ছড়িয়ে দিতে হবে, তবে গ্রাম আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। কাজেই সম্প্রসারণ জো-সো ক'রে হবে না, আবার অপটু লোক দিয়েও হবে না; সুদক্ষ ও পল্লী-প্রবণ কর্মী দরকার। নতুন নতুন তত্ত্ব যতটা সফলতার সঙ্গে বহু লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে এবং তাদের উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন কৌশলের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন আনা যাবে তার ওপরই শিক্ষকের কৃতিত্ব নির্ভর করবে। প্রতিটি সম্প্রসারণ কর্মীই এক একজন শিক্ষক।
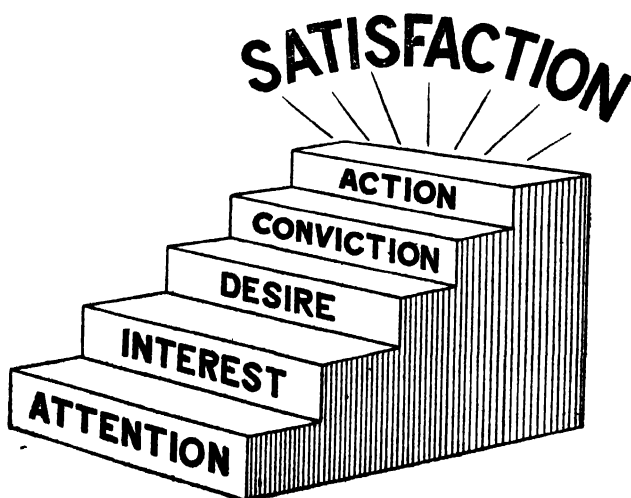
শিক্ষার ছয়টি সোপান:

শিক্ষার সার্থকতা গ্রহণে। আমাদের চরিত্রে ও আচরণে শিক্ষার প্রতিফলন পড়লে তবে সেই শিক্ষা যথার্থ হবে। গ্রহণ করার মত Satisfaction—(তৃপ্তি); Action—(কর্ম); Conviction—(প্রত্যয়); Desire—(আকাঙ্ক্ষা); Interest—(আগ্রহ); Attention—(দৃষ্টি আকর্ষণ)। *

---

* Extension Teaching Method—Wilson Gallup.

মনোভাব সৃষ্টির আগে মানুষের মনে অনেকগুলি দাগ কেটে যেতে হয়। বিশেষজ্ঞরা এই দাগগুলির নামকরণ করেছেন 'সোপান'।

মনের অন্তরীক্ষে চারটি সোপান অতিক্রম ক'রে তবে মানুষ কোন কিছু গ্রহণ করে, তারপর লাভ করে প্রাপ্তির আনন্দ। এই ছ'টি সোপান আপনি লক্ষ্য করুন। দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রথম কাজ। চলার পথে বহু আকর্ষণীয় জিনিস আপনার নজরে পড়বে, কিন্তু সবার ওপর সমান আগ্রহ জন্মাবে না। আগ্রহ থাকলে আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় অর্থাৎ কোন জিনিস পাবার জন্যে বাসনা জাগে। আকাঙ্ক্ষার পর প্রত্যয় জন্মে। প্রত্যয় কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এইভাবে আপনি নতুন বিষয় পাবেন। পাওয়ার পরিণাম আনন্দ। শিক্ষার চরম কথা এই আনন্দ।

মনে করুন, সুদূর এক পল্লীতে আপনি জাপানী প্রথায় ধান্‌-চাষ শেখাতে চান। প্রথমে গ্রামে ও আশপাশের কয়েকটি প্রধান জায়গায় জাপানী পদ্ধতির পোস্টার গুটিকতক সেঁটে দিন। এটা নজরে পড়বার পর অনেক চাষীর মনে প্রশ্ন জাগবে, একটা আগ্রহ দেখা দেবে। এই আগ্রহে যাতে ভাটা না পড়ে, তার জন্যে এবার জাপানী প্রথা ও দেশী প্রথার তুলনামূলক স্লাইড চলচ্চিত্র দেখান। জাপানী প্রথায় চাষ ক'রে যেসব চাষী লাভবান হয়েছে তাদের কাহিনী ঘরোয়া আলোচনা করুন। পুস্তিকা, প্রচারপত্র বিলি করুন। আগ্রহ এইভাবে কিছুদিন বজায় রাখতে পারলে সেটা আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হবে। আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'লে ব্যাকুলতা আসে। চাষীরা তখন আরো জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হবে। এবার জনকয়েক চাষীকে নিয়ে যান কোন খামার দেখতে যেখানে জাপানী প্রথায় চাষ হয়। দেখুক তারা, জাপানী প্রথায় চাষ ক'রে কতটা বেশী ফলন পাওয়া গেছে। জাপানী প্রথার গুণাগুণ সম্বন্ধে এবার তাদের মনে একটা প্রত্যয় জন্মে যাবে। বিশ্বাস পাকা হ'লে মানুষ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন চাষীকে বেছে নিয়ে এবার জাপানী

প্রথায় [illegible] সুরু করান। বীজতলা তৈরি, পরিমাণমতো সার দেওয়া, লাইন ক'রে বোনা, ছোট ছোট যন্ত্র দিয়ে চাষ, নিড়ানো, ওষুধ ছড়ানো প্রভৃতি কাজ সঙ্গে থেকে করান। যখন সোয়াগুণ বা দেড়গুণ ফসল বেশী পাবে, তখন পরম খুশীতে চাষীর মন ভরে উঠবে। শিক্ষার [illegible] প্রতিষ্ঠিত। জন-শিক্ষার পদক্ষেপগুলি এইভাবে দিতে হয়।

পেশা হিসাবে যাঁরা সম্প্রসারণ কাজে নিযুক্ত থাকবেন, তাঁদের কতকগুলি গুণ আয়ত্ত করা একান্ত আবশ্যক :

(১) পল্লীবাসীর প্রতি দরদ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা একান্ত প্রয়োজন।

(২) পল্লীর জীবনযাত্রার উন্নতিসাধনের জন্যে একটা আগ্রহ থাকা চাই। নৈরাশ্যে কোন কাজ হয় না, আশার আলোয় কর্মীকে বুক বাঁধতে হয়।

(৩) সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে সেবা ও সহায়তা দিতে গেলে যে-ধরনের সংগঠন নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত গড়ে তুলতে হয়, সে-বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

(৪) সম্প্রসারণ-কর্মীর মানুষ নিয়ে কারবার। সাধারণের মানুষের সঙ্গে তার মিশতে জানা চাই। নতুন নতুন কাজের মধ্যে তাদের টেনে নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

(৫) ভেবে-চিন্তে প্ল্যান ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে জানা চাই। কোন সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে কম্পাসের যে মূল্য, সম্প্রসারণ-কর্মীর কাছে প্ল্যানেরও ঠিক সেই মূল্য।

(৬) ভাসা ভাসা ধারণা বা আবছা লক্ষ্য সামনে নিয়ে সম্প্রসারণ হয় না। সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করার মতো দক্ষতা কর্মীকে অর্জন করতে হবে। যে মাঝি কোন্ গঞ্জে যাবে ঠিক করেনি, তার নৌকোর পালে যত বাতাসই লাগুক কোন কাজ হবে না।

(৭) যে-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, সে বিষয় ভালভাবে জেনে রাখা দরকার। উপকরণগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই — কোথায় পাওয়া যাবে, কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে এবং বিস্তারিত শিক্ষাদান কি [illegible] হবে। [illegible] কর্মীকে [illegible]

(৮) ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা, চিন্তা করা, যুক্তিকরা সম্প্রসারণের একটা বিশেষ নীতি। কাজেই লোকদের সংগঠিত করবার ক্ষমতা কর্মীকে অর্জন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন জনতার কোন ভাষা নেই, কোন শক্তিও নেই। লোকশক্তির উৎস লোকসংস্থা।

(৯) কোন বিষয়ের থিওরী ও প্র্যাক্‌টিস্ উভয় দিকেই মোটামুটি জ্ঞান ও কুশলতা কর্মীর চাই।

(১০) স্থান, কাল ও অবস্থা বিবেচনা ক'রে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই। চট্ ক'রে কোন একটা উত্তর বলে দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্যে একটা সিদ্ধান্তে সবাইকে পৌঁছাতে সাহায্য করা বেশ কঠিন কাজ। কোন পরিবার বা পল্লীর সমস্যাগুলি ঠিক ঠিক চিনে ফেলা, জায়গামতো দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সমাধানের নানারকম হদিস্ দেওয়া সম্প্রসারণ-কর্মীর একটা বড় কাজ।

সপ্তম অধ্যায়

বার্তা-প্রেরণ ও গ্রহণ-প্রক্রিয়া

(Communication and Adoption Process)

বার্তা-প্রেরণ সমস্যা :

রুশদেশে একটি প্রচলিত কথা আছে :

"The word is not an arrow but be careful how you use it, for it can wound the heart worse than an arrow"—সব-কিছু নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গীর ওপরে। শব্দ তূণের তীর নয়, কিন্তু বলার দোষে তীরের চেয়েও তীব্র হয়ে হৃদয়ে বাজতে পারে।

নতুন কোন জ্ঞান বা নতুন কোন বিদ্যা প্রথমে স্বল্পলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ; ক্রমশ সেটা অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সহজ ভাষায় সবার মধ্যে সঠিকভাবে কোন তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া খুব কঠিন কাজ। এ তো শুধু প্রচার করা নয়, ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া ও গ্রহণ করানো চাই। লোকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। জনসাধারণের অবগতির জন্যে প্রাচীন কালে মন্দির ও স্তম্ভের গায়ে এবং শিলালিপিতে মহাপুরুষের বাণী, রাজন্যগণের অনুশাসন খোদাই ক'রে রাখা হ'ত। বিভিন্ন দিকে প্রচারক পাঠানো হ'ত। জ্ঞানবিস্তারের বাহন হিসাবে যাত্রা, কথকতা, পুতুলনাচ, রামলীলা, লোকগীতি ইত্যাদির বহুল প্রচলন ছিল। আমরা দেখেছি, কোন বার্তা কিছু লোক ঠিকভাবে গ্রহণ করেছে। কেউ গ্রহণ করেছে বিকৃত আকারে, অনেকে আবার মোটে গ্রহণই করেনি। সেদিনও আইডিয়ার বিস্তার করা যেমন দুরূহ ছিল, আজ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সীমাহীন উন্নতি সত্ত্বেও সমস্যার

তেমনই লাঘব হয়নি। যা বলতে চাই, সহজভাবে গুছিয়ে তা প্রায়ই বলতে পারি না। 'এক বলি, আর এক বোঝে'—এ-যে আমাদের ঘরে-বাইরে সকলেরই নিত্যকার সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুল খবর দিয়ে ফেলি। যে সময় যে কথা বলা উচিত নয়, তাই বলি। যাকে যা বলা সঙ্গত নয়, তাকে সেটাই বলে ফেলি। সঠিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা বড়ই শক্ত; পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে এগুলোই মস্তবড় অন্তরায়। যত বেশী লোক কোন বার্তা ঠিক সময়ে ঠিকভাবে ঠিক লোককে বলতে শিখবে, ততই ঘরে-বাইরে ভুল বোঝাবুঝি কমে আসবে।

বাচন-কৌশল :

মনের ভাব ব্যক্ত করার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় মুখের ভাষা। জল, বাতাস ও সূর্যের আলোর মতই ভাবের আদান-প্রদানও মানুষের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে। অপরের কাছে নিজের বক্তব্য সহজবোধ্য ক'রে তোলার মধ্যেই ভাব-প্রকাশের সার্থকতা। সেই বাচন-ভঙ্গীই সুন্দর যা আপামর সাধারণ সহজেই বুঝতে পারে। বক্তব্য, বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একই ভাব ও সুর ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠা প্রয়োজন। সম্প্রসারণ-কর্মী এখানে সব থেকে বেশী চ্যালেঞ্জ পান। তিনি তো নিছক প্রচারক নন; কোন বার্তা পৌঁছে দিয়েই তিনি দায়িত্বমুক্ত হ'তে পারেন না। তিনি যে শিক্ষক। শেখানোর সারকথা গ্রহণ। যত বেশী লোক শিক্ষকের বার্তা গ্রহণ করবে, শেখানো ততটা সফল হয়েছে বুঝতে হবে। নিত্য নতুন জ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে, গ্রহণ করাতে হবে এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী যাতে কাজে প্রবৃত্ত হয়, তা দেখতে হবে। একাজে নৈপুণ্য যত বাড়বে, অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে। ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে একই সুরে জ্ঞানের বার্তা বহন করা কঠিন কাজ। একাজে যথেষ্ট নিপুণতা ও অনেক কুশলতা প্রয়োজন।

যখন কোন জনমণ্ডলীর সামনে অথবা কোন ব্যক্তির কাছে কিছু বলেন তখন পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায় :

প্রথমতঃ, আপনি নিজ মত প্রকাশ করেন, অর্থাৎ বক্তব্য পেশ করেন ;

তারপর, আপনার বক্তব্যটি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেন ;

বলার শেষে, আপনার মতের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে অভিমত গড়ে উঠেছে দেখতে পান।

যদি আপনি আশানুরূপ সাড়া না পান, তাহ'লে বুঝতে হবে— বলাটা সময় উপযোগী হয়নি অথবা বক্তব্য-বিষয়টি আপনি গুছিয়ে বলতে পারেননি এবং ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেননি। এটা আপনার বাচন-ভঙ্গীরই ত্রুটি। কোন মত ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ আপনার আয়ত্তাধীন, কিন্তু শ্রোতার বোঝা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া একেবারে আপনার আয়ত্তের বাইরে।

বার্তা-প্রেরণে পাঁচটি উপাদানের সংযোজন চাই :

১। **বার্তা-প্রেরক** (Communicator)—যিনি বার্তা অর্থাৎ কোন নতুন সংবাদ বা তথ্য পাঠান। প্রাচীন কালে সন্ত ও দরবেশের দল নতুন নতুন আইডিয়া প্রচার ক'রে বেড়াতেন ; কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক নতুন আইডিয়া ও তথ্য দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেন ; কারিগর ও বণিক সম্প্রদায় বহু প্রয়োজনীয় খবর ও তথ্য দেশের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেন ; সরকারের সম্প্রসারণ-কর্মিবৃন্দ দরকারী সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেন ; প্রগতিশীল কৃষি-প্রতিষ্ঠান ও কৃষক অনেক তথ্য জ্ঞাপন করেন।

এঁদের সংবাদ আহরণের সূত্র হচ্ছে—সাধনা ও অনুভূতি, গবেষণাগার, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

২। **শ্রোতা** (Audience)—সময়বিশেষে শ্রোতা একজন হ'তে পারে, একাধিক হ'তে পারে, আবার বহুও হ'তে পারে

নারী-পুরুষ দুই-ই হ'তে পারে। বয়স্ক হতে পারে, আবার তরুণও হ'তে পারে। শ্রোতার পর্যায়ে সবরকম লোকই থাকতে পারেন।

৩। **বার্তা-প্রেরণের পথ** (Channel of communication)—জনমণ্ডলীর মধ্যে নানাভাবে বার্তা প্রেরণ করা হ'য়ে থাকে। বড় বড় সভা ও সম্মেলন ডেকে বক্তৃতা ক'রে, ছোট ছোট আলোচনা-বৈঠকের মাধ্যমে, পুঁথি ও পুস্তিকা ছাপিয়ে, সংবাদপত্র, রেডিও, বুলেটিন ইত্যাদির মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়।

৪। **বার্তা** (Message)—প্রেরক যে-সংবাদ বা তথ্য শ্রোতার কাছে পাঠান সেটাই বার্তা। কোন বিষয়-বস্তু (subject-matter) ও বার্তা (message) এক জিনিস নয়। বিষয়-বস্তুর সারকথাটুকু সহজ কথায় বিস্তার ক'রে দেওয়াই বার্তা। শস্যের কীটনাশ-প্রণালী একটি শাস্ত্র—যার মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে; আর কতটুকু এনড্রেক্স কতটা জলে মিশিয়ে এক একর জমিতে ছড়িয়ে দিলে ঘোড়া ও বিছা পোকা মরে যাবে, এটা কৃষি-বার্তা।

৫। **বার্তা-প্রেরণ কৌশল** (Treatment)—বার্তা পাঠানো যায় বিভিন্ন উপায়ে। কিন্তু কোন্ সময় ও কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ পন্থার আশ্রয় নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে, সেটা নির্ধারণ করার ওপরে প্রেরকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপযুক্ত বার্তা স্থির করা এবং সঠিক কৌশলের সাহায্যে সুনির্বাচিত শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়াকে প্রেরণ-কৌশল বলে।

এই পাঁচটি উপাদানের সুষ্ঠু সংযোজন না হ'লে কোন বার্তা ঠিকভাবে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় না। যাঁরা আইডিয়া সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন আর যাঁরা আইডিয়া গ্রহণ করেন, উভয়ই মানুষ। এ যেন দরিয়ার এক পারের মানুষ অপর পারের মানুষের কাছে যেতে চাইছে। নানারকম পথ ধ'রে যেতে হয়, নানারকম যানবাহনের আশ্রয় নিতে হয়। পথ ও বাহন দুই-ই চাই, নইলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না।

বার্তা-প্রেরকের দায়িত্ব-ভার যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহ'লে কয়েকটি বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সচেতন হ'তে হবে :
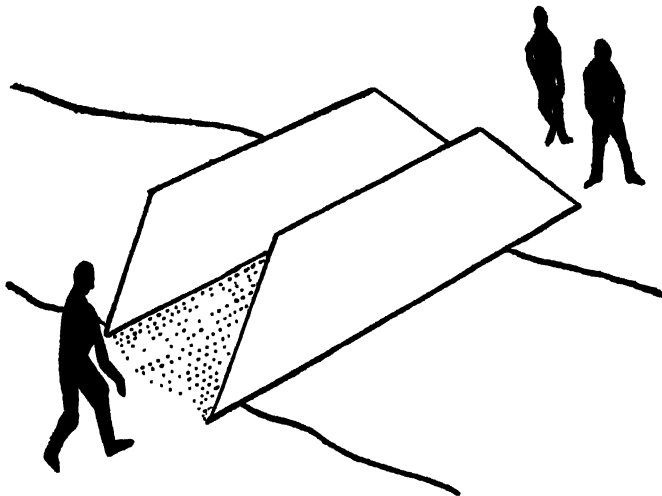
(ক) মনে রাখবেন, মানুষ প্রধানতঃ সামাজিক জীব। কালচার ও সমাজের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়। কোন নতুন আইডিয়া আপনাকে একটা সামাজিক পরিবেশে উপস্থাপিত করতে হবে। সে পরিবেশ প্রগতিশীল হ'তে পারে, আবার অত্যন্ত রক্ষণশীলও হ'তে পারে। তাছাড়া, গ্রহণের জন্য সময় দিতে হয়, চট্‌করে নতুন বিষয় সহজে গৃহীত হয় না।

(খ) শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হবে, আপনার বার্তার সাহায্যে কি সুফল পাওয়া যাবে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে, সাধারণের বোধগম্য করার জন্য যা যা করণীয় সে-বিষয়ে অবহিত থাকতে হবে, আপনার ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

(গ) আপনার শ্রোতা অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আপনার কাজ-কারবার তাদের প্রতি দরদ রাখবেন, আপনার বার্তার প্রতি আস্থাহীন হবেন না, বার্তা-প্রেরণের পক্ষে কোন্ পন্থা কতটা কার্যকরী হ'তে পারে সে-বিষয়ে খেয়াল রাখবেন, মাঝে মাঝে ফলাফল পর্যালোচনা করবেন।

(ঘ) আপনার বক্তব্য জনসমক্ষে কিভাবে উপস্থাপিত করবেন তার প্ল্যান তৈরি করতে ভুলবেন না। কি কি উপকরণ প্রয়োজন সেটা ভেবে-চিন্তে

যোগাড় ক'রে রাখবেন। বার্তা নির্বাচনের যোগ্যতা যেন আপনার থাকে, স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী বাচনভঙ্গী ঠিক করবেন।

সুন্দর বার্তার লক্ষণ কি ?

যে বার্তার সঙ্গে উদ্দেশ্যের কোন গরমিল নেই, যা সময়োপযোগী ও সুস্পষ্ট এবং যা সকলেই বুঝতে পারে ও সকলের চিত্তকে স্পর্শ করে; শ্রোতৃমণ্ডলীর মূল্যবোধ, স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে যে বার্তা নির্ধারিত হয় এবং যা সহজে কার্যকরী করা যায় তাকে সুন্দর বার্তার পর্যায়ে ফেলা হয়।

সুনিপুণ প্রেরণ-কৌশল ঃ

যেখানে উদ্দেশ্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা থাকে না, যেখানে গুরুত্ব উপলব্ধি কবাবার জন্য ঠিক জায়গামত বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে বক্তব্য পেশ করা হয়, সেই প্রেরণ-কৌশলই সুন্দর।

পন্থা নির্বাচনের সময় কয়েকটি কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন ঃ

বার্তা প্রেরণের সময় একাধিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। কোন্ পদ্ধতিতে কতটা খরচ পড়তে পারে, কার কার্যকারিতা কতটা আশা করা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ-স্থাপন, শ্রোতাদের জ্ঞানের মান, তাদের সংখ্যা এবং কথা শোনার মতো হাতে সময় কতটা আছে—এইসব বিবেচনা ক'রে যেসব পদ্ধতি বার্তা-প্রেরণের জন্যে নির্বাচন করা হয়, তাকেই সুন্দর নির্বাচন বলা যেতে পারে।

ভাল শ্রোতা কাকে বলবো ?

প্রয়োজনবোধের ধরন, নতুন সংবাদের জন্যে আগ্রহ, নতুন বিষয় বোঝার যোগ্যতা এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হবার ঝোঁক দেখে শ্রোতার গুণাগুণ স্থির করা হয়ে থাকে।

গ্রহণ-প্রক্রিয়া ঃ

চলমান জগতে নিত্য নতুন আইডিয়ার উদ্ভব হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল চিন্তার বাতাস লাগছে, নতুন

প্র্যাকৃটিসের সংবাদ আসছে, কতরকম হাতিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, পোশাক-পরিচ্ছদে রুচি বদলাচ্ছে, চাহিদার রকম পাল্টাচ্ছে। কিন্তু নতুন কিছু শুনলে বা দেখলেই লোকে মুহূর্তে সেটা গ্রহণ করে না। কোন বিষয় গ্রামবাসীদের মধ্যে চালু করতে হ'লে মনের পর্দায় বার বার দাগ কেটে যেতে হয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তবে সেদিকে আগ্রহ বাড়ে। তারপর মনের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ সুরু হয়ে যায়— আইডিয়াটি ভাল, না মন্দ ; গ্রহণযোগ্য না পরিত্যাজ্য। মনের তাঁতে অনেক টানা-পোড়েনের পর হাতে-কলমে ক'রে লোক বুঝে নেয়। এইভাবে বিশ্বাস পাকা হবার পর সে স্থায়িভাবে গ্রহণ করে ও কাজে নামে। মানব-চিত্তের এই স্বভাব। কাজেই কোন বার্তা প্রেরণ হয়তো সহজ, কিন্তু গ্রহণ একটু দুর্গম।

সম্প্রসারণ কাজে নামলে মাঝে মাঝে আপনার মনের দরজায় একাধিক প্রশ্ন এসে ভিড় জমাবে।—

(ক) গ্রামবাসীরা বিশেষতঃ কৃষকরা নতুন বার্তা বা আইডিয়া সাধারণতঃ পায় কোথা থেকে ?

(খ) কোন চাষী অতি সহজেই নতুন আইডিয়া গ্রহণ করে এবং সেই ভাবে কাজেও নেমে পড়ে। অনেকে আবার বড় ধীরে গ্রহণ করে। কারণ কি ?

(গ) এমন গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে নতুন আইডিয়ার প্রতি অধিকাংশ লোকে স্বাগত জানায়। আবার এমন গ্রামও আছে যেখানে নতুন কিছু নিয়ে প্রবেশ কবতে বেশ বেগ পেতে হয়। এর হেতু কি ?

(ঘ) একই আইডিয়া বা একই ধরনের আইডিয়া, দেখা যায় কোন সময় হয় অগ্রাহ্য হয়েছে অথবা অতি ধীরে গৃহীত হয়েছে ; অথচ অন্য সময় একই বিষয় খুব দ্রুত গৃহীত হচ্ছে। এরই বা কারণ কি ?

এ-সব প্রশ্নের জবাব মিলবে যদি আপনি 'গ্রহণ-প্রক্রিয়ার' বিজ্ঞান একটু বুঝতে চেষ্টা করেন। মনের কোঠায় কতকগুলি স্তর অতিক্রম না ক'রে কেউ সোজাসুজি কোন আইডিয়া গ্রহণ করে না।

গ্রহণ করা-না-করা অনেকখানি নির্ভর করে বার্তা-প্রেরণ-পদ্ধতির নিপুণতার ওপরে। স্তরগুলি এবার দেখুন এবং বিভিন্ন স্তরে কোন্ সূত্রের প্রভাব কেমন তাও লক্ষ্য করুন।

১। **অবহিত হবার স্তর** (Stage of Awareness): কোন নতুন আইডিয়া বা প্র্যাকটিসের বিষয় গ্রামবাসী বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রথমতঃ জানতে পারে। জানার সূত্র অনেক রকম হ'তে পারে; যেমন—

প্রথমতঃ, বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা, রেডিও ইত্যাদি;
দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারিবৃন্দ;
তৃতীয়তঃ, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব,
চতুর্থতঃ, হাট-বাজার ও গঞ্জের দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

২। **আগ্রহ সৃষ্টি হবার স্তর** (Stage of Interest): কত বিষয় মানুষ রোজ শোনে, কত জিনিস রোজ দেখে, কিন্তু সবার প্রতি সমান আগ্রহ জন্মে না। কতকগুলি মনে রেখাপাত করে। সচেষ্ট হ'লে, এই বিষয় আরো জানবার জন্যে লোক উৎসুক হয়। মানুষের এই ক্রম-বর্ধমান ইচ্ছাকে যেসব সূত্র আরো পরিপুষ্ট ক'রে তোলে, তা প্রথম স্তরেরই অনুরূপ। পল্লীবাসীর বেলাতেও এই একই কথা খাটে। এই স্তরকে আরো সংবাদ-সংগ্রহের স্তরও বলা চলে।

৩। **বিচার-বিবেচনার স্তর** (Stage of Evaluation): যে আইডিয়ার দিকে মনের টান আসে তার ভাল-মন্দ সব দিক মনে মনে যাচাই করে দেখা সুরু হয় এই স্তরে। নিজের বর্তমান অবস্থায় এবং এই পল্লী-পরিবেশে কতটা কাজে লাগবে কৃষক এই সময় বিবেচনা ক'রে দেখে, আরো বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ছোট আকারে পরীক্ষা ক'রে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। অথবা মোটেই গ্রহণ করবে না ব'লে স্থির করে। এই স্তরে যে সূত্র যেভাবে সাধারণতঃ প্রভাবিত করে থাকে, তার ক্রম-পর্যায় লক্ষ্য করুন।

প্রথমতঃ, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব (এদের প্রভাব এ স্তরে খুব বেশী);
দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারিবৃন্দ;
তৃতীয়তঃ, সংবাদপত্র, রেডিও, ম্যাগাজিন, বুলেটিন ইত্যাদি;
চতুর্থতঃ, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

৪। **পরীক্ষা করে দেখার স্তর** (Stage of Trial) : যে আইডিয়া নিয়ে কৃষক এতক্ষণ মনে মনে চিন্তা করেছে, বিচার করেছে, এমন কি সিদ্ধান্তও নিয়েছে, এবার সেটা হাতে-কলমে ক'রে দেখে নেয় স্থায়িভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে কিনা। পরীক্ষা করতে গিয়ে বিষয়টির প্রতি আরো গভীর দৃষ্টি পড়ে। আশাপ্রদ ফল এই সময় পেলে স্থায়িভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। যে-সব সূত্র এই স্তরকে যেভাবে প্রভাবিত করে, তা হচ্ছে—

প্রথমতঃ, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব (এদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে) ,

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারীবৃন্দের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয় যদি বিষয়টি একটু জটিল হয় ;

তৃতীয়তঃ, সংবাদপত্র, পরিপত্র, রেডিও ইত্যাদি ;

চতুর্থতঃ, দোকানদার, ব্যবসায়ী (এ স্তরে এদের প্রভাব খুব কম)।

৫। **গ্রহণের স্তর** (Stage of Adoption) : স্থায়িভাবে কিছু গ্রহণ করার আগে কৃষক এতগুলো স্তর অতিক্রম ক'রে আসে। পূর্ববর্তী স্তরে যে সব সূত্রের যা ভূমিকা ছিল, এস্তরেও অনুরূপ ভূমিকা থাকে।

প্রথম তিনটি স্তরকে মানসিক বোঝা-পড়ার পর্যায়ে ফেলতে পারেন, আর শেষের দু'টিকে হাতে-কলমে করে দেখবার স্তর বলতে পারেন। সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক তারতম্য এই স্তর-গুলিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। যে-কোন আইডিয়া যে-কোন স্তরে পরিত্যাজ্য হ'তে পারে। আবার মাঝের ২।১টি স্তর বাদ দিয়ে পরবর্তী স্তরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। কর্মীর ওপরে আস্থা থাকলে, কৃষক তৃতীয় স্তর থেকে একেবারে পঞ্চম স্তরে চলে আসতে পারে।

যে সকল ভাবধারা ও আইডিয়ার তরঙ্গ পল্লীবাসীর মনে এসে আঘাত করে, তাদের সকলের প্রকৃতি সমান নয়। কোনটা দেখা যায় জটিল, কোন্‌টা আবার সহজ ও সরল। যেটা সরল সেটা সহজে গৃহীত হয় ; আর যেটা জটিল সেটা গৃহীত হ'তে সময় লাগে—ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হয়। জটিলতা ও সরলতার তারতম্য অনুযায়ী সেগুলোকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

সাধারণ পরিবর্তন : যা চালু আছে বা যা ব্যবহৃত হচ্ছে তার পরিমাণ কিছুটা পরিবর্তন করা ; যেমন—কোথাও এক একর জমিতে ১০০ পাউণ্ড রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে পরিমাণ বাড়িয়ে ২০০ পাউণ্ড করা ।

নতুন ও উন্নত প্রণালী : যেখানে একরকম প্র্যাক্‌টিসে লোক অভ্যস্ত আছে সেখানে নতুন কোন প্র্যাক্‌টিস্‌ চালু করা ; যেমন—যেখানে ছিটিয়ে ধান ও পাট বোনা হয়, সেখানে লাইনে বোনার অভ্যাস চালু করা।

নতুন প্রবর্তন : যে পরিবর্তনের মধ্যে কিছুটা জটিলতা আছে, তাকে প্রবর্তন বলে। যা এ পর্যন্ত গ্রামে অপ্রচলিত আছে তার প্রচলন করাই প্রবর্তন। যেমন—হাইব্রিড গম বা ভুট্টার প্রচলনকে প্রবর্তন বলতে পারেন।

পেশা বদল : আপনি চাষবাস নিয়ে আছেন। এই পেশা ছেড়ে রাখি কারবার সুরু করলেন। গোপালন ও দুধের ব্যবসায়ে আপনি নিযুক্ত আছেন ; এটা ছেড়ে বেনেতি দোকান খুলে বসলেন। এক পেশা ছেড়ে আর এক পেশায় যাওয়া জটিল পরিবর্তন।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গ হামেশা আমাদের কর্মজীবনে এসে লাগছে। কোনটা আমরা গ্রহণ করছি ও কোনটা বর্জন করছি আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী। আমাদের রুচি-বৃত্তি ও প্রবণতার মধ্যে কত রকমফের আছে। মানব-চিত্ত যেমন দুর্গম, মানব-প্রকৃতিও তেমনি বিভিন্ন। মানুষে মানুষে যে তফাত আছে এ-কথা স্বীকার ক'রে নিলে 'গ্রহণ-প্রক্রিয়া' বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে। নতুন আইডিয়া কেউ গ্রহণ করে, কেউ করে না, কেউ তাড়াতাড়ি করে, কেউ বড় দেরীতে করে। গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় পল্লীবাসী সাধারণতঃ কিভাবে সাড়া দেয়, তার ধরনটা একটু লক্ষ্য করুন।

(ক) **প্রবর্তক** (Innovators) : যে লোক কোন নতুন আইডিয়া সবার আগে চট্‌ ক'রে গ্রহণ করে, তাকে প্রবর্তক বলতে পারেন। গাঁয়ে আর পাঁচজন কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই এরা আইডিয়া অনুযায়ী কাজ সুরু ক'রে দেয়। কোন গ্রামে দু'এক-জনের বেশী প্রবর্তক পাওয়া যায় না। এরা বয়সে নবীন, বিদ্যায় অগ্রগামী, আর্থিক দিকে সচ্ছল এবং মর্যাদাসম্পন্ন। গ্রামের নানারকম ধর্মীয় ও সামাজিক কাজকর্মে এদের সম্পর্ক বেশী, আবার বাইরের সঙ্গে সংযোগও এদেরই বেশী।

(খ) **উৎসাহী কর্মী** (Early Adopters) : সব গ্রামেই জনকয়েক এমন লোক পাবেন যারা নতুন বিষয়ে সহজেই অকৃষ্ট হয়। এরা অনেকটা প্রবর্তকের সমগোত্র। বয়স ও শিক্ষায় প্রায় এদেরই সমান। এরা সংবাদপত্র পড়ে, বুলেটিন দেখে, আর পাঁচজনের চেয়ে খোঁজখবর বেশী রাখে। পল্লী-উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে অংশ নেয়, মাঝে মাঝে শহরে যায়।

(গ) **অতি বিবেচক** (rarly Majority) : বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মোড়ল গোছের দলের লোক এরা। দল ও সম্প্রদায়ের লোক এদের কথা শোনে। এদের মধ্যে থেকে কেউ নির্বাচিত নেতা হ'তেও পারে, না-ও পারে। প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মতামত এদের মতামত ও কার্যাবলীকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে ; এদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া।

(ঘ) **সংশয়ী জনতা** (Late Majority) : সংখ্যায় এরা সবার চেয়ে বেশী। কম শিক্ষিত, কিন্তু বয়স্ক। কম সংবাদ রাখে। গুজবে বিশ্বাস করে বসে। নিজ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বাইরে কোন কাজে তেমন আগ্রহ দেখায় না।

(ঙ) **গ্রহণ-বিরোধী** : এরা সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধ। শিক্ষার মান খুব নিচু। পঞ্চায়েত, সমবায় ইত্যাদি সংস্থার প্রতি আগ্রহ নেই।

অবশ্য কম বয়সীদের মধ্যেও দু'চারজন গ্রহণ-বিরোধী লোক সব সময় পাবেন। এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল।

প্রসঙ্গতঃ বলতে চাই—আমাদের চাষীরা ঠিক কন্‌জার্‌ভেটিভ্‌ নয়, তারা সাবধানী। সাবধানী না হয়ে তাদের উপায় নেই। জোতজমি একেবারে কম। সারা বছর প্রাণপণ খেটে কোনমতে দিন চালায়। যে বিষয় জানে না, যার সম্বন্ধে কখনও শোনেনি এমন অনিশ্চিত বিষয়ে তারা পরীক্ষা করতে ভয় পায়। যদিও অনেকেই নিরক্ষর, কিন্তু কেউ-ই বেকুব নয়। বরং তার নিজের পেশায় অভিজ্ঞ এবং তারা অত্যন্ত বাস্তববাদী। একেবারে নিশ্চিত না হয়ে কোন নতুন প্রণালী গ্রহণ করতে চায় না। প্রচলিত পুরানো পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ ক'রে বিঘাভুই কি ফসল পাবে সেটা তারা মোটামুটি জানে। একটা নিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থেকে কে সহজে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াতে চায়? এই কারণেই সুষ্ঠু মেথড্‌ ডিমন্‌স্ট্রেশনের ও রেজাল্ট ডিমন্‌স্ট্রেশনের ওপর সম্প্রসারণে এত জোর দেওয়া হয়। নতুন প্রণালী প্রয়োগ ক'রে কোন লোক যখন সত্যিই ভাল ফল পাবে, তখন আর সকলকে সেদিকে আগ্রহী করে তোলা সহজ হবে। সত্যিকারের দেবার মত কিছু বিদ্যা নিয়ে সম্প্রসারণ-কর্মীকে গ্রামে যেতে হবে, তখন গ্রহণ ব্যাপারে কে কেমন সাড়া দিচ্ছে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। যে কাজে কৃষকের মর্যাদা বাড়বে, যা করা তার সাধ্যায়ত্ত এবং যার প্রয়োজন সে অনুভব করছে, এমন বিষয়ের প্রবর্তন করা সহজ।

এখানে দুটি কাহিনীর উল্লেখ করছি:

১। ভিয়েতনামে মাছ-ধরা ডিঙিতে মোটর-ইঞ্জিন চালু করার কাহিনী:

১৯৫৬ সালে ভিয়েতনামের মৎস্য-বিভাগ সমুদ্র উপকূলের জেলেদের ডিঙিতে মোটর ইঞ্জিন ফিট্‌ করবার জন্য ২০টা ইঞ্জিন

নিয়ে আসে। কিন্তু কোন জেলেই প্রথমে এটা নিতে চায় না তাদের আশঙ্কা ইঞ্জিনের শব্দে মাছ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। তাছাড়া, দুর্বল নৌকায় ইঞ্জিন ফিট্ করা উচিতও নয় ; এতে শুধু যে খরচ বাড়বে তাই নয়, ঝঞ্ঝাটও বাড়বে। 'ও-সব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই'—এই ছিল তাদের প্রথম সিদ্ধান্ত।

জেলেদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে মৎস্য-বিভাগ উপকূল অঞ্চলে ডিমন্‌স্ট্রেশন দেওয়া স্বরু করে। ডিঙিতে ইঞ্জিন ফিট্ করলে সুবিধা কত দেখাতে থাকে। ইঞ্জিনের দাম অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয় ; আর এ-টাকাও ১৮ মাস মেয়াদে অল্প অল্প করে শোধ দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ জেলে-ডিঙিই বাঁশের তৈরী। কাজেই ঝাঁকুনি (vibration) কমানোর উপায় বের করতে হ'ল মৎস্য-বিভাগকে। কেমন ক'রে চালাতে হবে এবং কিভাবে যত্ন নিলে বেশীদিন সার্ভিস্ দিবে তার সহজ বর্ণনা দিয়ে পুস্তিকা প্রচার করা হ'ল। এই সঙ্গে ঘোষণা করা হ'ল—যে-সব জেলে তাদের নৌকাতে ইঞ্জিন বসিয়ে প্রদর্শন করবে তাদের একখানা ক'রে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জেলেদের আর্থিক অবস্থায় কুলোয় ও তাদের সহজে বোধগম্য হয় এমন যা-কিছু করণীয় সবই এইভাবে করা হ'ল। ফলে, অধিকাংশ জেলের ডিঙিই এখন ইঞ্জিন ফিট্-করা। মৎস্য-বিভাগের ওপরে নির্ভর ক'রে আর তারা বসে থাকে না ; সরাসরি আমদানি-কারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে আনে।

এই নতুন টেক্‌নিক্ গৃহীত হয়েছে সত্যি, কিন্তু কোন অঞ্চলে বেশী চলে, কোথাও কম চলে। তারও একটা কারণ আছে। দক্ষিণ অঞ্চলের জেলেরা মৎস্য কোম্পানির বড় বড় বজরাকে দূর সমুদ্রে যেতে দেখে—তাই তারা তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন নিচ্ছে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের জেলেরা নিচ্ছে খুব ধীরে। কারণ সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ তাদের বিশেষ নেই।

অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ এদের পাঠান। ছেলেদের কোন সম্প্রসারণ ট্রেনিং নেওয়া ছিল না। উকিয়াং-এর এক হাটে গিয়ে ওরা উপস্থিত হলো। এক চা-দোকানের মালিকের অনুমতি নিয়ে দোকানেরই পাশে একটা টুলের ওপরে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে পড়লো। দুই জাতের তুলো-গাছের দুটি ফটো হাতে নিয়ে আমেরিকান জাত ও দেশী জাতের তুলনা করতে লাগলো। দেশী জাতের তুলো—পরিমাণে হয় কম, আশগুলি ছোট ও খস্‌খসে। আর আমেরিকান জাতের এই তুলো পরিমাণেও বেশী হয়, আঁশও লম্বা ও মোলায়েম। ওরা আরো জানালো যে, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে—দেশের মাটিতে এ তুলো ভালই জন্মায়।

উৎসুক জনতা ওদের ঘিরে জড়ো হ'য়ে গেল। চাষীদের আগ্রহ দেখে একজন ছাত্র বললো—"আমাদের কাছে দু'ব্যাগ এই ভাল বীজ আছে। অল্প অল্প ক'রে আপনারা ঘরে নিয়ে গিয়ে বুনে দেখুন। যাঁরা বীজ নেবেন, তাঁরা নাম ও ঠিকানা লিখিয়ে দিন। আমরা পরে এসে দেখবো—ফলন কেমন হয়।" এই কথা শুনে জনতা কেমন যেন একটু পিছপাও হ'য়ে গেল। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলাবলি সুরু হলো—"এরা এল কোথা থেকে? বিনা পয়সায় বীজ দিয়ে যাচ্ছে। ওদের চলে কী করে?" ছাত্র দুটি ব্যাপার দেখে একটু হতভম্ব হ'য়ে পড়ে; এমন সময় গুটিকতক চাষী কয়েকটি বীজ নিয়ে সরাসরি সরে পড়লো। দেখাদেখি অনেকেই নিতে সুরু করলো। বীজও ফুরলো। কিন্তু নাম-ঠিকানা কেউ-ই দিয়ে গেল না। বীজ ফুরিয়ে যাওয়ায় ছাত্র দুটি অবিশ্যি খুশিই হলো। ভর্তি ব্যাগ নিয়ে যদি নানকিং ফিরতে হতো, তাহ'লে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে মুখ-দেখানো যেত না। বীজ-বিতরণের সময় ওরা বারবার হুঁশিয়ার ক'রে দেয়—"বীজ যেন বোনা হয়, আমরা দেখতে আসব কিন্তু—।"

কিছুদিন বাদে ছাত্র দুটি দেখতে এল। দেখা গেল—

সোয়াবিনের ফাঁকে ফাঁকে তুলোবীজ লাগানো হয়েছে। আর দুই ফসলের চাপে মাঠ একেবারে ঢাকা। চাষীরা এমন করলো কেন! নতুন তুলোবীজ থেকে যদি গাছ না বেরোয়—এই আশঙ্কায় সোয়াবিন ও তুলো এক সাথে লাগিয়েছে। এতে জমিটা একেবারে নিষ্ফলা যাবে না। অতিরিক্ত গাছগুলো তুলে ফেলে এখন অনেকে জমি পাতলা ক'রে দিচ্ছে। বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করায় ওদের অনেকে কোন জবাবই দিল না। কেউ কেউ বললো—"অনেক দূর।"

ফসল ওঠার পরে ছাত্র দুটি আবার এল গ্রামে। পথে দেখলো তুলোর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে চাষীরা হাটে যাচ্ছে। কারো কারো তুলো তারা চিনে ফেললো। তাদেরই দেওয়া বীজের তুলো এগুলি। এক্‌জনকে জিজ্ঞেস করলো—"কর্তা, কেমন তুলো পেলেন?" চাষীটি জবাব দিল—"মন্দ হয়নি।"

"আস্‌ছে বছর এই তুলোই তাহ'লে বেশী ক'রে লাগাবেন, কেমন?" চাষীটি মাথা নেড়ে জবাব দিল—"না, বাবা।"

বিস্মিত হ'য়ে ছাত্র দুটি প্রশ্ন করলো—"কেন?"

এবার সে জানালো—"লম্বা আঁশের এই তুলোর বীজ আমাদেব করখিতে ছাড়ানো বড্ড মুস্কিল হচ্ছে; স্প্রীং-এর গায়ে আঁশগুলো জড়িয়ে যায়। বাজারে এর চাহিদা কম। বাইরে কোথাও চালান দিতে পারলে হয়তো বেশী দাম পাওয়া যেত। এখানকার জন্যে দেশী তুলোই ভাল, বাবা।"

ছুট্‌লো ছাত্র দুটি আবার কলেজে। অধ্যাপকদের এই সমস্যার কথা জানালো। সাংঘাই-এর তুলোর মিল-মালিক অ্যাসোসিয়েশনে সংবাদ পাঠানো হ'ল। অ্যাসোসিয়েশন্ থেকে খবর এল—"কিছু বেশী দর দিয়ে এই তুলো কিনুন। আমরা খরিদ ক'রে নেব।" ছাত্র দুটি এল আবার গ্রামে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরেও তুলো জোগাড় করতে পারলো না। অপরিচিত দুই ছোকরার কাছে চাষীরা

বেচতে ভরসা পাচ্ছিল না। ওরা শেষে গিয়ে উঠলো এক উপাসনালয়ে। পুরুতকে সব বুঝিয়ে বললো। পাড়ারই এক তুলো-চাষীর কাছে তিনি ওদের নিয়ে গেলেন। তুলো ওজন হ'ল, ওরা নগদ দামে কিনে নিল। বাজার-ছাড়া দর পাবার সংবাদ সাথে সাথে ছড়িয়ে গেল। অনেকে তুলোর বোঝা মাথায় নিয়ে আসতে লাগলো। ছাত্র দুটি জানিয়ে দিল—উন্নত বীজের তুলো ছাড়া অন্য তুলো তারা কিনবে না।

পরের বছর বহু চাষী নানকিং-এ এসে বীজ কিনে নিয়ে যায়। ধীরে ধীরে কলেজ-ছাত্রের ওপরে ভাল ধারণা জন্মায়। সবাই বুঝতে পারে—ওরা উন্নত তুলোবীজ প্রসারের চেষ্টা করছে। উকিয়াং-এর লোকদের সাথে এইভাবে দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। ছাত্র দুটি অবশ্য চাষীদের প্রথম অসহযোগিতার কারণ পরে জানতে পেরেছিল। বছর কয়েক আগে সরকারের স্থানীয় বিভাগের তরফ থেকে মাল্‌বারি সিল্কের জন্যে চাষীদের মধ্যে চারা বিতরণ করা হয়। যদিও বিনামূল্যেই প্রথমে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাষীদের ঘাড়ে যথেষ্ট লোকসান চেপেছিল। তুলোবীজের ব্যাপারে এতটা সতর্কতার এই হচ্ছে কারণ।

দু'বছরের মধ্যে উন্নত তুলোবীজ উকিয়াং-এ বেশ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একটা বিপণন সমিতি গড়ে ওঠে। এটাই চীনের প্রথম বিপণন সমিতি। একটা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে উকিয়াং টাউনে শাখা খুলতে রাজী করানো গেল। লোন পাওয়া এবং ডিপজিট্‌ ও মর্টগেজ দেওয়া সহজসাধ্য হ'ল। নিরক্ষর লোকদের জন্যে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও গড়ে উঠলো। শিক্ষার একটা আগ্রহ এইভাবে দেখা দেয়।

উকিয়াং জেলার গ্রামে গ্রামে সম্প্রসারণ কর্মীরা যখন এইভাবে ঘুরতেন, তখন পল্লীবাসীরা চাইত ওষুধ। ম্যালেরিয়া, চর্মরোগ, চক্ষুপীড়া ঘরে ঘরে ছড়িয়ে ছিল। কাজেই কর্মীদের ইউনিভারসিটি

হাসপাতালে এসে ফার্স্ট এড্‌ শিখতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের এক-একটি বাক্স সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঢুকতে হতো। এই সাহায্যের ফলে চাষীদের সঙ্গে আন্তরিকতা আরো বেড়ে ওঠে। বছর কয়েক পরে ইউনিভারসিটি হাসপাতালের পক্ষ থেকে শহরে একটি হেলথ্‌ ক্লিনিক খোলা হয়। গ্রামবাসীরা দেয় জমি ও স্বেচ্ছাশ্রম।*

সম্প্রসারণের এই দুটি কাহিনী থেকে আমরা যুক্তিসহ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি :—

(১) পরীক্ষা ক'রে যাতে নিশ্চিত ফল পাওয়া গেছে, কেবল সেই সব কাজেই হাত দেওয়া উচিত।

(২) যে প্রোজেক্ট যে জায়গার উপযোগী, সেই অনুযায়ী স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন।

(৩) স্থানীয় জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে যতটা সম্ভব পরিচিত হ'য়ে যাওয়া একান্ত দরকার।

(৪) ছবির মাধ্যমে বা ডিমন্‌স্ট্রেশন দিয়ে বক্তব্য বললে বেশ ফল পাওয়া যায়।

* ওপরে উদ্ধৃত কাহিনী দুটি F. A. O. কর্তৃক প্রকাশিত "Extension in Asia" No. 7 May 1961 সংখ্যা হইতে গৃহীত।

অষ্টম অধ্যায়

প্রোগ্রাম ও প্ল্যান

সম্প্রসারণ প্রোগ্রাম :

প্রোগ্রাম ও প্ল্যান—এই শব্দ দুটি এখন লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। কিন্তু অনেকের কাছেই হয়তো শব্দ দুটির অর্থ ও পার্থক্য পরিষ্কার নয়। সমষ্টি-উন্নয়নমূলক কোন কাজে হাত দিতে গেলেই প্রথমে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়; যেমন—বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যে লক্ষ্য সামনে রেখে কাজে নামার প্রস্তাব করা হচ্ছে তার উল্লেখ, প্রধান প্রধান সমস্যার দরুন বিপদ আশঙ্কা এবং তার সমাধানের উপায় নির্ণয়। সংক্ষিপ্ত এই বিবৃতিকেই বলে প্রোগ্রাম। কি করা হবে এবং কেন করা হবে—এই প্রশ্নের জবাব থাকবে প্রোগ্রামে।

কাজের প্ল্যান :

প্রোগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ন করার জন্যে যে সব কাজের বিধি-ব্যবস্থা করতে হবে তাকে বলে প্ল্যান। যেভাবে যা করতে হবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখাই হলো প্ল্যান। কেমন ভাবে করতে হবে, কোন্ সময় কোন্ কাজ করতে হবে, কোথায় কি করা হবে এবং কে কোন্ কাজের দায়িত্ব নেবে, তার উল্লেখ থাকবে প্ল্যানে।

প্রোগ্রাম ও প্ল্যানকে পৃথক করা যায় না। পৃথকভাবে উভয়ই অসম্পূর্ণ হ'য়ে পড়ে। সুপরিকল্পিতভাবে কোন কাজে হাত দিতে গেলে প্রোগ্রাম ও প্ল্যান দুটোই চাই। অনেক বিশেষজ্ঞ প্ল্যানের মুখবন্ধেই প্রোগ্রামের উল্লেখ ক'রে থাকেন; কাজেই পৃথকভাবে নামকরণ আর করেন না।

কাজের ক্যালেণ্ডার :

কাজের প্ল্যানটাকে বিস্তারিত আকারে পর পর সাজিয়ে যাওয়াকে ক্যালেণ্ডার তৈরি করা বলে। যে সব কাজ প্রতি মাসে

করা হবে, তার উল্লেখ ক'রে এক বছরের ছোট্ট ক্যালেণ্ডার আগেই তৈরি ক'রে ফেলা যায়। এ-কে আবার তিন মাস ক'রে ভাগ ক'রে নেওয়া যেতে পারে, তাতে কাজের সুবিধা হয়।

প্রোগ্রাম ও প্ল্যান কেন চাই :

সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সমাধা করতে হ'লে আগে থেকে আপনাকে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হয়। ভাবুন, আপনি একটি কারখানা গড়বেন অথবা একটা পাকাবাড়ী তুলবেন। লোক-লস্কর লাগিয়ে কাজে হাত দেবার আগেই প্ল্যান একখানা তৈরি করবেন। কেমন বাড়ী হবে, ক'খানা কামরা থাকবে, প্লিন্‌থ্‌ কত চওড়া হবে, ক'ইঞ্চি দেওয়াল হবে, জানালা-দরজার সংখ্যা ও সাইজ কি হবে—সমস্তই ব্লু-প্রিণ্টে ছকে দেখে নেন। বারোয়ারি-দুর্গাপূজা অথবা বিয়েবাদির কথাই ভাবুন না। সুচারুরূপে কাজ পাড়ি দিতেই পারবেন না—যদি না আগে থেকে ভেবে-চিন্তে প্ল্যান ক'রে কাজে না নামেন। এ-কথা কোন পরিবারের ছোটখাটো কাজের বেলায় যেমন সত্য, দেশের উন্নয়নমূলক কাজের বেলায় আরো সত্য।

উৎপাদনমূলক কোন কাজে—কৃষিই বলুন আর শিল্পই বলুন—পাঁচটি জিনিসের নিবিড় যোগাযোগ প্রয়োজন, তবে উৎপাদনের গতি অব্যাহত থাকবে। সব-কিছুর গোড়ার জিনিস **ভূমি** বা **জমি**। মানুষের হাতের ছোঁয়াচ না পেলে জমির নিদ্রা ভাঙে না; জমি নিয়মিত পরিচর্যা চায়। মানুষ কাজ করে হাত দিয়ে। হাতের শক্তি বাড়িয়ে দেয় **হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি**; কাজেই উৎপাদন উপকরণ চাই। আর চাই **অর্থ**; অর্থ না হ'লে লোকজন খাটানো যাবে না, হাতিয়ার-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যাবে না, কাঁচামাল খরিদ ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রির কাজে বিঘ্ন ঘটবে। এই তিনটির সক্রিয়তা বজায় রাখে **যোগ্য পরিচালন-ব্যবস্থা**। আর একটি বড় জিনিস উৎপাদনের অনুকূল **পরিবেশ সৃষ্টি** এ দায়িত্ব পুরাপুরি সরকারের। এই পাঁচটির যথাযথ মিলনে লক্ষ্মীর

আগমন—গৃহে ও দেশে। সুচিন্তিত প্ল্যান ব্যতিরেকে এই পাঁচের যথাযথ মিলন ঘটানো সম্ভবপর হয় না।

পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা তিন ভাবে তৈরি করা যেতে পারে :

১। **সরকারী প্রোগ্রাম**—দেশের অনেক বিদ্বান্‌ ও পণ্ডিত ব্যক্তি সরকারের ওপর মহলে থাকেন। পল্লীবাসীরা তেমন শিক্ষিত নয়, তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। জাতির অভাব ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা অনেক সময় ঠিক ঠাওরে উঠতে পারে না। এই সব কারণে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকার নিজেই উচ্চ পর্যায়ে নানারকম উন্নয়নমূলক স্কীম তৈরি করেন এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছে পাঠিয়ে দেন ; সঙ্গে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটা টার্গেটও বেঁধে দেওয়া হয়। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে সরকারী কোন্‌ বিভাগ কতটুকু উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিবেন, তার স্কীম এইভাবে তৈরি হয়ে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সরকারের ওপর মহলে তৈরী প্রোগ্রামে জনসাধারণ আশানুরূপ সাড়া দেয় না। সরকারের উদ্দেশ্য ও কাজের ধারা অনেক সময় তাদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায় ; ফলে তারা সন্দিহান হয়ে ওঠে। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি হওয়া কল্যাণকর নয়।

২। **গণ-প্রোগ্রাম**—সরকারী প্রোগ্রামের ঠিক উল্টোটা হ'ল গণ-প্রোগ্রাম। প্রতি গ্রামের অধিবাসীরা মিলিত হ'য়ে গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই উন্নয়ন প্রোগ্রাম তৈরি করবে, প্রোগ্রাম রূপায়নের বিস্তারিত কর্মসূচী স্থির করবে। নিজের গরজে নিজের তাগিদে তারা নিজেরাই চলবে। সরকারী সাহায্য যখন যতটা নেওয়া প্রয়োজন বোধ করবে, তখন সরকারের কাছে সেই অনুপাতে আবেদন পাঠাবে। সরকারের কাজ হবে জনসাধারণের প্রয়াসকে সফল ক'রে তোলা। এই রকমটি হ'লে

সবদিক দিয়েই সুন্দর হ'তো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থানীয় সাধারণ লোকের বিভিন্ন ধরনের অনুভূত প্রয়োজন প্রায় সময় দেখা যায় জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া সমস্যারও তো আর অন্ত নেই। বিশ-পঁচিশ রকম সমস্যা সমাধানের দাবি একই সাথে সব জায়গা থেকে উঠলে, কোন সরকারের পক্ষে সহায়তা করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে। স্বল্প সম্পদ্ হাতে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহুজনের বহু অভাব একই সাথে মেটানো অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সরকারকে একেবারে বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ন প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় না।

৩। **সরকার ও জনপ্রতিনিধির মিলিত প্রোগ্রাম ঃ** ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরে সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধি মিলেমিশে পরামর্শ ক'রে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে, সেটাই হবে সর্বোত্তম পন্থা। এতে জনসাধারণ থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। আবার জনতার চাহিদা সরকারের নাগাল ছাপিয়ে ভিন্নপথগামী হয় না। জাতীয় সম্পদ্ ও সম্বলের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ্ ও সম্বলকে বিচার ক'রে দেখা যায়। বহুসমস্যা-পীড়িত পল্লীতে নিতান্ত করণীয় আশু প্রয়োজনগুলি বেছে নেওয়া সহজ হয়। এতে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, সরকারী সহায়তা দানও সহজ হয়ে আসে। জনসাধারণের জন্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরি না ক'রে তাদের সঙ্গে বসে পরামর্শ ক'রে প্ল্যান তৈরি করাই সম্প্রসারণ কাজের নীতি।

দেশ-বিদেশে প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ভারতে প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং দুই ধারায় চালাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। দেশের সম্পদ্ ও বাইরের সহায়তার পরিমাণ বুঝে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন পাঁচ বছরের জন্যে একটা উন্নয়ন নীতি ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিবেন। জাতীয় টার্গেট স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়। রাজ্য তার দায় আবার

বিভিন্ন জেলা ও ব্লকের ঘাড়ে ভাগ ক'রে দেয়। সাথে সাথে প্রতি পঞ্চায়েতকে বলা হচ্ছে স্থানীয় সমবায় সমিতির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রতি গ্রামের জন্যে একটা ক'রে এমনি পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তৈরি করতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তৈরী এই সব প্ল্যান ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি অথবা ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিটি বিচার করবেন। বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি নিয়েই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি বা ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিটি গঠিত। এখানে স্থানীয় চাহিদা ও সরকারের সহায়তা দানের সামর্থ্য বিবেচনা ক'রে প্ল্যানে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করা হয়।

জাপান: গ্রামে গ্রামে কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার প্রধান দায়িত্ব থাকে সম্প্রসারণ কর্মীর ওপরে। এই কর্মীদের বলা হয় Village Extension Adviser. তাঁরা কৃষকদের ক্ষেত ও বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে তাদের সমস্যাগুলো চিনে দেন এবং বুঝে নেন। তারপর সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুসারে এক-একটি গ্রামের প্ল্যান লিপিবদ্ধ ক'রে ফেলেন। এ-কাজে স্থানীয় প্রগতিশীল ও অভিজ্ঞ কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, সমবায় সমিতির সদস্যদেরও মতামত গ্রহণ করেন। এইভাবে প্ল্যানটি তৈরি হবার পর আঞ্চলিক কৃষি অফিসারের অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হয়। তাঁর অনুমোদন পেলে প্ল্যানটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর মাসিক ক্যালেণ্ডার বা বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন ক'রে কাজে নামতে হয়। কাজের পদ্ধতি ও অগ্রগতির নিয়মিত রেকর্ড থাকে। বৎসরান্তে সেটা পর্যালোচনা ক'রে দেখে প্রয়োজন বুঝলে কিছুটা পরিবর্তন পরের বছর ক'রে নিতে হয়।

ফিলিপাইন: সম্প্রসারণ কর্মীরাই এখানেও প্ল্যান তৈরির প্রধান সহায়ক। কৃষকদের আগ্রহ কোন্ দিকে, তাদের প্রয়োজন কি—এসব বিষয় তাঁরা জেনে নেন। স্থানীয় প্ল্যানিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কর্মীরা যে অঞ্চলে কাজ করেন, সেখানে প্ল্যানিং কমিটি সংগঠিত ক'রে তোলার দায়িত্বও

তাঁদেরই। সম্প্রসারণ কর্মীর উদ্যোগে উন্নয়ন প্রোগ্রাম ও কাজের বিস্তারিত কর্মসূচী বা ক্যালেণ্ডার তৈরি করা হয়।

পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনাকালে এই নীতিগুলো অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন ঃ

১। আপনি যে অঞ্চলে উন্নয়ন কাজে উদ্যোগী হবেন, সেখানকার তদানীন্তন বাস্তব অবস্থা ভাল ক'রে অনুধাবন না করে কোন প্ল্যান তৈরি করতে যাবেন না। গবেষণাগারে পরীক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে যা আপনার অঞ্চলের উপযোগী হবে বলে মনে করেন, সেগুলো ঠিক করে নেবেন। সেন্সাস রিপোর্টে এ অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করেছে কিনা দেখবেন। যে সার্ভে নিজে করবেন তার রূপরেখা কাছে রাখবেন। স্থানীয় লোকদের অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখবেন ; কারণ প্ল্যানকে কাজে রূপ দেবে এরাই। পরিকল্পনা তৈরি করার আগে এতগুলো বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

২। কাজের ভেতর দিয়েই মানুষ ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে নতুন বিষয় শেখে। হঠাৎ আমুল কোন পরিবর্তনের কথায় লোক আমল দিতে চায় না। কাজেই যাদের প্ল্যান তৈরিতে আপনি পরামর্শ দিবেন তাদের শিক্ষার মান, রীতিনীতি, আর্থিক সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও ধর্মবিশ্বাসের কথা খেয়াল রাখবেন।

৩। ধনী-দরিদ্র, ছোটজাত ও বড়জাতের বেড়া গ্রামে বেশ আছে। সকল শ্রেণী ও জাতেব স্বার্থ জড়ানো আছে এমন কাজের প্রোগ্রাম নিতে সব সময় চেষ্টা করবেন।

৪। প্রোগ্রাম তৈরির ধারাটা এমন হবে যাতে গ্রামবাসী কিছু শিখতে পারে। নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় সমস্যার তারা সমাধান করুক, এ-কাজে তাদের সামর্থ্য বাড়ুক—প্ল্যান তৈরির এটি একটি প্রধান লক্ষ্য। আপনার অঞ্চলের সমস্যাগুলো লিপিবদ্ধ করবেন, প্রত্যেকটি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার স্থির করবেন, কাজ চলাকালে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখবেন। কোন সমস্যা সমাধানের এইভাবে চেষ্টা যে করবে তারই দক্ষতা বাড়তে থাকবে।

৫। যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন সেটা কেবল আপনার মনে মনেই রাখবেন না। আর পাঁচজনের মতামত নেবেন। প্রধান মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। আপনার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও পরামর্শ করবেন। মূলকথা যত বেশী বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে প্ল্যান তৈরি করবেন ততই সেটি সুন্দর হবে।

৬। স্থানীয় লোক-সংস্থাগুলোর সহায়তা অবশ্যই নেবেন। পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি—সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করবেন, তাহ'লে লক্ষ্যে পৌছানো সহজসাধ্য হবে।

৭। স্থানীয় প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সহায়তা নিতে কখনও ভুলবেন না।

৮। পরিকল্পনাটি রচনা করার সময়ই চাহিদার দিকে নজর রেখে দুই ভাগে ভাগ ক'রে নেবেন—স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী।

৯। যে সব সমস্যা সমাধানের তাগিদ জনসাধারণ বিশেষভাবে অনুভব করে, সেগুলোই প্রধানতঃ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করবেন।

১০। সাধারণ মানুষের বুঝতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, এমন ভাষায় পরিকল্পনার লক্ষ্য সকলকে জানিয়ে দিবেন।

১১। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোন কাজ করতে গেলে মাঝেমাঝেই ফলাফল বিচার করে দেখবেন। কাজের অগ্রগতির ফাঁকে ফাঁকে নজর দেওয়া দরকার, লক্ষ্যের দিকে কতটা ও কিভাবে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য ঝাপসা রাখলে কোন কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

১২। অভিজ্ঞ সম্প্রসারণ কর্মীর তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা করবেন। নিয়মিত পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা যায় না।

১৩। তেমন প্রোগ্রামই নেবেন যা কার্যকরী করতে পারবেন। আকাশ-কুসুম কোন প্ল্যান তৈরি করার অর্থ হয় না। লোকজন, টাকাপয়সা, সময়, সুযোগ-সুবিধা কি পাওয়া যাবে, প্ল্যান তৈরির সময় বিবেচনা করতে হবে।

প্ল্যান ক'রে নিয়ে কাজে নামার কথা প্রথমেই বলেছি, কিন্তু একটা পরিকল্পনা খাড়া করা বড় সহজ কথা নয়। চট্ ক'রে কোন প্রোগাম তৈরি করা যায় না। অনেক মালমসলা সংগ্রহ করতে

হবে, খাটতে হবে, ধীরস্থিরভাবে স্থানীয় অবস্থা আপনাকে বুঝতে হবে, তবে পরিকল্পনা তৈরি করার যোগ্যতা আসবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন-পদ্ধতি : এই পদক্ষেপগুলো দিতে ভুলবেন না।

পরিকল্পনা তৈরির সুরুতে গ্রামের নেতৃস্থানীয় সবাইকে ডেকে নেবেন। দু'একজন মিলে প্ল্যান তৈরি করলে গ্রামবাসী দ্বারা সেটা গৃহীত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

ক'জন একসঙ্গে বসে খসড়া তৈরি করবেন সেটা প্রথমেই স্থির ক'রে নেবেন। একটা গ্রামের বা অঞ্চলের সব লোক ডেকে তো প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয়। স্থানীয় দায়িত্বশীল নেতাদের সহায়তা নিতে হবে।

প্রত্যেক গ্রামেব উদ্যোগী ও দায়িত্বশীল লোকদের প্রথমে চিনে নেবেন। এদের অধিকাংশকেই আপনার কাজের মধ্যে টানবেন এবং উৎসাহিত করবেন। ভালভাবে কাজ যাতে পরিচালনা করতে পারে সেইভাবে তালিম দিয়ে নেবেন।

তারপর সবাই বসে পরিকল্পনার খসড়া তৈরির কাজে হাত দিবেন। স্থানীয় উৎসাহী কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চিনে বের করা, গঠনমূলক কাজের দিকে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করা এবং উন্নয়ন প্রোগ্রাম তৈরি ও রূপায়নের কাজে তাদের একত্র করা সম্প্রসারণ কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব।

স্থানীয় অবস্থা ও সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ ক'রে একটা উন্নয়ন লক্ষ্য আপনাকে স্থির ক'রে নিতে হবে এবং হাতের কাছে নাগালের মধ্যে যে সম্বল আছে সেটাকে ভরসা ক'রেই কাজে নামতে হবে। কী ভাবে করবেন ?—

(ক) প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করুন :

কোন গ্রামের বর্তমান অবস্থা যদি বুঝতে চান, খেটেখুটে আপনাকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাড়াতাড়ি সঠিক খবর সংগ্রহ করা যায় সার্ভের মাধ্যমে। সার্ভে করার নানারকম

পদ্ধতি আছে। পল্লী সার্ভে করা খুব শক্ত কাজ নয়। প্রতি পরিবারে দেখতে হবে—

(i) বাড়ীর কর্তার বয়স কত, স্বাস্থ্য কেমন, শিক্ষার মান কি, সে কোন্ জাতি, তার ধর্ম কি, কোন্ কাজে বিশেষ দক্ষতা আছে।

(ii) তার সম্পদের পরিমাণ :—

মনুষ্য-সম্বল—পরিবারের লোকসংখ্যা কত, কর্তার সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ, কার কি বয়স ও শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা কেমন।

বস্তু-সম্পদ্—চাষ করে কত জমি, তার মধ্যে নিজের কতটুকু, বর্গা বা চুক্তি শর্তে চাষ করে কত জমি; কতটা ফসল বছরে ঘরে তোলে, বিঘাভুঁই ফসল কেমন পায়, তাব গো-মহিষের সংখ্যা কত, বছরে ফসল বেচে কত টাকার, চাষের কি কি উপকরণ আছে ইত্যাদি।

(iii) জীবনযাত্রার মান কেমন :—ঘরদোরগুলো কেমন; পানীয় জলের ব্যবস্থাদি কি আছে, পবিষ্কাব-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস কেমন, গৃহসজ্জার পরিপাটি কেমন, আহাবের উপকরণ কি ইত্যাদি।

(iv) অনুভূত প্রয়োজন :—বুঝে নেবেন কৃষকটি কোন্ প্রয়োজনের তাগিদ সবচেয়ে বেশী অনুভব কবছে।

গ্রামের সাধারণ অবস্থা এইভাবে দেখবেন :—

(i) সুলভে সময়মতো ঋণ পাওয়ার কি সুযোগ গ্রামে আছে।

(ii) প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যে গ্রামটি ঘাট্‌তি অঞ্চল না বাড়তি অঞ্চল।

(iii) জিনিসপত্র বেচা-কেনার সুবিধা কি আছে।

(iv) রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অবস্থা কি।

(v) বাজার আছে কিনা, হাট লাগে কিনা।

(vi) স্কুল এবং দেবমন্দির ও মসজিদ আছে কিনা।

(vii) সেচ ও জল-নিষ্কাশনের কি ব্যবস্থা আছে।

(viii) পঞ্চায়েত কাজ কেমন করছে।

(ix) সমবায় সমিতি আছে কিনা—থাকলে, কাজ কেমন করছে।

(খ) সার্ভের সাহায্যে যে সব সংবাদ আপনার হাতে এসে জমলো সমস্যার যে ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠলো, সেগুলো ঘরোয়া আলোচনায়

বিশ্লেষণ ক'রে দেখুন। এই অবস্থা কেন দেখা দিল? পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে? একটা সমস্যার সঙ্গে আর একটি সমস্যা কতখানি জড়িত? সমাধানের উপায় কি? ইত্যাদি।

(গ) যে সব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন, এবারে এমন কয়েকটি সমস্যা বেছে নিন। তারপর সমস্যাগুলো এইভাবে ভাগ ক'রে নিন :—

(i) যে সব সমস্যা এক-একটি পরিবার নিজেরাই উদ্যোগী হ'য়ে সমাধান ক'রে নিতে পারে, যেমন—প্রচলিত বীজের পরিবর্তে উন্নত বীজ চালু করা, সার-প্রয়োগের সঠিক পরিমাণ জেনে নিয়ে সেইভাবে জমিতে সার দেওয়া, বাড়ীর আশপাশ আরো স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলা, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গোশালা তৈরি করা, আহারের পুরাতন অভ্যাস পালটে নেওয়া, গৃহের অভ্যন্তর পরিপাটি করা, প্ল্যান ক'রে সব্জি ও ফলগাছ লাগানো ইত্যাদি।

(ii) যে সব সমস্যা সমষ্টিগতভাবে সমাধান করতে হবে এবং যা একক-ভাবে সমাধান করা সম্ভবপর নয়, যেমন—গ্রামের পথঘাটগুলো ভাল করা, সুলভ মূল্যে ভাল জিনিসপত্র আমদানি করা, কোন ক্লাব ও সংঘ এবং বিদ্যালয় গড়ে তোলা ইত্যাদি।

(iii) যে সব সমস্যা সমাধান করতে হ'লে বাইরের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন; যেমন—সুলভে ঋণ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা, সেচ ও জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা ও পরিবহণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি। সরকার ও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা এ-কাজে চাই-ই।

এবার ঠিক করুন—আপনার নির্বাচিত সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন্‌টা ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিভিন্ন পরিবার সমাধান করতে পারবে; কোন্‌টা সমাধানের জন্য সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং কোন্‌টার জন্যে বাইরের অর্থাৎ সরকার বা অন্য কারো সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

(ঘ) সবদিক এইভাবে বিচার-বিবেচনা করার পর আপনার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোন্ কাজে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করেন, তাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করুন। কেননা সামনে সুস্পষ্ট একটা লক্ষ্য না থাকলে, লোক কাজে উৎসাহ পায় না।

বিস্তারিত কর্ম-তালিকা প্রণয়ন (Calendar of work):

সমস্যা সমাধানের পথে কতটা কাজ প্রতি বছর হবে, কে কোন্ কাজের ভার নেবে, কোন্ সময় কোন্ কাজটি আরম্ভ করা হবে—সব

এবার স্থির ক'রে ফেলতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে কর্ম-তালিকার মধ্যে।

(i) এক বছরে কতটা এগোতে ইচ্ছা করেন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করবেন। বাৎসরিক নিশানা স্থির না করলে কাজে গতিবেগ সৃষ্টি হবে না।

(ii) কোন্ কোন্ দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে, কোথায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে—লিপিবদ্ধ করবেন।

(iii) সম্প্রসারণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি কোন্ সময় প্রয়োগ করতে চান, কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

(iv) কে কোন্ কাজের দায়িত্ব নেবে, কার উপরে পরিচালনের ভার থাকবে, কে ডিমন্‌স্ট্রেশন দিবেন এবং কে পরামর্শ দিবেন স্থির ক'রে ফেলবেন।

(v) প্রতিটি কাজের স্থান ও সময় নির্বাচন করুন।

(vi) কাজের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে মাঝেমাঝে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখবার বিহিত ব্যবস্থা রাখবেন।

মূল্যায়ন ঃ

মূল্যায়ন কেন করা দরকার বুঝিয়ে দিবেন। মূল্যায়নের সময় কোন্ কোন্ দিকে নজর রাখতে হবে বলে দিবেন। কাজ চলাকালে মাঝেমাঝে পর্যালোচনা ক'রে দেখার অর্থ হলো—কাজের ভাল ও মন্দ দিকটা এবং লাভ ও লোকসানের পরিমাণটা খতিয়ে দেখা। আত্ম-বিশ্লেষণের এই অভ্যাস রপ্ত হ'লে অবাস্তব কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। মূল্যায়নের সময় খেয়াল রাখবেন—

(i) যতজন লোকের কাজে অংশ নেবার কথা ছিল সবাই নিয়েছে কি না। অনেকে যোগ দেয়নি কেন। দূরে সরে থাকবার কারণ কি?

(ii) প্রোগ্রাম তৈরির সময় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল কিনা, না, সব ঠিকমতই হয়েছে।

(iii) নজরে পড়ার মতো এমন কি পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন যে ঘটেছে তার কোন নিদর্শন আছে কি? যদি থাকে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করবেন।

পুনর্বিচার: কাজের অগ্রগতির ফাঁকে ফাঁকে মূল্যায়ন ক'রে দেখবার পর যদি কোথাও সামান্য রদ-বদল করা প্রয়োজন বলে মনে হয়, পরবর্তী বছরের কর্ম-তালিকায় সেই পরিবর্তন ক'রে নেবেন। এতে কাজের ধারা ক্রমশঃ উন্নত হবে।

পরিকল্পনার ত্রি-ধারা
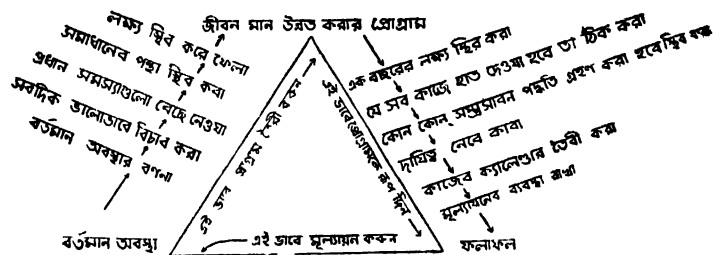
সাফল্যের পরিমাণ দেখবেন।
জনগণের মধ্যে পরিবর্তন কতটুকু এসেছে?
সম্পূর্ণ সমাধানের আর কত বাকী আছে?
সম্প্রসারণ-পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের ফলে কোন্টার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে?
নতুন কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কিনা।

প্রোগ্রাম, প্ল্যানিং ও পঞ্চায়েত:

আমাদের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠিত হচ্ছে, কিন্তু পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখনও দেখা যায়নি। সেই আগের মতো মামুলি ও যান্ত্রিক কাজ এখনও চলছে—বছরে রাস্তায় কিছু মাটি ফেলা, এ-পাড়া বা ও-পাড়ায় ২।১টি নলকূপ বসানো, রাস্তায় গুটিকয়েক আলো দেওয়া ইত্যাদি। একটা স্বচ্ছ গ্রাম-ভাবনা যেন কোথাও নেই। উৎপাদন-বৃদ্ধির কথা, নতুন শিল্প-গঠনের কথা পঞ্চায়েতকে আজ ভাবতে হবে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটি ক'রে পাঁচশালা প্ল্যান তৈরি করতে হবে। পল্লী-উন্নয়ন কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া

প্রোগ্রামের রূপরেখা

১. তথ্য-সংগ্রহ (Collecting Factual Informations)
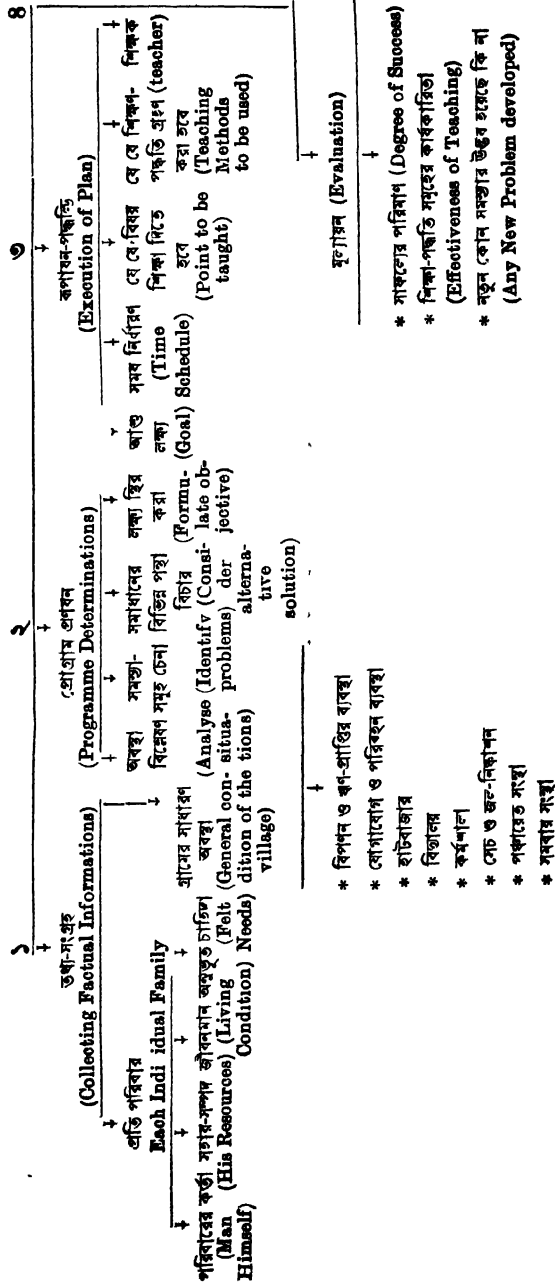
- প্রতি পরিবার — Each Indi idual Family
  - পরিবারের কর্তা (Man Himself)
  - সঙ্গতি-সম্পদ (His Resources)
  - জীবনমান (Living Condition)
  - অনুভূত চাহিদা (Felt Needs)
- গ্রামের সাধারণ অবস্থা (General condition of the village)
  - বিপণন ও ঋণ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা
  - যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা
  - হাটবাজার
  - বিদ্যালয়
  - কর্মশালা
  - সেচ ও জল-নিকাশন
  - পঞ্চায়েত সংস্থা
  - সমবায় সংস্থা

২. প্রোগ্রাম প্রণয়ন (Programme Determinations)

- অবস্থা বিশ্লেষণ (Analyse situations)
- সমস্যা-সমূহ চেনা (Identifv problems)
- সমাধানের বিভিন্ন পন্থা বিচার (Consider alternative solution)
- লক্ষ্য স্থির করা (Formulate objective)
- আশু লক্ষ্য (Goal)

৩. রূপায়ন-পদ্ধতি (Execution of Plan)

- সময় নির্ধারণ (Time Schedule)
- যে যে বিষয় শিক্ষা দিতে হবে (Point to be taught)
- যে যে শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে (Teaching Methods to be used)
- শিক্ষক (teacher)

৪. মূল্যায়ন (Evaluation)

- সাফল্যের পরিমাণ (Degree of Success)
- শিক্ষা-পদ্ধতি সমূহের কার্যকারিতা (Effectiveness of Teaching)
- নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না (Any New Problem developed)

যেতে পারে ঃ—(১) কৃষি উৎপাদন, (২) পল্লীশিল্প ও রাস্তাঘাট তৈরী, (৩) জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, (৪) শিক্ষা, (৫) সমাজ-কল্যাণ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়নের দায়িত্ব কয়েকটি ছোট ছোট সাব-কমিটির হাতে অর্পণ করা যেতে পারে ; যেমন—কৃষি-উন্নয়ন কমিটি, গ্রামোদ্যোগ কমিটি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ কমিটি। প্রত্যেক সাব-কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পল্লীগঠনের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে গ্রহণ করতে হবে, পল্লীবাসীর আয় বাড়ানোর পথের হদিস দিতে হবে তবে পঞ্চায়েত জনসাধারণের আস্থাভাজন হবে।

যেসব সংবাদ লিপিবদ্ধ করে পঞ্চায়েত ঘরে টাঙিয়ে রাখা উচিত তার একটা নমুনা এখানে দিলাম।

১। গ্রামের নাম ·
উন্নয়ন ব্লকের নাম ·
মহকুমার নাম···
জেলার নাম ··

২। গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার সংখ্যা···
অধ্যক্ষের নাম· ·

৩। কতটা জায়গা জুড়ে এই গ্রামের মৌজা···

৪। মোটা গ্রামের লোকসংখ্যা কত···

৫। পরিবারের সংখ্যা ··
(ক) জমির মালিক এমন পরিবারের সংখ্যা···
(খ) ভাগচাষী পরিবারের সংখ্যা···
(গ) কৃষি-মজুর পরিবারের সংখ্যা···
(ঘ) দোকানদার পরিবার···
(ঙ) কারিগর পরিবার···
কর্মকার···
তন্তুবায়···
দারুশিল্পী···

চর্মকার…

অন্যান্য…

(চ) চাকুরিজীবী পরিবারের সংখ্যা…

(ছ) মহাজনী ও চালানী কারবার করে এমন পরিবার…

(জ) আয়ের কোন পথই নেই এমন পরিবার…

৬। ব্লক আপিসের দূরত্ব কতটা

জেলার সদর আপিসের দূরত্ব

মহকুমা আপিসের দূরত্ব ·

৭। গ্রামে সরকারী বা আধা-সরকারী চাকুরে কতজন আছেন…

৮। ক'জন চৌকিদার আছে…

কৃষি-উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরির পদ্ধতিঃ—

গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করলে সবার আগে কৃষির উন্নতির কথা মনে জাগে। সুপরিকল্পিত কৃষি ছাড়া উৎপাদন-বৃদ্ধির স্থায়িত্ব আসতে পারে না। আপনাদের গ্রাম বা এলাকার জন্যে যদি সমষ্টিগত কৃষি-উৎপাদন পরিকল্পনা একটা তৈরি করতে চান, তাহ'লে আপনাকে সবার আগে স্থানীয় কৃষকদের কাজকর্মের ধরণ-ধারণ, তাদের বাস্তব পরিবেশ এবং বাজারের ওঠা-নামার প্রকৃতি সবটাই নজর দিয়ে দেখে নিতে হবে। মনে রাখবেন **উৎপাদন প্যাটার্ণ** ও **উৎপাদন পরিবেশের** উপরে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। কেবল একটা দিকে কিছু পরিবর্তন করলেই উৎপাদন বাড়বে না; উভয় দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। আপনারা জানেন সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ কাজের উদ্যম বাড়িয়ে দেয়। আর প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের কর্মশক্তি হ্রাস পায়।

নীচের প্রশ্নগুলির জবাবে যা জানতে পারবেন তাকেই বলে উৎপাদন প্যাটার্ণঃ

১। আপনার এলাকায় কোন্ কোন্ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে? ধান, গম, ভুট্টা, কলাই ইত্যাদি খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেশী, না পাট শন, তুলা ইত্যাদি

অর্থকরী শস্যের পরিমাণ বেশী? এদের জাত কেমন—উন্নত না সাধারণ? বীজের কোয়ালিটি কেমন? সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেমন? বীজ শোধনের কোন পন্থা অবলম্বন করা হয় কি?

২। এ দেশে কৃষির প্রধানতম উপকরণ গো-মহিষ। এদের জাত কেমন? প্রজননের সুব্যবস্থা আছে কি? বাছুরগুলোর স্বাস্থ্য কেমন? গাভী গড়ে কতটা দুধ দেয়?

৩। এই অঞ্চলের ভূমি কোন্ কোন ফসলের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী? সেচ ও জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কেমন আছে? ভূমিক্ষয়ের মাত্রা কিরূপ? মাটিতে কোন্ উপাদান বেশী আছে, আর কোন্‌টার ঘাট্‌তি পড়েছে? সার-প্রয়োগ সেই অনুসারে হচ্ছে কি? জৈব সার ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ-পদ্ধতি কেমন?

৪। রোগ ও কীটের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়? স্প্রেয়ার ও ডাস্টারের চলন আছে কি?

৫। নতুন যন্ত্রপাতি কি কি ব্যবহৃত হচ্ছে? বিভিন্ন যন্ত্র ও হাতিয়ারের কার্যকারিতা কতটা অনুভূত হয়েছে? হাতের শ্রমকে লাঘব করার মত কোন পন্থা কেউ অবলম্বন করেছে কি?

৬। ফলগাছের দিকে যত্ন কেমন নেওয়া হচ্ছে? জ্বালানী কাঠের উপযোগী গাছ লাগানো হয় কি? সারাবছরের প্রয়োজনীয় সব্‌জি গ্রামে উৎপন্ন হয় কি? বাইরে থেকে কি কি সব্‌জি গ্রামে আনতে হয়? গ্রাম থেকে কত সব্‌জি বাইরে চালান যায়?

৭। গো মহিষের খাদ্য কি পরিমাণ গ্রামে উৎপন্ন হয়? সারা বছরের চাহিদার তুলনায় পরিমাণটা কি পর্যাপ্ত? কি কি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে? গোচারণের কোন ভূমি আছে কি? এ ভূমির কোন উন্নতিসাধন সম্ভব কি?

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উৎপাদন পরিবেশ সৃষ্টি করে :—

১। জমি—

(ক) জমির রকম কেমন? বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানোর পক্ষে কতটা উপযোগী? উর্বরা-শক্তি কেমন?

(খ) সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা কেমন আছে?

(গ) প্লটের সাইজ ও শেপ কেমন? এগুলো চকবন্দী না ছড়ানো? ছড়ানো জমির পরস্পর দূরত্ব কি রকম?
(ঘ) একজন চাষী মোটামুটি কি পরিমাণ জমির মালিক?
(ঙ) মালিকানা স্বত্ব স্থায়ী না অস্থায়ী?
(চ) ক্ষেতের সংগে যোগাযোগ-ব্যবস্থা কেমন?

২। **মূলধন—**

(ক) চাষীর ঘরদোর গোলাগঞ্জ হাতিয়ার যন্ত্রপাতি কেমন আছে?
(খ) তার আর্থিক অবস্থা কেমন?
(গ) সুলভে ঋণ পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা আছে কি?

৩। **খাটুনির লোক—**

(ক) পরিবারে কর্মক্ষম ব্যক্তি কতজন আছে? বাইরের মজুর বছরে কতজন নিয়োগ করতে হয়?
(খ) কৃষকদের দক্ষতা কেমন? নতুন কোন বিষয় তারা শিখতে আগ্রহী কতটুকু?

৪। **সামাজিক পরিস্থিতি—**

(ক) স্থানীয় লোকদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মনোভাব ও ধর্মবিশ্বাস কেমন? প্রধান ও মাতব্বরদের প্রকৃতি কিরূপ? সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তি দৃঢ় না শিথিল? গ্রামে কি কি লোকসংস্থা আছে?
(খ) সাধারণ লোকের শিক্ষার মান কেমন? বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা গ্রামে আছে কি? কি কি খেলাধূলা ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা আছে?

৫। **জীবনযাত্রার মান—**

(ক) চাষীরা ঘরে রোজ কি খায়? **পুষ্টিকর খাদ্য কতটুকু পায়? সুসম খাদ্য কয়টি পরিবার জোটাতে পারে? গ্রামে কত লোক** পুষ্টিহীনতায় ভুগছে? পুষ্টিহীনতা জনিত রোগের প্রাবল্য কেমন?
(খ) কৃষি কি সারা বছরের কর্মসংস্থান দিতে পারে?

(গ) বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না আবর্জনায় ভর্তি? নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত তারা কতটুকু করতে পেরেছে?

৬। **খরিদ-বিক্রী—**

ক) গ্রামবাসী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করে কোথা থেকে? গ্রামে বা অঞ্চলে সমবায় বিপণন সমিতি গড়ে উঠেছে কি?

(খ) গ্রামের কোন্ কোন্ জিনিস বিক্রীর জন্য হাটে-বাজারে যায়?

এই উভয় দিকে নজর রেখে আপনার গ্রামের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করুন ঃ--

১। **সাধারণ তথ্য—**

(ক) গ্রামে কতঘর কৃষক পরিবারের বাস? ··

(খ) গ্রামের সাকুল্য জমির পরিমাণ কত?··

বিভিন্ন ধরণের জমির পরিমাণ (একরে) ··

(১) আবাদি জমি···

(২) পতিত জমি···

(৩) গোচর জমি ·

(৪) অনাবাদি জমি···

(৫) বনজঙ্গল···

(৬) ফলবাগান···

(৭) দোফসলী জমি···

(৮) সেচের জল পায় এমন জমি···
পুকুর·· নলকূপ খাল

(৯) সেচ পায় না এমন জমি···

২। **সার প্রয়োগের পরিমাণ ও পদ্ধতি—**

(ক) কম্পোস্ট পিটের বর্তমান সংখ্যা ·· ?
এ-থেকে বছরে কতটা সার পাওয়া যায়··· ?
আরো কি পরিমাণ সার গ্রামে প্রয়োজন··· ?

(খ) গো-মহিষের সংখ্যা ·· ?
কতটা গোবর সারের জন্য মিলে··· ?
আরো কি পরিমাণ গোবর সার প্রয়োজন··· ?

ক্রমিক নং	শস্যের নাম	জমির পরিমাণ	বিঘায় উৎপাদনের হার	বছরের সাকুল্য উৎপাদন
১।	ধান—আউস			
	আমন			
	বোরো			
২।	গম—			
৩।	পাট—			
৪।	কলাই—			
৫।	আখ—			
৬।	সরিষা—			
৭।	সব্‌জি—			

(গ) কতটা জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করা হচ্ছে ··?

(ঘ) কোন্ কোন্ সবুজ সারের বীজ গ্রামে পাওয়া যায়· ?
কোন্ বীজ কতটা পাওয়া যায় ?
কি পরিমাণ বীজ আরো প্রয়োজন ?

(ঙ) গত বছর রাসায়নিক সার কতটা ব্যবহার করা হয়েছে· ?

(i) ইউরিয়া—
(ii) এ্যামোনিয়াম সালফেট—
(iii) সুপার ফসফেট—
(iv) ফারটিলাইজার মিক্সচার—

কোন্ সার আর কতটা প্রয়োজন ?

৩। উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার—

ক্রমিক সংখ্যা	শস্যের নাম	কতটা জমিতে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহৃত হয়	কতটা জমিতে ব্যবহৃত হয় না	গ্রামে উন্নত বীজ কতটা পাওয়া যায়	আরো কতটা বীজ প্রয়োজন
১।	ধান—				
২।	গম—				
৩।	পাট—				
৪।	আখ—				
৫।					
৬।					

৪। চাষের কাজে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ—

(ক) গত বছর কতটা জমিতে লাইনে চাষ করা হয়েছে··· ?

(খ) „ „ কতটা বীজ রোপনের আগে শোধন করে নেওয়া হয়েছে··· ?

(গ) „ „ কতটা জমিতে রোগ ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে··· ?

(ঘ) „ „ কতটা জমি লেভেল করে সমান করা হয়েছে··· ?

(ঙ) „ „ কতটা জমিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে··· ?

(চ) „ „ কতটা জমিতে তিনটি ফসল তোলা হয়েছে··· ?

৫। হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার—

(ক) গ্রামে পাম্পিং মেসিন আছে কি ?···

(খ) „ ক'খানা স্প্রেয়ার ও ডাস্টার আছে ?···

(গ) „ উন্নত লাঙ্গল ক'খানা আছে ?···

(ঘ) „ সীড্‌ড্রিল, হো, উইডার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহৃত হয় কি ?··· ক'জন ব্যবহার করেন ?···

৬। গোপালন—

(ক) ভাল ষাঁড়ের সংখ্যা···দেশী·· উন্নত···

(খ) বলদের সংখ্যা···

(গ) গাইগরুর সংখ্যা···

(ঘ) মহিষের সংখ্যা···

(ঙ) কতটা জমিতে গো-মহিষের খাদ্য উৎপন্ন হয়···

(চ) প্রজনন-কেন্দ্র কতদূরে···

(ছ) গাইগরু প্রতিদিন গড়ে কতটা দুধ দেয়···

(জ) ছাগলের সংখ্যা·· ছাগ·· ছাগী ··

৭। হাঁস মুরগী পালন—

(ক) গ্রামে কত হাঁস ও মুরগী আছে—

(খ) দেশী কত· উন্নত জাতের কত—

৮। মাছ চাষ—

(ক) গ্রামে ক'টি পুকুর ও খাল আছে—

(খ) ক'টি পুকুরে মাছের চাষ হয়—

(গ) গত বছর কি পরিমাণ মাছ ধরা হয়েছে—

৯। গত বছর গ্রামবাসী সাকুল্যে কত টাকা ঋণ পেয়েছে ?

(ক) সমবায় সমিতির মাধ্যমে—

(খ) ব্লক আপিসের মাধ্যমে—

(গ) মহাজনের কাছ থেকে—

চল্‌তি বছর ও আগামী বছরে কত টাকা ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন হবে ?

কতজন লোক সমবায় সমিতিব সভ্যভুক্ত হয়েছে ?

১০। খাদ্য-শস্য প্রয়োজন ও উৎপাদনের পরিস্থিতি—

ক্রমিক সংখ্যা	শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের নাম	মোট প্রয়োজন	গ্রামে কতটা উৎপন্ন হচ্ছে	বাড়তি কত	ঘাটতি কত
১।	চাল—				
২।	ডাল—				
৩।	আটা—				
৪।	সব্‌জি—				
৫।	মাছ—				
৬।	দুধ—				
৭।	ডিম—				
৮।	ফল—				
৯।					

এবার সংগৃহীত তথ্যগুলো বিচারবিশ্লেষণ করে দেখুন—ধান, গম, আখ বা কলাই আরো কতটা উৎপন্ন করতে হবে; পাট, শন ও তুলার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন কিনা; নতুন কোন ফসল চালু করা উচিত হবে কিনা; সব্‌জি ও ফলের চাষ আর কতটা বাড়ানো দরকার; গ্রামে নতুন যন্ত্রপাতি কি কি আনতে হবে; মাছ, দুধ ও ডিমের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কি করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবার পর একবছরের উৎপাদন প্রোগ্রাম তৈরী করুন।

এইভাবে তথ্য-সংগ্রহ আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গ্রামের কৃষিসমস্যাগুলো সবার কাছে স্পষ্ট করে তোলা এবং উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা পঞ্চায়েতের প্রধানতম কাজ। উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে পঞ্চায়েত যদি নেতৃত্ব নেয়, কৃষকদের জোটবদ্ধ করে এবং পরিকল্পিত হয়ে অগ্রসর হয় তবে বছর কয়েকের মধ্যে গ্রামের চেহারা বদলে যাবে। গ্রামবাসীরা আর্থিক দিকে উদাসীন থাকলে পঞ্চায়েত কখনও জনপ্রিয় হতে পারবে না।

প্ল্যানিং ও লক্ষ্য নির্ণয় ঃ

সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম হয় না। নিশানা ঠিক না থাকলে পথ চলায় কোন গতিবেগ আসে না। ফুটবল প্লেয়ার যেমন প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ছুটে, শিকারী যেমন কোন পশু বা পাখীর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে এগোতে থাকে, পর্বত-আরোহী যেমন নির্দিষ্ট চূড়া লক্ষ্য করে পদক্ষেপ ফেলে, সম্প্রসারণ-কর্মীরও তেমনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজে হাত দিতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে কতটা উন্নয়ন-মূলক কাজ করতে চান, আপনার গন্তব্যস্থল কোথায় সেকথা স্পষ্টভাবে বলে নিয়ে পথে পা বাড়াবেন, অনেকের সাড়া পাবেন। আর লক্ষ্যটা যতই ধোঁয়াটে রাখবেন মানুষ ততই আপনাকে এড়িয়ে যাবে, সকল শ্রম শেষে পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। আপনার গন্তব্যস্থলটাকে মাইল পোষ্ট দিয়ে ভাগ করে নেবেন, দূরত্বের পরিমাণটা তাহ'লে সকলের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এইভাবে ভাগ করে নিতে পারেন—

১। চরম লক্ষ্য বা শেষ উদ্দেশ্য (ultimate or fundamental objective):

উদাহরণ—আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হবে, দায়িত্বশীল নাগরিক হবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে শিখবে এবং সুখের সংসার বাঁধবে এমন সুন্দর মানুষ গড়ে তোলা সম্প্রসারণের চরম লক্ষ্য।

২। সাধারণ লক্ষ্য (general objective):
উদাহরণ—ডঃ জে. পল. লিগানসের ভাষায় বলি, "সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য এমন পরিবার গড়ে তোলা যারা সুন্দর কুটিরে বাস করবে, যাদের জোতভূমি ক্রমশ উর্বরা হবে, এবং যাদের চলন-বলন দিনে দিনে সুরুচিপূর্ণ হয়ে উঠবে।" এক কথায় জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৩। সুস্পষ্ট ও কার্যকরী লক্ষ্য (working or specific objective):
প্রচলিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন
পল্লী-শিল্পের উন্নতি সাধন
অনিয়ন্ত্রিত বাজার ও বিশৃঙ্খল ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করা
ঘরে ঘরে সহজ স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস প্রবর্তন করা

৪। আশু লক্ষ্য (goals or targets):
উদাহরণ—গতবছর এই গ্রামে ১৫ একর জমিতে দু'টি প্রধান শস্যের চাষ হয়েছে ; এবং ২৫ একর জমিতে ফলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রামে ১১৫ মণ উন্নত বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে, আগামী সনে পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫০ মণ করা হবে।

লক্ষ্য স্থির করার ধারাটা আর একটু সহজ করে বুঝে নিন—

১। সুন্দর নাগরিক গড়ে তোলা কেমন করে গড়ে তুলবেন ?

২। জীবনযাত্রার মান উন্নত করে মান উন্নত কিভাবে হবে ?

- কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো যাবে কেমন করে ?
- শিল্পের প্রবর্তন করে
- স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে
- শিক্ষা বিস্তার করে

কৃষি উৎপাদন বাড়ানো:

- ভাল বীজ বুনে ভাল বীজ বুঝবো কেমন করে ?
- উন্নত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করে
- উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করে

ভাল বীজ:

- গবেষণাগারে পরীক্ষালব্ধ উন্নতজাতের বীজ সংগ্রহ করে কতটা বীজ প্রয়োজন হবে ?
- জমি ও স্থান অনুযায়ী বীজ নির্বাচন করে

আমার গ্রামে ১৫০ মণ লাগবে।

আপনাকে এই কথাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

জাতীয় পরিকল্পনাকে যদি নীচের স্তরে পল্লী পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া না যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নের চেষ্টা পদে পদে বিঘ্নিত হবে। জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য যত বাস্তবসম্মত হবে ততই বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী কার্যকরী পল্লী পরিকল্পনা তৈরী করা সহজ হবে। পল্লী, ব্লক, জিলা, রাজ্য সর্বস্তরেই একটা লক্ষ্য সামনে রেখে সুপরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা করা উচিত—তবে জাতীয় পরিকল্পনা সার্থক হবে। উপর থেকে স্থির করা কোন টার্গেট পল্লী-বাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে গেলে তাদের সহযোগিতা কখনই পাওয়া যাবে না।

নবম অধ্যায়

মানুষের কাছে যাওয়া ঃ

প্রোগ্রাম তো ঘরে বসে তৈরী করা যায়। কাজের একটা খসড়া করাও শক্ত কাজ নয়, কিন্তু কার্যকরী করাই যত মুশকিল। সম্প্রসারণে মানুষ মুখ্য, আর সব গৌণ। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব অভিরুচি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আর্থিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির ব্যাপার আছে। কাজেই উন্নয়ন প্রোগ্রাম নিয়ে যত বেশী মানুষের কাছে যাওয়া যাবে, সেটা যত তাদের মনঃপুত হবে, তত প্রোগ্রামটি নিজের বলে গ্রহণ করবে। মানুষের কাছে যাবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ঠিকতালে পা ফেললে জায়গামত পৌঁছবেন। আর বেতালে পা ফেললে ধাক্কা খাবেন। ধরুন, আপনি কোন গৃহে ঢুকতে চান। যদি দেওয়াল ভেদ করে অথবা জানালা দিয়ে ঢুকতে উদ্যোগী হন তবে বাধা পাবেন কিন্তু দরজা বরাবর এগিয়ে গেলে একেবারে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করবেন। কাজেই সম্প্রসারণ পদ্ধতির গুরুত্ব যে কত বেশী তা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কোন্ সময় কোন্ অবস্থায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত সম্প্রসারণ-কর্মী বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে স্থির করবেন। মানুষের কাছে যাওয়ার পদ্ধতি মোটামুটি তিন প্রকার।

১। জনতার কাছে যাওয়া (Mass Approach)—বড় জনসভা, পোষ্টার, সংবাদপত্র, পত্রিকা, ছায়াছবি, রেডিও, সার্কুলার লেটার, টেলিভিশন ইত্যাদির সাহায্যে কোন নতুন আইডিয়া বা সমস্যার প্রতি একই সঙ্গে বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। **জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও জনতাকে আগ্রহশীল করে তোলার এই পদ্ধতিকে জনশিক্ষা বা Mass Teaching Method বলে।**

২। গ্রুপের কাছে যাওয়া (Group Approach)—ছোট ছোট জমায়েতে জড়ো করে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা, বিভিন্ন রকম ডিমন্‌স্ট্রেশন দেওয়া, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও ভ্রমণের আয়োজন করা শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এতে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়, মনের সন্দেহ কেটে কোন আইডিয়া গ্রহণ করার আগ্রহ বাড়ে। আগ্রহকে তীব্রতর করা ও আস্থা আনবার পক্ষে এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী। **দলবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিকে Group Teaching Method বলে।**

৩। ব্যক্তির কাছে যাওয়া (Individual Approach)—

গ্রুপে অনেক ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ শিক্ষা যদিও দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্যক্তিগত সংযোগের মূল্য যে অপরিসীম তা কখনই ভোলা চলবে না। কোন নতুন কার্যপ্রণালী বা কোন নতুন প্র্যাক্‌টিস্‌ কৃষক বা পল্লীবাসীকে গ্রহণ করাতে হ'লে ব্যক্তিগত সংযোগের একান্ত প্রয়োজন। কৃষকের কাছে কোন নতুন বিষয় বলবার আগে কর্মীকে সব জেনে নিতে হয়। আস্থাভাজন হ'তে না পারলে কৃষক পরিবারে কোন পরামর্শই গৃহীত হবে না। এই কারণেই উভয়েরই পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করা দরকার। **ব্যক্তিগত সংযোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানকে Individual Teaching Method বলে।**

একটা ছকে ফেলে বিষয়টি সহজ করবার চেষ্টা করছি।

জনসংযোগের স্তর থেকে ক্রমশ ব্যক্তিগত সংযোগের দিকে যত এগিয়ে যাওয়া যায় শিক্ষাদান তত পাকা হয়। মনে রাখবেন কোন একটা পদ্ধতিতে সকলে প্রভাবিত হয় না। কেন না, **একটিমাত্র পদ্ধতি সবার কাছে গ্রাহ্য হয় না।** অবস্থা অনুযায়ী কোন্‌ পদ্ধতি কোথায় সবচেয়ে কার্যকরী হবার সম্ভাবনা-কর্মীকে আগেই ভেবেচিন্তে স্থির করতে হবে। একটা নতুন 'প্র্যাক্‌টিস্‌' চালু করার জন্যে অথবা কোন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করবার জন্যে যে যে বিষয় আলোচনা

করতে হবে তার নির্বাচন কর্মীর যোগ্যতা প্রমাণ করে। অনেকগুলি পদ্ধতির আশ্রয় না নিলে মানুষ সহজে কিছু গ্রহণ করতে
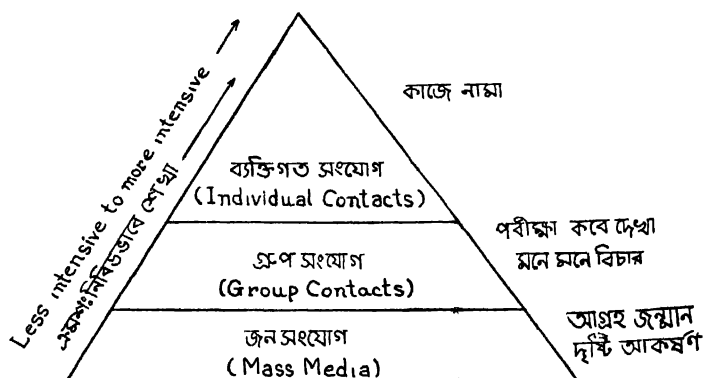
চায় না, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মানুষে মানুষে তফাৎ আছে, সবার গ্রহণ-ক্ষমতা একরকম থাকে না। কেউ অতি সহজেই কোন আইডিয়া গ্রহণ করে, দীর্ঘদিন চেষ্টা করে কাউকে কোন বিষয় গ্রহণ করাতে হয়। আবার আইডিয়াও একরকম নয়—কোনটা সহজ, আবার কোনটা বেশ জটিল। কোন কৃষক রাসায়নিক ও জৈব-সার ব্যবহার জানে; হয়তো তার পরিমাণটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে বলুন, সহজেই সে করবে। হাতে ছিটিয়েই ধান বুনতে যারা অভ্যস্ত, তাদের কোন যন্ত্র দিয়ে বুনতে বললে চট্‌ করে গ্রহণ করবে না, একটু সময় লাগবে। আবার মনে করুন কোন লোক গো-পালন করে সংসার চালায়; তাকে যদি গরু পালা বাদ দিয়ে মুরগী পালতে বলেন তবে সেটা গ্রহণ করাতে আপনার খুব বেগ পেতে হবে। একটা পেশা ছেড়ে অন্য পেশা মানুষ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। সম্প্রসারণ-কর্মীকে এই কথাগুলো বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো এইভাবে ভাগ করে দেখুন।

ব্যাক্তিগত সংযোগ	গ্রুপ সংযোগ	জন সংযোগ
কৃষকের মাঠে ও গৃহে গিয়ে দেখা করা— কর্মীর বাসায় কৃষকের আসা ব্যক্তিগত চিঠি ফল প্রদর্শন (Result Demonstration) টেলিফোনে কথা বলা	গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে বৈঠক ছোটখাটো সমিতির আয়োজন মেথড ডিমনস্ট্রেশনের জন্য বৈঠক শিক্ষামূলক ভ্রমণ স্কুলের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ প্রদর্শনী ও উৎসবের আয়োজন	বুলেটিন লিফ্‌লেট বা বিজ্ঞাপনপত্র সংবাদপত্র, পত্রিকা পরিপত্র (সার্কুলার লেটার) রেডিও মডেল পোষ্টার

আর একভাবে সাজিয়েও সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলো দেখতে পারেন

লিখিত জিনিসের সাহায্যে সম্প্রসারণ	আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রসারণ	চোখের সামনে কোন জিনিস তুলে ধরে সম্প্রসারণ
বুলেটিন লিফ্‌লেট সংবাদপত্র, পত্রিকা ব্যক্তিগত চিঠি পরিপত্র বা সার্কুলার লেটার	ঘরোয়া বৈঠক ক্ষেতে ও গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎকার কর্মীর কোয়ার্টার বা আপিসে আসা রেডিও	পদ্ধতি প্রদর্শন (Method Demonstration) ফলাফল প্রদর্শন (Result Demonstration) মডেল, নমুনা বা দেখাবার মত অন্য জিনিস চার্ট পোষ্টার, স্লাইড, ফিল্ম স্ট্রীপ, ছায়াছবি
	কোন ডিমনস্ট্রেশন দেবার আগে প্রস্তুতির জন্য (২) ও (৩) কলমে বর্ণিত অনেকগুলো পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। চোখের সামনে তুলে ধরা ও মুখে বলার কাজ বহুক্ষেত্রে একই সঙ্গে চালাতে হয়; যেমন—যাত্রা, নাটক, ছায়াছবি ইত্যাদি।	

সম্প্রসারণ শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত সংযোগের স্থান ঃ

ক্ষেতে ও গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ করা (Farm & Home visit)—

কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পল্লীবাসীর সঙ্গে সোজাসুজি পরিচিত হবার এটা উৎকৃষ্টতম পন্থা। বহু উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া যায়—

১। কৃষকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাব আস্থাভাজন হওয়া।

২। ব্যক্তিগত সমস্যা ও পল্লীর সমস্যা আলোচনা করে ও চোখে দেখে বুঝে নেওয়া।

৩। ডিমন্‌স্ট্রেশন দেবার পরিকল্পনা নেওয়া।

৪। কোন কাজে কাউকে কুশলী কবে তোলা।

৫। ধৈর্যের সঙ্গে কারো বিপদ বা অসুবিধার কথা শুনে সকল বিষয় বুঝিয়ে বলা।

৬। কোন একটা নতুন প্র্যাক্‌টিস্‌ চালু কবতে গিয়ে যে ফল পাওয়া যাচ্ছে তা লক্ষ্য করা ও লিপিবদ্ধ করা। কোন কাজে হাত দিলে সেটা শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়।

পল্লীবাসীর ক্ষেতে বা গৃহে যাবার সময় একটা পরিকল্পনা মাথায় ছকে নিয়ে যাওয়া উচিত। উদ্দেশ্যবিহীন যাওয়ার ফল কল্যাণকর হয় না। কারো ক্ষেতে বা বাড়ীতে থাকার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখবেন।

১। বাড়ীর কর্তা ও পরিবারের আর সকলের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুন। তারা যেন ক্রমশ আপনাকে আপনজন বলে ভাবতে শেখে।

২। আপনার উদ্দেশ্যের কথা কখনও ভুলে যাবেন না। প্রয়োজনের বেশী সময় কোথাও অতিবাহিত করবেন না।

৩। আপনার আচরণ যেন শোভন ও স্বাভাবিক হয়। সব দিক চোখ মেলে দেখবেন। সব সময় সতর্ক ও সচেতন থাকবেন।

৪। পরিবারের ধর্ম-বিশ্বাস, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক আচার-আচরণের পটভূমি কখনও ভুলে যাবেন না।

৫। সহজ সরল ভাষায় কথা বলবেন ; দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করবেন না।

৬। গৃহকর্তা ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের অধিকাংশ কথা বলতে দেবেন। যতদূর সম্ভব আপনি কম কথা বলবেন।

৭। কোন কিছু যদি শিখতে চান অথবা শেখাতে চান, একনিষ্ঠভাবে করবেন।

৮। কোন ভাল আইডিয়া যখন কোন কৃষক বা পল্লীবাসী গ্রহণ করবে, সমস্ত সুখ্যাতি তাকে দিবেন।

৯। সরবরাহ্ করার মত যদি বীজ, সার বা অন্য কিছু থাকে, সময়মত সেটা বিতরণ করবেন।

১০। কখনও চটাচটি করে বাড়ী বা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসবেন না। বন্ধুর মত প্রীতির সঙ্গে বিদায় নিয়ে আসবেন।

১১। যদি আবার আসতে চান, কবে নাগাদ আসতে পারবেন জানিয়ে দিলে ভাল হয়।

১২। আপনার এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ও সাফল্য নিজের মন্তব্যসহ তারিখ দিয়ে ডায়েরীতে লিখে রাখুন।

সুবিধা: বাড়ীতে ও ক্ষেতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুবিধা অনেক। সুপরিকল্পিতভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারলে, কর্মীর কাজের বহু সুবিধা হবে। যেমন—

১। ক্ষেত-খামার ও পরিবারের গৃহ-সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা যাবে।

২। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ও আস্থার ভাব দানা বেঁধে উঠবে।

৩। স্থানীয় যোগ্য নেতা চিনে নেওয়া সহজসাধ্য হবে।

৪। শিক্ষাদানের অন্যান্য পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হবে।

৫। অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে যে সব লোককে তেমন প্রভাবিত করা যায় না, এই পদ্ধতিতে সহজেই তার কাছে পৌঁছানো যায়।

৬। বহু পরিবারের বহু সংবাদ ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধা: এই পদ্ধতি যদিও খুবই কার্যকরী, কিন্তু সকলের সঙ্গে সংযোগ করা বড়ই সময়সাপেক্ষ। কর্মীর সংখ্যা যখন কম,

তখন এত সময় পাওয়াই দায়। অনেক সময় দেখা যায়, একই পরিচিত গৃহে কর্মী বার বার যাচ্ছেন।

রেডিওতে নতুন কোন আইডিয়া যখন কৃষকরা শোনে অথবা কোথাও কোন প্রদর্শনীতে নতুন হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি দেখে তারপর ক্ষেতে বা গৃহে গিয়ে সাক্ষাৎ করলে সুফল পাওয়া যায়।

ছোট ছোট জমায়েতে বৈঠক বা Group Discussion :

Group Discussion বলতে কি বোঝায় ?

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে জনকয়েক লোক একসাথে বসে যখন পরস্পরের অনুভূতি ও মতামত আদান-প্রদান করে, পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় আলাপ-আলোচনা করে, তাকে ঘরোয়া বৈঠক বা Group Discussion বলে। আলোচনা যেহেতু ঘরোয়া, এতে সকলেই খোলাখুলি কথা বলে ও নিজের মত ব্যক্ত করে। এ ধরনের বৈঠকী আলোচনায় একসাথে কখনও বেশী লোক ডাকতে নেই। দশ-বার জন লোক নিয়ে এক-একটা গ্রুপ হলেই ভাল হয়, খুব বেশী হলে সংখ্যা ১৫ জন পর্যন্ত করা যেতে পারে। স্কুলবাড়ী, পঞ্চায়েত ঘর বা বড় গাছের ছায়ায় পল্লীর লোক Group Discussion-এর আয়োজন করতে পারে।

Group Discussion-এর প্রয়োজনীয়তা কি ?

নতুন কোন আইডিয়া সাধারণের মধ্যে বিস্তারের পক্ষে গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শন খুব উপযোগী। ছোট ছোট দলে ভাগ করে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই মনে রাখতে পারে। কেরল রাজ্যে সম্প্রতি সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শনে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তার শতকরা ৯৬ ভাগ অংশ গ্রহণকারীরা মনে রেখেছে। বৈঠকী আলোচনা আমাদের অজানা নয়, ছোট ছোট জমায়েতে আমরা বসতে অভ্যস্ত, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে

চিন্তা করা ও কাজ করার অভ্যাস আমাদের মধ্যে এখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু আলোচনা। আলাপ-আলোচনা ও মত-প্রকাশের পথ যেখানে রুদ্ধ, সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশও স্তিমিত। জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ দেখা না দিলে গণতন্ত্র অরাজকতার দিকে পা বাড়ায়। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শনের মূল্য এইখানে।

আলোচনার কয়েকটি নিয়ম ঃ

গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শনের সময় এই নিয়মগুলো পালন করা উচিত ঃ—

(ক) বৈঠক যেন সম্পূর্ণরূপে ঘরোয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়।

(খ) সকলেই যেন সহযোগী মনোভাব নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেকেই যেন অপরের মতামত বুঝতে চেষ্টা করে।

(গ) মতামত প্রকাশে সকলেরই যেন সমান অধিকার থাকে।

দলপতি চাই ঃ

এ ধরনের আলোচনা বৈঠকে একজন দলপতি প্রথমেই নির্বাচন করে নেওয়া উচিত। আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করার জন্য দলপতি প্রয়োজন। ঘরোয়া বৈঠকে দলপতিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয় ঃ—

(১) লক্ষ্য রাখা আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে যেন সকলের মুখ দেখতে পায়।

(২) বিশেষভাবে খেয়াল রাখা একটা নির্দিষ্ট সময়ে যেন আলোচনা সুরু ও শেষ হয়। সময়টা যেন সকলের উপস্থিত হওয়ার পক্ষে উপযোগী হয়। বৈঠকের স্থানটি যেন সকলের মনঃপূত হয়। ভাল পরিবেশে মানুষ ভাল চিন্তা করে।

(৩) যে লাজুক তাকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করাতে হবে। যে

অতিরিক্ত কথা বলে, তাকে সংযত করতে হবে। কিন্তু কোন বিশেষ প্রশ্নে বিভিন্ন মতামত টেনে বের করবেন তিনি।

(৪) সকলের প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়া এবং কোন সমস্যা সমাধানে নিজের মতকে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া দলপতির কাজ নয়। নানা প্রশ্ন তুলে দলপতি আলোচনাকে সব সময় সজীব রাখবেন।

(৫) কোন সময় মত-বিরোধ দেখা দিলে অথবা উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া দলপতির কাজ।

(৬) সকলের মতামতের সারাংশ তিনি মাঝে মাঝে গুছিয়ে বলবেন এবং সিদ্ধান্তে পৌছানোর কাজকে সহজতর করে তুলবেন।

(৭) আলোচনার গতি ক্রমশ যেন সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্দেশ করে, সেদিকে নজর রাখার প্রধান দায়িত্ব দলপতির।

(৮) দলপতি সবার সঙ্গে বন্ধুর মত, আপন জনের মত ব্যবহার করবেন।

আলোচনার বিভিন্ন ধাপ আছে :

জোটবদ্ধ হয়ে আলোচনার যেমন একটা উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি কতকগুলো যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপও থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলোভাবে গল্পগুজব করাকে সত্যিকারের গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শন বলে না। কতকগুলো পদক্ষেপের ভিতর দিয়ে আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হয়।

১। আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করবেন দলপতি। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করবেন। কোন বিশেষ প্রশ্নে যে সব সমস্যা গ্রামবাসী অনুভব করছে, আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। দলের সবার মনে সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে যেভাবে রেখাপাত করা প্রয়োজন, এই সময়েই করতে হবে। যদি সমস্যাটি সম্বন্ধে সকলেই সজাগ থাকে, তবে এখানে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন হবে না।

২। একমত হয়ে সমস্যাগুলো বেছে নেবার পর ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে—কোন্‌টার সঙ্গে-স্বাস্থ্য-বিভাগের যোগ আছে, কোন্‌টার সঙ্গে সেচ-বিভাগের যোগ আছে, কোন্‌টার সঙ্গে কৃষি-বিভাগের যোগ

আছে অথবা সমবায়-বিভাগের যোগ আছে। এ-বিষয়ে কারো যদি বেশী অভিজ্ঞতা থাকে, এই সময়েই জেনে নিতে হবে।

৩। এবার সমস্যাগুলো আর একবার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে একটার সঙ্গে আর একটার কতটা সম্পর্ক আছে। কোন সমস্যাই যে বিচ্ছিন্ন নয়, পবস্পব জড়িত—এই কথা এই সময় ভাল করে বুঝে নিতে হবে। সম্প্রসাবণ কর্মীর এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

৪। সকল দিক বিবেচনা করাব পর সমাধানেব উপায় নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং একটা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে।

৫। তারপর কবে, কোথায়, কিভাবে কাজে নামা হবে তাব খসড়া (প্ল্যান) বৈঠকেই তৈবি করে ফেলতে হবে। কে কোন্ কাজের দায়িত্ব নেবে, সবাব উপস্থিতিতে স্থির করা হবে।

৬। সবার শেষে জোট বেঁধে কাজে নামা। কাজের জন্যই বৈঠক। বৈঠকে যদি কাজের প্ল্যান তৈরি না হয় এবং কাজে হাত দেওয়া না যায়, তবে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। বৈঠক ক্রমশ আড্ডায় পরিণত হবে।

সুফল কি লাভ হবে ?

(১) আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেব মধ্যে ক্রমশ হৃদ্যতা দেখা দেবে।

(২) অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানো যাবে।

(৩) পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া সহজ হবে

(৪) সমবেতভাবে কাজের প্ল্যান তৈরি করা সহজসাধ্য হবে।

(৫) কোথা থেকে কি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, তার খবর সকলকে জানানো সহজ হবে।

(৬) দলের সকলের চিন্তাশক্তি বাড়বে, আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় হবে, দায়িত্ব-বোধ দেখা দেবে।

(৭) বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।

অসুবিধা ঃ

(১) উদ্দেশ্যমূলক গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শনে চিন্তার ক্ষেত্রকে খুব প্রসারিত করা যায় না।

(২) গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শনের একক মূল্য বড় কম। অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে এ-কে যুক্ত করলে ফলপ্রসূ হয়।

(৩) গ্রুপ বড় হলে সকলে অংশ নেবাব সুযোগ পায় না।

গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শন একরকমের নয়—নানা ধরন আছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ—

(১) সেমিনার (Seminar)—এটা একটা বৃহৎ গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শন। উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক। অংশগ্রহণকারী সকলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করার জন্য এর আয়োজন করা হয়। সেমিনার ঠিক সম্মেলন নয়। সম্মেলনে কোন নীতি বা পলিসি ঠিক কবা হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় আগেই স্থিব করা থাকে। সমবেত-ভাবে আলাপ-আলোচনা করে বিষয়টি কার্যকরী করার পন্থা উদ্ভাবন করা হয় সেমিনারে। সেমিনারে কোন সমস্যার সকল দিক ভালভাবে খতিয়ে দেখা হয়, সহযোগী মন নিয়ে সকলে পন্থা অনুসন্ধান করে এবং শেষ পর্যন্ত একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো হয়।

সেমিনারের মোটামুটি চারটি ভাগ থাকে ঃ—

(ক) উদ্বোধন সভা—প্রথমে অংশগ্রহণকারী সকলের সামনে আলোচ্য সমস্যাটা উত্থাপন করা হয় এবং ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

(খ) গ্রুপ ডিস্‌কাস্‌শন—তারপব সকলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সমস্যার এক-একটা দিক নিয়ে ভাল করে বিচার করে, সমাধানের উপায় খোঁজে এবং একটা সিদ্ধান্তে পৌছায়।

(গ) পরিচালক কমিটি—সেমিনারের চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন দলের

দলপতিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সেমিনার ঠিকভাবে যাতে পরিচালিত হয়, কমিটি সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

(ঘ) সাধারণ বৈঠক—প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সাধারণ বৈঠকে সমবেত হয়ে বিভিন্ন গ্রুপের সিদ্ধান্ত আলোচনান্তে সকলে অনুমোদন করে।

(২) সিম্‌পোসিয়াম (Symposium)—একদল শ্রোতার সামনে একই বিষয়ের উপর বলবার জন্য দুই বা বেশী ব্যক্তিকে ডাকা হয়। যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত, তাদেরই সেই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বক্তাগণ আগে থেকে লিখে এনে পাঠ করেন অথবা মুখে বলেন। মূলকথা, তারা প্রস্তুত হয়ে আসেন। এক একজন বক্তা বক্তৃতার শেষে শ্রোতাদের ২।১টি প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন। জ্ঞান সম্প্রসারণের এটা এক সুন্দর পদ্ধতি। এর সুবিধা এই যে, একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা শ্রোতারা জানতে পারে। তাছাড়া, একই লোক বেশী সময় বক্তৃতা দিলে একঘেয়ে ঠেকে। সিম্‌পোসিয়ামে বিভিন্ন বক্তার বিভিন্ন কণ্ঠ একঘেয়েমি আসতে দেয় না।

(৩) প্যানেল ডিস্‌কাস্‌শন (Panel Discussion)—এটা এক প্রকারের বৈঠকী আলোচনা, যেখানে সাধারণত পাঁচ বা সাতজন নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করা হয়। আলোচনাটি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে চলে, অনেকটা রাউণ্ড টেবল্‌ ডিস্‌কাস্‌শনের মত। গ্রুপের একজনকে মধ্যস্থ ঠিক করা হয়। তিনি আলোচনার শেষে সকল প্রশ্ন ও জবাবের সারাংশ উল্লেখ করে নিজ মন্তব্যসহ সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্যানেলের ব্যক্তিগণ একদল শ্রোতার সামনে আলোচনা চালায়। শ্রোতাগণ শোনেন, কিন্তু আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করেন না। অনেকটা নির্বাক দর্শকের মত আলোচনার গতি লক্ষ্য করেন। আগে থেকে প্রস্তুতি ছাড়া প্যানেল ডিস্‌কাস্‌শন করা যায় না।

সম্প্রসারণে প্রদর্শনের গুরুত্ব :

প্রদর্শন দুই প্রকার—

(১) ফল প্রদর্শন (Result Demonstration);

(২) পদ্ধতি প্রদর্শন (Method Demonstration)।

সম্প্রসারণে প্রদর্শনকে অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হয়। তার কারণ, বাস্তব সমস্যা সমাধানে লোকশিক্ষা দেবার এমন সুন্দর পদ্ধতি আর নেই। একই সঙ্গে কথা শোনা, চোখে দেখা ও হাতে করার কাজ চলে প্রদর্শনে। এতে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারে। প্রদর্শনে শিক্ষাদান কখনও ভাসা-ভাসা হয় না।

ফল প্রদর্শন (Result Demonstration) :

ফলাফল হাতে-নাতে দেখিয়ে দেওয়া। কোন একটা নতুন ও উন্নত প্র্যাক্‌টিস্‌ গ্রহণ করলে কতটা সুফল পাওয়া যেতে পারে, জন-

সাধারণের চোখের সামনে তা তুলে ধরাকে ফল প্রদর্শন বলে। জন-শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা চমৎকার কার্যকরী পদ্ধতি। পুরাতন ও

নতুন পদ্ধতি পাশাপাশি চোখের সামনে তুলে ধরে, উভয়ের ভাল-মন্দ বিচারের সুযোগ দেওয়া হয় ফল প্রদর্শনে।

ফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্য—(১) একটা নতুন প্র্যাকৃটিসের সুবিধা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা।

(২) গবেষণাগারে পরীক্ষায় যে সুফল পাওয়া গেছে, সেটা যে এই গ্রামেও পাওয়া সম্ভব তা দেখিয়ে দেওয়া।

'চোখে দেখে বিশ্বাস করো'—এই নীতিব উপরে বেজাল্ট ডিমন্‌-স্ট্রেশন প্রতিষ্ঠিত। উন্নতজাতের বীজ, উপযুক্ত পরিমাণ সার, রোগ ও কীটনাশক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার কবলে এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে কেমন সুফল পাওয়া যায়, বেজাল্ট ডিমন্‌-স্ট্রেশনের সাহায্যে সেটা আমরা সবার চোখেব সামনে তুলে ধরতে পারি।

প্রদর্শকের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ওপরে প্রদর্শনের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই দেখেশুনে ভাল প্রদর্শক নির্বাচন করতে হয়। প্রদর্শকের নিম্নলিখিত গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

১। যে বিষয়ে প্রদর্শন করবেন, তাতে পাকা জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। তাঁকে কবিৎকর্মা লোক হতে হবে।

২। তিনি নির্ভবযোগ্য, সৎ ও অপবের আস্থাভাজন ব্যক্তি হবেন।

৩। কোন প্রদর্শন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য অনেকটা সময়, শক্তি ও নজর দিতে হয়। প্রদর্শককে এই নিষ্ঠা ও ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে।

৪। তাঁকে খুঁটিনাটি প্রতিটি লক্ষণীয় বিষয়ে রেকর্ড রাখতে হবে। তাঁর আচরণ যেন সহনশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়।

৫। প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন লোক না হলে ভাল প্রদর্শক হওয়া যায় না। নতুন কোন বিষয় পরীক্ষা করে দেখার মত মনোভাব থাকা উচিত।

৬। গ্রামজীবন ও সমষ্টিজীবনের প্রতি তাঁর মানসিক প্রবণতা থাকা দরকার।

৭। অপরের সাথে মিলেমিশে কাজ করার মত যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমে ছোট ছোট ও সহজ সহজ বিষয়ে প্রদর্শন আরম্ভ করতে হয়। বীজ, সার এবং রোগ ও কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের প্রদর্শনের সময় একটা বিষয় স্মরণ রাখবেন, যেন আপনার প্রদর্শিত জিনিসগুলি কৃষকরা সহজে সরবরাহ পায়। পরীক্ষা করতে গিয়ে কোন জায়গায় কৃষকের ক্ষতি হলে তার প্রতিবিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

চট্ করে কোন কিছুর ফল নজরে পড়ে না। সময় লাগে। বেশ কিছুদিন ধরে লেগে থাকতে হয়। প্রদর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট জমিতে সাইনবোর্ড বসিয়ে দিন। লোকজনের নজর পড়ুক। আশপাশের গ্রাম থেকে চাষীদের ডেকে আনুন। প্রদর্শক-চাষীকেই সব জিনিসটা বুঝিয়ে বলতে দিন। সুফল পাবার পর নিজেও বলুন। চলতে ফিরতে বহুলোকের যাতে নজরে আসে, এইজন্যে বড় রাস্তার ধারে প্রদর্শন করুন।

ফল প্রদর্শনের পদ্ধতিটি সব সময় তুলনামূলক হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতি ও নতুন উন্নত পদ্ধতি যেন পাশাপাশি থাকে। এতে সকলে সহজে ভাল-মন্দ বিচার করতে পারবে।

ফল প্রদর্শন কিভাবে করতে হয় ?

১। যে বিষয়ে ফল প্রদর্শন করবেন, তার উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে বলুন।

২। তারপর যে জায়গায় প্রদর্শন করবেন, সেটা জুতজাত করে নিন।

৩। মাঝে মাঝে আপনাকে বৈঠক করতে হবে—

তারিখ, সময়, স্থান, উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন ; কি কি পদ্ধতি অবলম্বন

করে এগোবেন, সেটাও ঠিক করে রাখুন। যে যে বৈঠকে যোগ দিয়েছে, তাদের নাম নোট করে রাখুন।

৪। কি কি সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র দরকার হবে গুছিয়ে রাখুন।

৫। প্রদর্শন চলা সময়ের একটা রেকর্ড রাখুন—

(ক) বৈঠকের রেকর্ড ;

(খ) যখন যে কাজ হচ্ছে তার রেকর্ড;

(গ) হিসাবপত্রের বেকর্ড,

হিসাব পত্রে রেকর্ড দুই ভাগে ভাগ করে রাখুন—

জমা—				খরচ—		
তারিখ	জিনিসের নাম	ওজন	মূল্য	তারিখ	খরচের তালিকা	মোট খরচা

লাভ-লোকসানের হিসাব—

আয়—	ব্যয়—	লাভ—

৬। বার কয়েক এই পরীক্ষা চালান এবং পরবর্তী প্ল্যান স্থির করে নিন।

৭। এবার মূল্যায়ন করে দেখে নিন আপনার ফল প্রদর্শন কতটা কার্যকরী হয়েছে।

পদ্ধতি প্রদর্শন (Method Demonstration) :

কোন হাতিয়ার বা মেসিন কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, গৃহকাজের কোন বিষয়ে নিপুণতা কিভাবে আয়ত্ত করতে হয়, তা দেখিয়ে দেওয়াকে পদ্ধতি প্রদর্শন বলে। সুন্দর বীজতলা তৈরির কৌশল কি, লাইনে চাষ কেমন ভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ভাল কম্পোস্ট তৈরি করতে হয়—এ সবের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়াই পদ্ধতি প্রদর্শন। মুখে বলা, হাতে করে দেখিয়ে দেওয়া, প্রশ্ন ও জবাবের মধ্য দিয়ে সন্দেহ দূর করা—সব কাজই একসঙ্গে করতে হয় বলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি প্রদর্শনকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়।

আপনি যদি সম্প্রসারণ কর্মী হন, ডিমনস্ট্রেশন নিজেই দেবেন।

অবশ্য গ্রামের কোন ব্যক্তিকে শিখিয়ে নিয়ে তাকে দিয়েও দেওয়াতে পারেন। তবে আপনার দেওয়াই ভাল। পদ্ধতি প্রদর্শনের সময় এ-ধরনের কোন মন্তব্য করবেন না—'আহা! এখানে তো ভুল হয়ে গেল।' 'ইস্‌! কাজটা ঠিকমত তো হলো না।' 'মাপ করবেন,
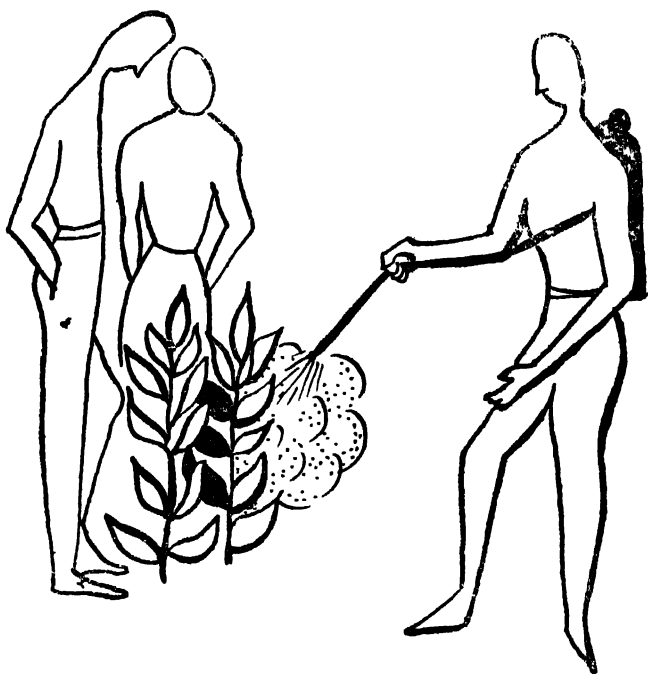
আমি সঠিকভাবে করতে পারলাম না।' পদ্ধতি প্রদর্শনের সময় এই সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যেন সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়। আধা জ্ঞান ও সামান্য দক্ষতা নিয়ে প্রদর্শকের ভূমিকায় নামা ঠিক নয়। যে যে জিনিসপত্র দরকার হবে, তা সব আগে থেকেই গুছিয়ে হাতের কাছে রাখবেন।

পদ্ধতি প্রদর্শনের কয়েকটি ধাপ :

(১) প্রদর্শন দেখার জন্যে যারা জমায়েত হয়েছে, তারা সবাই যাতে ভালভাবে দেখতে পায় ও আপনার কথা শুনতে পায়, তার

ব্যবস্থা করে দিন। কী দেখাবেন এবং কেন দেখাবেন প্রথমে বলে নিন। এ-বিষয়ে আগন্তুকদের মধ্যে কেউ কিছু জানে কিনা দেখে নিন।

(২) এবার পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্যে যে যে উপকরণ ও যে-সব জিনিসপত্র দরকার, তা সবাইকে দেখিয়ে দিন। এতে সবাই আগ্রহী হয়ে উঠবে।

(৩) তারপর একের পর এক প্রদর্শনের ধাপগুলি দিয়ে যান। যেখানে যেখানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ও নজর দিতে হবে, সেটা সবাইকে ভাল করে দেখিয়ে দিন। এমনভাবে কথা বলুন, যেন সকলে শুনতে পায়। প্রদর্শন শেষ করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন এবং যার যে সন্দেহ আছে দূর করে দিন।

(৪) এবার প্রত্যেককে হাতে-নাতে প্র্যাক্‌টিস্‌ করার সুযোগ দিন। যেখানে ভুল হচ্ছে দেখিয়ে দিন।

(৫) ধাপগুলি আবার সংক্ষেপে সবাইকে বলে দিন। লিফলেট্‌ বা প্যাম্ফলেট্‌ জাতীয় কিছু থাকলে বিতরণ করে দিন।

(৬) নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যে যারা আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাদের নাম লিখে নিন।

এইভাবে পদ্ধতি প্রদর্শন করতে হয়। ভালভাবে প্রস্তুত না হয়ে কিছু দেখাতে নেই। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখবেন :—

(১) লোকে চায় এমন জিনিসের প্রদর্শন করবেন।

(২) প্রদর্শন যা করবেন, তা যেন সময়োপযোগী হয়।

(৩) লোকের মধ্যে আগ্রহ বাড়াবার জন্যে সুরু করবার কিছুদিন আগে থেকে প্রচার চালাবেন।

(৪) পল্লীর লোকেরা অল্প আয়াসে যোগাড় করতে পারে এমন সব উপকরণ ব্যবহার করবেন।

(৫) ঠাণ্ডা মাথায় সকলের প্রশ্নের জবাব দিবেন।

পদ্ধতি প্রদর্শনের কয়েকটি উপকারিতা :

(১) এতে আত্ম-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

(২) একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রদর্শন অনেক প্রচারের চাইতে বেশী কার্যকরী।

(৩) পদ্ধতি প্রদর্শনের সাহায্যে কাজের দক্ষতা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

(৪) নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখবার দিকে ঝোঁক বাড়ায়।

(৫) স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মীর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে।

কয়েকটি অসুবিধা :

(১) সকল বিষয়ে পদ্ধতি প্রদর্শন করা যায় না।

(২) যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন ; সব জিনিস হাতের কাছে গুছিয়ে রাখতে হয়। প্রদর্শন মাত্রেই কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ।

(৩) প্রদর্শন ঠিকমত করতে না পারলে উল্টো ফল হতে পারে। এই সুবিধা-অসুবিধার কথা ফল প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

পদ্ধতি প্রদর্শন নিম্নলিখিত বিষয়ে করা চলে :—

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শোষক গর্ত, ধূমহীন চুল্লী, সাবান তৈরি, বিভিন্ন ধরনের রন্ধন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, সেলাই ও হাতের কাজ, আদর্শ গোশালা তৈরি, বীজ সংরক্ষণ, বীজ শোষণ, কোন যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী, বীজতলা প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

প্রদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা :

১। যে-কোন চাষীই প্রদর্শক (demonstrator) হতে পারে না। তাকে দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন হতে হবে। যিনি সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনের সকল বিষয় ভালভাবে সম্পন্ন করবেন এমন লোককে মনোনীত করতে হবে। নতুন কোন বিষয় পাঁচজনকে দেখানো ও শেখানোর উদ্দেশ্যেই যে প্রদর্শন এ-বোধ যেন প্রদর্শকের থাকে।

২। যেখানে যে সমস্যা নেই, সেখানে সে বিষয়ে প্রদর্শন দেখানোর কোন অর্থ হয় না। কৃষির কোন সমস্যার বাস্তবিকই প্রতিবিধান হতে পারে, এমন

বিষয়েই প্রদর্শনের আয়োজন করা উচিত। প্রদর্শনের স্থান এমন হবে যেখানে বহু লোক সহজেই দেখতে পাবে। যে জমিতে প্রদর্শন হবে, সেখানে সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে দিতে হয়।

৩। দায়সারাভাবে প্রদর্শন করলে কোন ফলই হবে না। প্রদর্শনের পরিকল্পনা আগেই করে ফেলতে হয়। এক সময় একাধিক বিষয়ে প্রদর্শন দেখাতে নেই। কৃষি বিষয়ে রেজাল্ট ডিমনস্ট্রেশন দিতে হ'লে, দুটি সম-পরিমাণ পাশাপাশি প্লট চিহ্নিত করে নিতে হয়। একটিতে প্রচলিত ব্যবস্থায় চাষ করা হবে, অপরটিতে নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা হবে। চাষ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত সকল ব্যাপারেব রেকর্ড রাখতে হবে। উভয় প্লটে যেমন খরচ হবে এবং যা আয় হবে, তার যথাযথ হিসাব থাকবে। প্রদর্শনের ফল আশানুরূপ হ'লে আয়-ব্যয়ের হিসাব সবার মধ্যে প্রচার করা উচিত।

৪। প্রদর্শনের প্রতিটি ধাপ এমন হবে যেন সেটা দর্শকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়। খুব সরল ভাষায় বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হয়। কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের সামনে প্রদর্শন দেওয়া চলে। দর্শকরা যাতে প্রশ্ন করে, সে বিষয়ে উৎসাহিত করতে হয় এবং ধৈর্যের সঙ্গে সকল প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

৫। প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেই সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সম্প্রসারণের পথে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মাত্র। প্রদর্শনের বিষয়টি যাতে লোকে গ্রহণ করে, তার জন্যে লেগে থাকতে হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Conducted Tour):

কোন জায়গায় বেড়াতে যেতে, কোন নতুন জিনিস দেখতে মানুষ স্বভাবতঃই ভালবাসে। মানুষের এই স্বভাবধর্মকে সুপরি-কল্পিতভাবে পরিতৃপ্ত করা লোক-শিক্ষাদানের একটা সুন্দর পদ্ধতি। একদল লোককে নতুন কোন পদ্ধতি, কোন বিশেষ কর্ম-নিপুণতা, নতুন কোন হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি, কোন গবেষণা-কেন্দ্র, শিক্ষায়তন, আদর্শ পল্লী, কোন ভালচাষীর ক্ষেত, কোন ঐতিহাসিক স্থান, কোন কারখানা ইত্যাদি দেখতে নিয়ে যাওয়াকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলা হয়।

কোন বিষয়ে ৫।৭ বার বলে যে কাজ হয় না, বাস্তব অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিষয়টা দেখাতে পারলে সে কাজ সহজেই গৃহীত হয়। একদল চাষীকে এমন কোন ক্ষেতে নিয়ে চলুন যেখানে উন্নত পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে এবং যার ফলে অনেকটা উৎপাদন বেড়েছে। নিজে চোখে দেখে অনেকেই পুরাতন অভ্যাস বদলিয়ে ফেলবে; এর জন্যে তেমন কথা খরচা করতে হবে না। বাস্তব অবস্থাকে চোখের সামনে তুলে ধরার লাভই এই।

ভ্রমণের জন্যেও প্ল্যানিং প্রয়োজন ঃ

(১) কোন্ কোন্ জায়গায় যাওয়া হবে এবং কি কি বিষয় দেখা হবে ঠিক করুন।

(২) কাদের নিয়ে দল তৈরি হবে এবং কে দলপতি হবে স্থির করে নিন।

(৩) ভ্রমণের দিন, সময়, যানবাহন, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিন।

(৪) যেখানে যাবেন, তাদের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে সব স্থির করে নেবেন।

ভ্রমণ চলাকালে খেয়াল রাখবেন—

(১) দলের লোকদের আগ্রহ যেন স্তিমিত হয়ে না আসে।

(২) সকলে যেন ভালভাবে দেখতে শুনতে পায়, প্রশ্ন করার ও আলোচনা করার সুযোগ পায়

(৩) কোন কিছু নোট করে নেবার মত উপযুক্ত সময় যেন সকলে পায়।

(৪) অনেকগুলি প্রোগ্রাম একসঙ্গে জুড়ে ক্লান্তিকর করে তোলা যেন না হয়। আরাম ও আনন্দের দিকে যেন নজর থাকে।

(৫) প্রত্যেকের সুবিধা ও অসুবিধার কথা।

ভ্রমণশেষে এই কাজগুলো অবশ্যই করবেন ঃ

(১) দলের লোকদের সঙ্গে সংযোগ শিথিল করবেন না; যোগাযোগ বজায় রাখবেন।

(২) ভ্রমণের মধ্যে যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন সেটা যেন কাজে রূপ পায় দেখবেন।

(৩) উপকরণ ও সহায়তা পেতে যেন অসুবিধা না ঘটে নজর রাখবেন।

(৪) শতমুখে প্রগতিশীল উৎসাহী কর্মীর প্রশংসা করুন।

(৫) যারা ভাল কর্মী তাদের আর পাঁচজনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এইভাবে ক্রমশ অনেকের মনোভাব বদলানো সম্ভব হবে।

শিক্ষামুলক ভ্রমণের উপকারিতা :

(১) নতুন কাজের দিকে প্রেরণা জাগায় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।

(২) দলের লোকদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও সহযোগিতা বেড়ে ওঠে।

(৩) যোগদানকারীদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়।

(৪) নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে।

(৫) নতুন নতুন স্থান দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

অসুবিধা :

(১) সাধারণত খরচা বহুল।

(২) উপযুক্ত ঋতু অনুযায়ী সময় ঠিক করা অনেক সময় মুস্কিল হয়।

(৩) ভালভাবে পবিচালনা করতে না পারলে আনন্দের বদলে নৈরা দেখা দেয়।

(৪) যানবাহন পাওয়া শক্ত হয়; থাকা-খাওয়ার সুবিধাও অনেক স পাওয়া যায় না।

(৫) ভ্রমণ শিক্ষামূলক না হলে কাজের কিছুই হয় না।

প্রদর্শনী (Exhibitions) :

কোন জিনিসের নমুনা ও মডেল, কোন বিষয়ের পোষ্টার ও চা এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে সাজিে গুছিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরার নাম প্রদর্শনী। সুন্দর গৃহসজ্জা কৌশল, সুপরিকল্পিত পল্লীগঠনের পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের সে ব্যবস্থার চিত্র, ভূমি সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি, নানারকম কুটির-শি জাত দ্রব্য, চোখে ধরার মত শস্য, সব্‌জী ও ফল এবং নানা ধরনে

উন্নত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের সমাবেশ প্রদর্শনীতে করা হয়ে থাকে।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য—দর্শকদের অনেক অজানা বিষয় জানিয়ে দেওয়া ; কোন নতুন জিনিস গ্রহণের দিকে ঝোঁক আনা এবং প্রচলিত মনোভাবকে প্রভাবিত করা। অশিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত লোকদের শিক্ষাদানের এটা একটা সুন্দর পদ্ধতি। ভাল জিনিসের জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখলে উৎপাদন বাড়াবার দিকে আগ্রহ জন্মে।

কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হয়। একই সাথে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমাবেশ করলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য খর্ব হয়ে যায়। শিক্ষাদানই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে একই বিষয়ের গুটিকতক জিনিস নিয়ে উপযুক্ত চার্ট ও পোষ্টার সহযোগে ছোট আকারে প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত। মনে করুন, ফলগাছ লাগানোর সম্বন্ধে কতকগুলো বিশেষ দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। একসাথে বহু ফলগাছ কখনও নেবেন না, দু'টি বা একটি ফল বেছে নিন। ধরুন লেবুর জাত উন্নত করার পদ্ধতি শেখাবেন। প্রদর্শনীতে দেখান—কোন্ ধরনের লেবু নির্বাচন করা উচিত ; তারপর কলম কাটা, মাটিতে কলম লাগানো, সার দেওয়া, ছেঁটে দেওয়া, পোকা লাগলে বা রোগ হ'লে ওষুধ দেওয়া, ফল তোলা, রকম অনুযায়ী ভাগ করে রাখা, সংরক্ষণ পদ্ধতি, ক্যানিং করা এবং বিক্রীর ব্যবস্থা সবগুলি পদ্ধতি একের পর এক সুন্দর ভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে চার্ট ও পোষ্টার দিয়ে প্রত্যেকটি বুঝিয়ে দিন। এতে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে নতুন পদ্ধতির তুলনা করে দেখার সুযোগ পাবে দর্শকরা। এই ধরনের প্রদর্শনী পুরোপুরি শিক্ষামূলক। প্রদর্শনী ছোট বড় দুই-ই হ'তে পারে।

যদি কোন একটা আইডিয়াকে সুন্দর ও সহজভাবে প্রদর্শন করা যায় তবে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সব থেকে বেশি সার্থক হবে।

গ্রামের মেলা ও উৎসবের মধ্যে এ-ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়।

অসুবিধা :—

প্রদর্শনীর উপকারিতার কথা এতক্ষণ বলেছি ; এবার অসুবিধার দিকটাও খেয়াল করুন—

(১) একটা সুন্দর প্রদর্শনীর জন্যে অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন। খরচাও বেশ করতে হয়। তাড়াহুড়ো ক'রে যেমন-তেমন একটা প্রদর্শনী করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এটা খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

(২) সকল বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না।

(৩) একই ধরনের প্রদর্শনী একই জায়গায় দ্বিতীয় বার করা চলে না।

(৪) এমন বিষয় আছে যার সব খুঁটিনাটি দিক প্রদর্শনীতে দেখানো যায় না।

প্রচার অভিযান (Campaign) :

কোন এলাকা জুড়ে নিবিড় ভাবে কোন জিনিস যদি চালু করতে
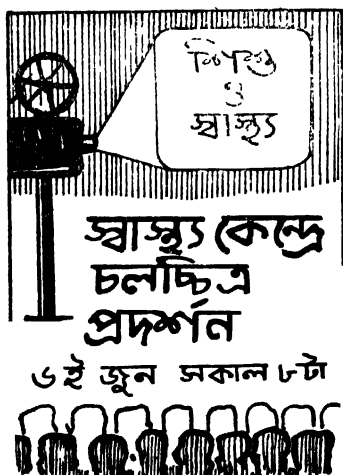
চান তবে আপনাকে প্রচারের আশ্রয় নিতে হবে। রিসার্চ বিভাগ সুপারিশ করেছে এবং ছোট ছোট ক্ষেত্রে পরীক্ষা ক'রে

সুফল পাওয়া গেছে—এমন বিষয়ের বহুল প্রচলনের জন্যে প্রচার অভিযান চালাতে হয়। এই ধরুন, কলেরার ইন্‌জেক্‌সন নেওয়া; এখনও অনেকে নিতে ভয় পায়, প্রচারের দ্বারা ভীতি ও আশংকা অনেকটা দূর করা যায়।

দেশ জুড়ে কোন বিষয়ে প্রচার চালাবার কিছুদিন আগে থেকেই রেডিও এবং সংবাদপত্রে আলোচনা সুরু করা প্রয়োজন; সভা-সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় নেতাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নতুবা বড় বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। যে বিষয়ের প্রচার করা হবে—তার যোগান ও সরবরাহের ব্যবস্থা পাশাপাশি রাখতে হয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা যাতে সহজে পাওয়া যায় তার সুব্যবস্থা করতে হয়। প্রচার বহুলপ্রচলিত একটি পুরাতন পদ্ধতি, কিন্তু প্ল্যানহীন নিছক প্রচার বড় একটা কার্যকরী হয় না।

জনসভা বা (Mass Meeting) জন সম্মেলন ঃ

জনসভায় সাধারণত নানা শ্রেণী, নানা পেশা ও নানা বয়েসের লোক সমবেত হয়ে থাকে। বিভিন্ন বক্তা বা জননেতা তথ্যসহ কোন বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করেন এবং জনতার রায় কি জানতে চান। জনসভা তখনই কোন কাজে নামার ইঙ্গিত দেয় না; ভবিষ্যতে কর্মধারা গ্রহণের আহ্বান জানায়। কোন নতুন বিষয় বা কর্মসূচী গ্রহণের ফলে জনচিত্তে কী প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তা এই-ভাবে বুঝে নেওয়া যায়। বহু লোককে কোন বিষয় জানাবার এটা একটা সাধারণ পদ্ধতি। জনমত গঠন করার কাজে সব দেশেই জনসভার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় নেতা ও মাতব্বরদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জনসভা বা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগেই আপনাকে সব ঠিক করে নিতে হবে।

(১) সভা বা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও প্রোগ্রাম।

(২) ক'জন বক্তা বক্তৃতা দিবেন এবং কে কে বলবেন।

(৩) আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা থাকবে কি না।

(৪) সম্মেলনের উপযুক্ত সময় ও স্থান নির্বাচন।

(৫) আশেপাশে প্রচারের ব্যবস্থা।

(৬) সভাপতি কাকে করা হবে, অভ্যর্থনার ভার কাদের ওপরে থাকবে সমস্ত স্থির করা।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় এমনভাবে কর্মসূচী তৈরী করুন। পরস্পর আলাপ-আলোচনা এবং প্রশ্ন করা ও জবাব দেওয়ার জন্যে কিছু সময় রাখুন। কোন জনসভা বা সম্মেলন করতে হ'লে প্ল্যানিং ও প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের কাজের সপ্রশংস স্বীকৃতি সকলের সামনে দিন। কোন সভা বা সম্মেলনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে নিন ঃ—

(১) সূচনাতেই—সভার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলুন এবং যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের পরিচয় করিয়ে দিন।

(২) তারপর বক্তাদের বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা রাখুন।

(৩) শেষে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সভা বা সম্মেলনের উপকারিতা ঃ

(১) অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে বহু লোকের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া যায়। কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে জনসভা খুব উপযোগী।

(২) পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণের এটা উদ্যোগ-পর্ব।

(৩) জনচিত্তে কী প্রতিক্রিয়া হ'ল সঙ্গে সঙ্গে ও সহজে বোঝা যায়।

(৪) ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের যোগসূত্র জনসভা।

(৫) নানারকম বিষয় নিয়ে জনসভায় আলোচনা করা চলে।

(৬) অল্প ব্যয়ে কোন বিষয় বহুলোককে জানিয়ে দেওয়া যায়।

কতকগুলি অসুবিধা ঃ

(১) সভা বা সম্মেলনের উপযোগী স্থানের বিহিত ব্যবস্থা করা অনেক

(২) সামান্য দু'চারটি প্রশ্ন ও উত্তর ছাড়া আলাপ-আলোচনার সুযোগ খুবই কম পাওয়া যায়।

(৩) নানাধরনের লোকের সমাবেশ জনসভায় হওয়ার ফলে হট্টগোলটা বেশি হয়।

(৪) গ্রাম্য দলাদলির ফলে একদল যোগ দিলে আর একদল যোগ দিতে চায় না।

নাটক, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য

ভজন, কীর্তন, কথকতা, রামলীলা, কবি, ভর্জা, কাওয়ালী, যাত্রা, ছায়ানাটক, লোকনৃত্য ভারতের পল্লীজীবনকে যুগ যুগ ধরে সরস রেখেছে। কোন নতুন আইডিয়া জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার চিরন্তনী ভারতীয় বাহক এইগুলি। রামায়ণ মহাভারত ও পুরানের কাহিনী, বেদ, উপনিষদ ও কোরাণের বাণী, বুদ্ধ, মহাবীর,

শঙ্করাচার্য, চৈতন্যের উপদেশ এই পথ ধরে ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গেছে।

"বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নাথ ধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্বের গান, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি বাংলার

লোকসঙ্গীত।" সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লোকগীতি নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। গর্ভাবাস হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থাই লোকগীতির মধ্যে রূপ পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর, তুষু, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, পালটিয়া, পূর্ববঙ্গের জারি, ঘটু ইত্যাদি লোকগীতির কথা আমরা সকলেই জানি।

সুবিধা ঃ

(১) রসোপলব্ধির জন্যে এসে নরনারী অনেক দরকারী তথ্য ও সংবাদ মাথায় নিয়ে ফিরে যায়।

(২) লোকসঙ্গীত স্বাধীন ও পরিবর্তনশীল। মৌখিক প্রচারই লোকগীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই পন্থা খুবই উপযোগী।

(৩) স্থানীয় গুণীদের সাহায্য নিলে স্বল্প খরচেই ব্যবস্থা করা যায়।

অসুবিধা ঃ

(১) শিক্ষামূলক কোন প্রোগ্রামের জন্য যথেষ্ট প্ল্যানিং ও প্রস্তুতির প্রয়োজন।

(২) গ্রামে গুণীলোক সব সময় মিলে না।

(৩) আশেপাশের গুণীদের একসঙ্গে করাও অনেক সময় বেশ মুস্কিল হয়।

দশম অধ্যায়

শিক্ষাদানের উপকরণ

উপকরণ শিক্ষাদানের বড় সহায়ক ঃ

কোন গ্রামে এক বা একাধিক পরিবারে গিয়ে উন্নত-জাতের মুরগী-পালনের সুবিধা কি আপনি বুঝিয়ে বলবেন স্থির করেছেন। খালি হাতে গিয়ে নানারকম উপকারিতার কথা মুখে বলুন। আবার দেশী ও উন্নত-জাতের দুটি মুরগী সঙ্গে নিয়ে যান, সবাইকে দেখিয়ে তুলনা-মূলকভাবে আপনার বক্তব্য বলুন। শ্রোতাদের আগ্রহের মধ্যে
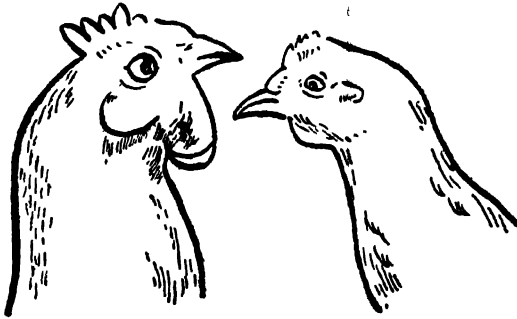
অনেকখানি তফাৎ দেখতে পাবেন। জীবন্ত মুরগী হয়তো আপনার পক্ষে অনেক সময় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। উভয়জাতের মুরগীর কতকগুলো ফটো সংগ্রহ ক'রে নিন। তাও যদি না পান, মুরগীর বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ছবিযুক্ত এমন একখানি বই অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যান। জীবন্ত মুরগী দেখালে যেমন সাড়া পেতেন তা পাবেন না ঠিকই, কিন্তু শুধু মুখে কথা বলার চেয়ে নিশ্চয় বেশি সাড়া পাবেন।

মনে করুন, আপনার এলাকার একদল চাষীকে জাপানী চাষ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। জনকতক লোক জমায়েত ক'রে আপনার বক্তব্য শুধু মুখে বলুন, শ্রোতাদের

মধ্যে একরকম সাড়া পাবেন। ফিল্ম বা স্লাইডের সাহায্যে জমি চাষ-পদ্ধতি, বীজতলা তৈরি, সার দেওয়ার কৌশল, ধান রোয়ার ধরন, ফসল-কাটা ও মাড়াই-এর পদ্ধতি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিন, শ্রোতাদের মধ্যে আর একরকম সাড়া পাবেন। বড় সাইজের ফটো, ফ্লাশ কার্ড বা ফ্লানেল গ্রাফের সাহায্যে বক্তব্য সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিন, দেখবেন শুধু মুখের কথার চেয়ে শ্রোতাদের মধ্যে বেশি আগ্রহ জাগবে।

একই সময়ে কোন বিষয় যখন বহু লোককে জানানো প্রয়োজন, তাদের সচেতন ক'রে তোলা দরকার ব'লে মনে হবে তখন চোখে ধরার মতো পোষ্টার প্রধান প্রধান জায়গায় সেঁটে দিন; উপযুক্ত একজিবিটস্ বা মডেল বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখুন। চলতে ফিরতে লোকজন এগুলো দেখবে। নীরবে বার্তা-প্রেরণের চমৎকার পদ্ধতি এটা।

জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান-পদ্ধতির গুরুত্ব খুবই বেশি সন্দেহ নেই। উপকরণের প্রয়োজনীয়তাও কিন্তু কম নয়। গ্রুপ সংযোগ ও জনসংযোগই বলুন, আর ব্যক্তিগত সংযোগই বলুন, সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারে নিঃসন্দেহে অধিক সুফল পাওয়া যায়। অবশ্য দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার মতো নানারকম উপকরণ ব্যবহার করলেই যে আপনি ভাল শিক্ষা দিতে পারবেন অথবা ভাল শিক্ষক হবেন তার কোন মানে নেই। সম্প্রসারণ-কর্মী হিসাবে আপনাকে জানতে হবে মানব-প্রকৃতি। ব্যষ্টি-মানস ও সমষ্টি-মানস উভয় বিষয়েই কিছু জ্ঞান থাকা চাই। জানতে হবে, মানুষ কী-ভাবে শেখে, কেমন ক'রে নতুন কোন বিষয় গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে হবে তাদের জীবন-সমস্যার কথা, সমস্যা সমাধানের পথের কথা। আমাদের সমস্যার দিকে এবং সমাধানের দিকে জন-মানসকে সচেতন ও সক্রিয় ক'রে তোলার সহায়ক এই উপকরণ।

নানাধরনের উপকরণ :

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা নিয়ত মস্তিষ্কে জ্ঞান আহরণ করছি। মস্তিষ্কের সাহায্যে মনন করছি ও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক্। এদেরই সাহায্যে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। তবে চোখ ও কানের সহায়তা নিতে হয় সব থেকে বেশি। তাই জ্ঞান বিস্তারের কাজে
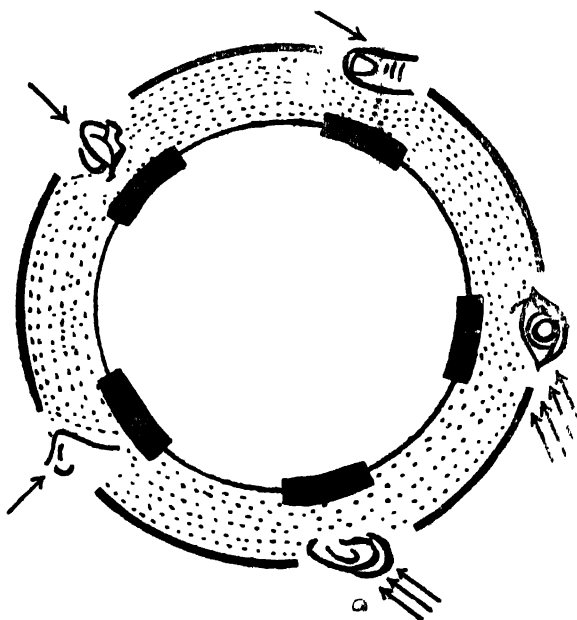
চোখে দেখানো ও কানে শোনানোর মতো উপকরণই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সহায়ক উপকরণের নাম—শ্রুতি চাক্ষুষ সহায়িকা (Audio-Visual Aids)। Audition শব্দের অর্থ শ্রবণ, Vision শব্দের অর্থ দর্শন বা দেখা, আর Aids শব্দের অর্থ সহায়ক বস্তু।

প্রচলিত উপকরণগুলোকে সাজিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরছি।

কানে শোনা উপকরণ
মস্তিষ্ক
চোখে দেখা উপকরণ
মুখেবক্তৃতা
রেডিও
রেকর্ড
টেপ রেকর্ড
গ্রামোফোন
মাইকের সাহায্যে মন্তব্য বা ঘোষণা
(পর্দায় ফেলা)
ছায়াছবি
ছায়াছবি, চিত্রাংশ (film strips) স্লাইড (slide) ওপেক্ প্রোজেক্টর (opaque Project)
(পর্দায় নাফেলা)
ব্ল্যাকবোর্ড
ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ ও গ্লোব, ছবি ও ফটো, পোস্টার, চার্ট ও গ্রাফ, বুলেটিন বোর্ড, ফ্ল্যাশ কার্ড, ফ্ল্যানেল গ্রাফ, ডিমনস্ট্রেশন বা প্রদর্শন, নাটক—পুতুল নাচ, প্রতিকৃতি, নমুনা একজিবিটস্ (Model specimen exhibits)

এই সব উপকরণ কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারে কি সুবিধা পাওয়া যায় এবার সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ব্ল্যাকবোর্ড বা চক্‌বোর্ড ঃ

চোখের সামনে অক্ষর ও বাক্য অথবা সহজ ছবি ও ডায়গ্রাম তুলে ধরার জন্যে ব্ল্যাকবোর্ডের প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্র। স্কুল-কলেজের কথা ব্ল্যাকবোর্ড বাদ দিয়ে আমরা ভাবতে পারি না।

বক্তা সব সময় চান শ্রোতারা যেন তাঁর কথা ভালভাবে বুঝতে পারে। বক্তব্যকে শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য করাই বক্তার উদ্দেশ্য। ব্ল্যাকবোর্ড এই কাজে একটি অত্যন্ত সহজ সহায়ক। কোন ছোট সভা বা ঘরোয়া আলোচনায় ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার যত করা যায় ততই উত্তম।

সচরাচর দু'রকম ব্ল্যাকবোর্ড আমরা দেখতে পাই—প্লাই উড বা অন্য কাঠ এবং ম্যাসোনাইটের তৈরি। তাছাড়া, মোটা কাপড় বা ক্যানভাসের তৈরি জড়ানো ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ব্ল্যাকবোর্ড পেণ্ট দুটোতেই লাগাতে হয়।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন ঃ—

(১) আলোচনার শেষে বোর্ডটি আগাগোড়া মুছে দেবেন।

(২) অক্ষরগুলি বড় বড় ক'রে লিখবেন।

(৩) ঠিক লিখবার সময় বা কোন ড্রইং আঁকবার সময় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলবেন না।

(৪) কোন পয়েণ্ট বা শব্দের ওপরে গুরুত্ব দেবার জন্যে রঙিন চক্‌ ব্যবহার করুন। রাতে হল্‌দে চক্‌ ব্যবহার করবেন।

(৫) ব্ল্যাকবোর্ডের সামনা-সামনি দাঁড়াতে নেই ; পাশে দাঁড়াতে হয়।

(৬) কোন শব্দ বা বাক্যের আংশিক লিখবেন না, সবটাই লিখবেন।

(৭) ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে রেখাচিত্রের মতো সোজা ড্রইং সব সময় আঁকবেন।

নৈশ বিদ্যালয়ে, পঞ্চায়েত বা সমবায় সমিতির সভায় ব্ল্যাক-

বোর্ডকে কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে পারা যায়। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরটা একখণ্ড সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে ফিল্ম স্ট্রিপস্‌ দেখানো যায়। একফালি ফ্লানেল বা খদ্দর ওপরে ফেলে দিলে ফ্লানেল বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

বুলেটিন বোর্ড বা ডিস্‌প্লে বোর্ড (Bulletin Board or Display Board) :

গ্রামের কাজে ও কোন আইডিয়া বিস্তারের ব্যাপারে বুলেটিন বোর্ড খুবই উপযোগী। যেখানে বেশি লোক সমাগম হয় এমন
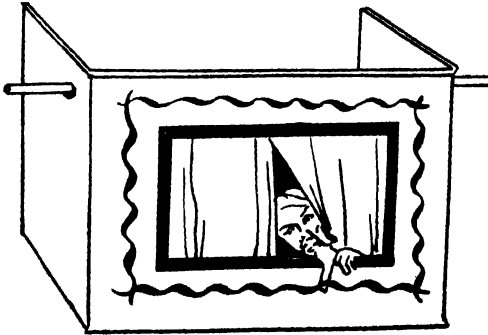
জায়গায় বোর্ডটি টাঙাবেন। অনেক কাজে বোর্ডটি ব্যবহার করতে পারবেন :

(ক) মিটিং, যাত্রা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি স্থানীয় খবরের ঘোষণা করতে পারবেন।

(খ) যে কাজে হাত দিয়েছেন তার অগ্রগতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করতে পারেন।

(গ) যে বিষয়ে ডিমনস্‌ট্রেশন দিয়েছেন সেবিষয়ে উল্লেখযোগ পয়েন্টগুলো সকলের অবগতির জন্যে জানিয়ে দিতে পারেন॥

(ঘ) কোন নোটিশ, ড্রইং, পোস্টার বা কার্টুন, একসেট ফটো সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের অংশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে পারেন।

যদি একঘেয়ে মামুলি খবর না দিয়ে সময় উপযোগী সংবাদ বুদ্ধি ক'রে প্রচার করেন, বহুলোকের দৃষ্টি ক্রমশঃ বোর্ডের দিকে আকৃষ্ট হবে।

নরম কাঠ, প্লাই উড, ম্যাসোনাইট অথবা স্থানীয় সাধারণ কাঠ দিয়ে বোর্ড তৈরি করা যেতে পারে। লম্বায় চওড়ায় অন্তত ৪´×৩´ ফুট করাই উচিত। কোন একটা চালার নীচে দেওয়ালের গায়ে বোর্ড টাঙাতে হয়; নতুবা ঝড়জলে খুব অসুবিধা হবে।
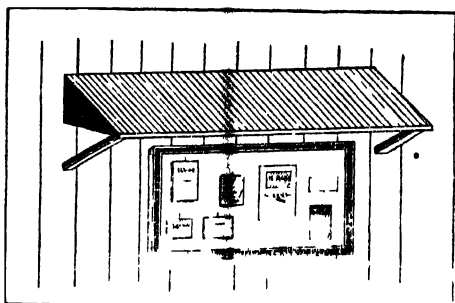
গ্রামে বুলেটিন বোর্ড টাঙাবার সময় কয়েকটি কথা স্মরণ রাখবেন ঃ—

১। বোর্ডে যা লাগাবেন বা লিখবেন তা যেন আর্কষণীয় হয় এবং সোজা ভাষায় যেন লেখা হয়।

২। নানা বিষয় একসাথে জুড়ে বোর্ডটাকে জগা-খিচুড়ি করে ফেলবেন না। যে-কোন একটি বা দু'টি বিষয়ের বেশি একসাথে বোর্ডে লিখতে নেই।

৩। অল্পদিন পর পর বিষয়বস্তু পরিবর্তন ক'রে দিবেন।

৪। উজ্জ্বল বর্ণের রং দিয়ে আঁকবেন বা লিখবেন।

বুলেটিন বোর্ডের একাংশ ব্ল্যাকবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এখানে বয়স্ক শিক্ষার আসর বসান যায়। বোর্ডের গায়ে কাপড় টাঙিয়ে স্লাইড বা ফিল্ম স্ট্রিপস্‌ দেখানো চলে।

ফ্লানেল-গ্রাফ (Flannel Graph):

ক্লাস লেক্‌চার বা ঘরোয়া বৈঠকে ব্ল্যাকবোর্ডের মতো আর একটি খুব কার্যকরী সহায়ক উপকরণ হ'ল ফ্লানেল-গ্রাফ। কোন ছবি, ফটো,
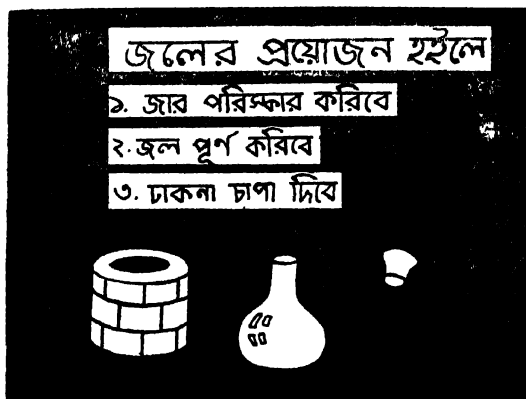
ড্রইং অথবা কোন শব্দ বা পদের পিছনে সিরিষ কাগজের টুকরো ফ্লানেল বা খদ্দরের ছোট ফালি লাগিয়ে ফ্লানেল বোর্ডের গায়ে একের পর এক লাগানো হয়। সুচিন্তিত প্লট নিয়ে ফ্লানেল-গ্রাফের এক একটি সেট তৈরি করা হয়। বোর্ডের গায়ে কতকগুলি কাগজের ফালি ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়ে গেলে, কোন একটা বিষয় বা ঘটনার চিত্র ফুটে ওঠে। ফ্লানেল-গ্রাফের সাহায্যে তুলনামূলক আলোচনাও সুন্দরভাবে করা যায়। প্রতিটি টুকরো কাগজের পিছনে নম্বর দিয়ে রাখতে হয়।

অনেকটা অভিনয়ের মতই দর্শকদের সামনে যেন একের পর এক পর্দা উঠতে থাকে। সব সময়ই মনে হয়, এর পর কী। বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও শ্রোতাদের মনে ভালোভাবে গেঁথে দেবার জন্যে ফ্লানেল-গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। ফ্লানেল-গ্রাফ তৈরি করার সময় বক্তাকে চিন্তা করতে হয়, কল্পনা করতে হয় এবং অবান্তর কথা বর্জন ক'রে নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে নিতে হয়। ফ্লানেল-গ্রাফ ব্যবহারের

সুবিধা এই যে, বক্তা আলোচ্য বিষয়ের পয়েন্ট ছাড়া অন্য কথায় যেতে পারেন না। ফ্লানেল-গ্রাফের সাহায্যে কঠিন বিষয়কে সহজ ক'রে প্রকাশ করা যায় এবং চোখ ও কানকে একই সংগে প্রভাবিত করা যায়।

কয়েকটি অসুবিধা ঃ

১। লেকচার দীর্ঘ হ'লে একঘেয়ে লাগতে পারে।

২। বৈজ্ঞানিক বিষয় খুব ভালভাবে সাজিয়ে না বলতে পারলে ফ্লানেল-গ্রাফ বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না।

৩। ফ্লানেল-গ্রাফের তুলনায় মডেল ও নমুনা অনেক বেশি কার্যকরী।
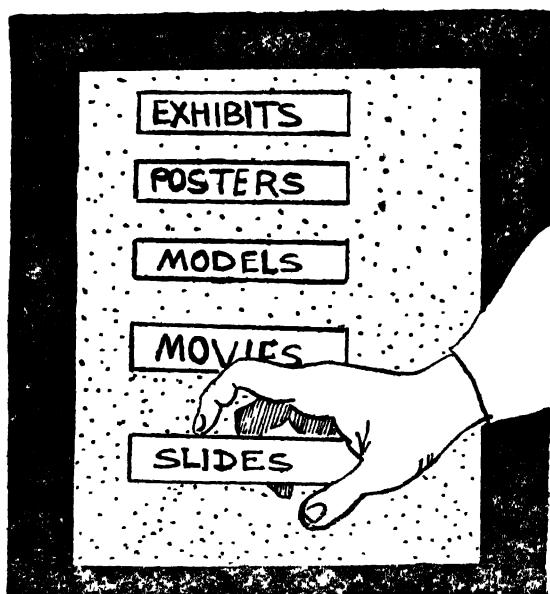
ফ্লানেল-গ্রাফ তৈরির উপকরণ ঃ

১। ফ্লানেল, খদ্দরের চাদর বা মোটা খস্‌খসে কাপড়।

২। সিরিষ কাগজ (Sand Paper)।

৩। আঠা ও রবার সিমেণ্ট।
৪। প্লাই উড্‌ বা পিচবোর্ড
৫। বোর্ডের উপর কাগজ আট্‌কানো পিন।
৬। কাঁচি, ছবি, নক্‌শা, লেখা অক্ষর ইত্যাদি যা দেখানো হবে।

ফ্ল্যাশ কার্ড (Flash Card) :

ফ্ল্যাশ কার্ড একই সাইজের কয়েকখানা কার্ডের একটা সিরিজ। একের পর একটি কার্ড দর্শকের সামনে তুলে ধরে একটা কাহিনী ব্যক্ত করা হয়। কোন বিষয় আকর্ষণীয় ক'রে আলোচনা করার জন্য ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহৃত হয়। দর্শকের দেখতে যেন কোন অসুবিধা না ঘটে এমন সাইজের কার্ড তৈরি করতে হয়। ১০" × ১২" থেকে ২২" × ২৪" পর্যন্ত কার্ড হ'লেই চলিতে পারে। প্রতি কার্ডে ছবি বা ডায়গ্রাম আঁকা থাকে—মুখে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে বলা হয়।

বসন্ত, কলেরা, হুক্‌ওয়ার্ম ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ফ্ল্যাশ কার্ড তৈরি করা যায়। জনত্রিশের বেশি বড় গ্রুপে ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করা ঠিক নয়। সবসময় সহজ ড্রইং, কার্টুন বা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা উচিত। কার্ডগুলি তৈরি স্থানীয় অবস্থার উপযোগী ক'রে করতে হয়। বিভিন্ন রকম রং দিয়ে করলে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ফ্ল্যাশ কার্ড ও ফিল্ম স্ট্রিপের ব্যবহার অনেকটা একই রকমের—ফ্ল্যাশ কার্ড সামনা-সামনি দেখানো হয়। আর ফিল্ম স্ট্রিপ পর্দায় ফেলা হয়। ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করার সময় :

(i) নিজের জানা কাহিনীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।
(ii) স্থানীয় ভাষা ও বুলি যতটা সম্ভব ব্যবহার করবেন।
(iii) পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীর নাম মাঝে মাঝে ব্যবহার করবেন।
(iv) কার্ডগুলি এমনভাবে ধরবেন যেন সকলে দেখতে পায়, ঠিক বুক বরাবর কার্ডগুলি তুলে ধরবেন।
(v) কার্ডগুলি পরপর সাজিয়ে রাখবেন। একটি ব্যাখ্যা করার

পর সেটি সবার পিছনে দিয়ে দিন; দ্বিতীয়টি স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসবে।

শিশুর পরিপুষ্টি
ও
ক্রমশঃ দৈহিক উন্নতি

CHILD GROWTH AND DEVELOPMENT

দু' মাসের শিশু:
তার মাকে চিনতে পারলেও
সম্পূর্ণ অসহায়

তিন মাসের শিশু:
কোন শব্দ শোনা মাত্র
সেই দিকে তাকায় ও
মাথা ঘুরিয়ে দেখে।
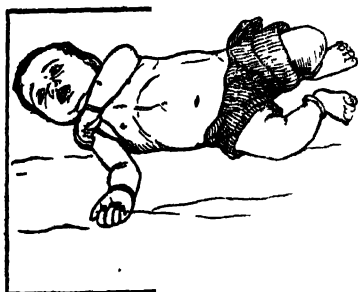
ফ্ল্যাশ কার্ড তৈরি করার সময় দু'টো বিষয় খেয়াল রাখবেন—প্ল্যানিং ও ড্রইং। উদ্দেশ্য অনুযায়ী আপনাকে কাহিনী তৈরি করতে হবে। খানকয়েক কার্ডের মধ্যে আপনার বক্তব্য বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুরু ও শেষটা সব সময় চিত্তাকর্ষক করবেন।

কাহিনী লেখার পরে তাকে কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করুন। তারপর আঁকার পালা। প্রত্যেক ভাবের জন্যে একখানা ক'রে ছবি হবে। দুভাবে আঁকার কাজ করতে পারেন—ছবি এঁকে ও ফটো তুলে অথবা সহজ রেখা চিত্রের সাহায্যে। প্রথমটায় আর্টিস্টের সাহায্য প্রয়োজন, আর দ্বিতীয়টি একটু চেষ্টা করলে নিজেই আঁকতে পারবেন। প্রতি সেটের এক-একটা নামকরণ করতে হয়; যেমন—"গর্ত্ত পায়খানা," "ধূমহীন চুল্লী" "শিশুর দেহগঠন" ইত্যাদি। প্রতি কার্ডের পিছনে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য বিষয় লিখে রাখবেন।

ফটোগ্রাফ (Photograph) :

কর্মরত অবস্থায় নিজের ফটো দেখতে আমরা সকলেই ভালবাসি। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই ছবির প্রতি আকর্ষণ প্রবল। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোন আইডিয়া বিস্তার করার পক্ষে ফটোগ্রাফ বেশ উপযোগী। আলোচ্য বিষয়ের পাশে পাশে ফটো দিলে বিষয়টি খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে ক্যামেরা থাকা একান্ত দরকার।

স্কুল, কলেজ বা গ্রামের বুলেটিন বোর্ডে ফটো ভাল ক'রে সাজিয়ে রাখতে পারলে খুব চিত্তাকর্ষক হয়। চাষবাসের উন্নত-পদ্ধতি, বিভিন্ন কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার-প্রণালী, মুরগী পালন-পদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরির কৌশল, শিশুপালনের জ্ঞাতব্য বিষয় ইত্যাদি বহু বিষয়ের ফটো প্রদর্শন করতে পারেন।

ফটো জীবন্ত না হলে আকর্ষণীয় হয় না। আনন্দ, বিস্ময় ও বিমর্ষতার ফটো তুলে রাখতে হয়। কর্মরত অবস্থার ফটো সকলেই পছন্দ করে।

সুবিধা—

(১) ঠিক যতটা প্রয়োজন ফটো ততটা তোলা যায়।
(২) অজ্ঞাতসারে চিত্তকে কর্মপ্রবণ ক'রে তোলে।
(৩) অল্পদিনে নষ্ট হয় না, অনেকদিন রাখা যায়।

(৪) কোন ঘরোয়া বৈঠক, জনসভা এবং কোন সমস্যা নিয়ে জনকতক ব্যক্তির গভীর চিন্তা ও অক্লান্ত চেষ্টা ফটোতে ধ'রে রাখা যায়।

সতর্কতা—

১। পরিষ্কার ছবির কদর সব সময় বেশি। জরদ্গব ছবি তুলতে নেই।

২। অরুচিকর ছবি মানব-চিত্তে বিরক্তি আনে।

৩। ফটো খুব ছোট হ'লে ভাল লাগে না।

৪। অনেকগুলি ফটো সাজিয়ে না দিলে চিত্তাকর্ষক হয় না।

৫। সকলে সুন্দর ছবি তুলতে পারে না, নিয়মিত চেষ্টা করতে হয়।

৬। ফটোগ্রাফী বেশ ব্যয়বহুল।

পোস্টার (Poster):

কোন খবর প্রচার ও কোন বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তোলার জন্যে পোস্টার ব্যবহৃত হয়। পোস্টারের সাহায্যে একই সঙ্গে বহু জায়গায় বহুলোকের কাছে খবর পাঠানো যায়। লোককে সচেতন ক'রে তোলা এবং অজানা বিষয় জানিয়ে দেবার জন্যে জগৎ জুড়ে পোস্টারের সহায়তা নেওয়া হয়।
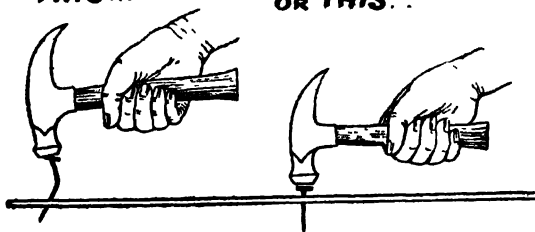
পোস্টার

নানারকম উদ্দেশ্যে পোস্টার ব্যবহৃত হচ্ছে:

১। নতুন কোন আইডিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ক'রে তোলা।

২। কোন জনসভা বা ছায়াছবির দিন ও তারিখ ঘোষণা।

৩। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ।

পোস্টার তৈরি করার সময় এই ক'টি কথা মনে রাখবেন :

(১) কাদের লক্ষ্য ক'রে তৈরি করছেন ?

(২) পোস্টারের সাহায্যে আপনি কী বলতে চান ?

(৩) বিষয় নির্বাচনের সংগে সংগে জুতসই শব্দ চয়ন করুন।

(৪) সবকিছু সরঞ্জাম ও উপকরণ হাতের কাছে রাখবেন।

(৫) নানারকম স্কেচ আগে এঁকে নিন ; তারপর যেটি খুব পছন্দসই হবে সেইটি বেছে নিন।

পোস্টারের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(১) পোস্টারে খুব অল্প কথা থাকবে।

(২) পোস্টার সব সময় সহজবোধ্য হবে।

(৩) একটিমাত্র আইডিয়াই পোস্টার ব্যক্ত করবে।

(৪)' এমনভাবে রং নির্বাচন করতে হবে, যেন সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৫) স্কেচ খুব সুচিন্তিত হওয়া দরকার।

(৬) পোস্টার সব সময়ই যেন সময় উপযোগী হয়।

যেখানে বহুলোকের সমাগম হয় এমন ফাঁকা স্থানে পোস্টার লাগাতে হয়। চিন্তা-ভাবনা না ক'রে হামেশা পোস্টার লাগিয়ে গেলে লোকের মনে বিকর্ষণ সৃষ্টি করে। অক্ষর-জ্ঞানহীন লোকেদের মধ্যে পোস্টার তেমন কার্যকরী হয় না।

চার্ট ও গ্রাফ (Charts and Graphs) :

কোন পরিবর্তনেব ধারা দেখাবার জন্যে চার্ট ও গ্রাফের আশ্রয় নিতে হয়। তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনকে সবার সামনে তুলে ধরার পক্ষে চার্ট ও গ্রাফ খুবই উপযোগী। কঠিন ও নীরস বিষয়কে এইগুলি অনেকটা সহজবোধ্য করে। আপনার এলাকায় কয়েক বছরে বা কয়েক মাসে কতটা উন্নতি হয়েছে অথবা অবনতি ঘটেছে, যদি সবার সম্মুখে তুলে ধরতে চান, তবে চার্ট ও গ্রাফের সহায়তা নিতেই হবে। সম্প্রসারণ-কর্মীর এগুলি অতি-প্রয়োজনীয় উপকরণ।

চার্ট নানা ধরনের হ'তে পারে :

১। **বার চার্ট (Bar Chart) :** একটা স্কেলের ওপরে কতকগুলি ছোট-বড় ব্লক তুলনামূলকভাবে দাঁড় করানো হয়।
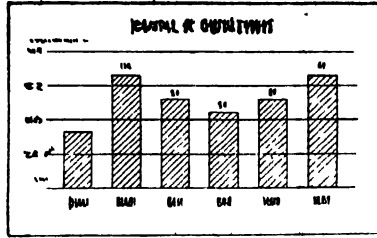
বার চার্ট

২। **সংগঠন চার্ট (Organisation Chart) :** ওপর থেকে
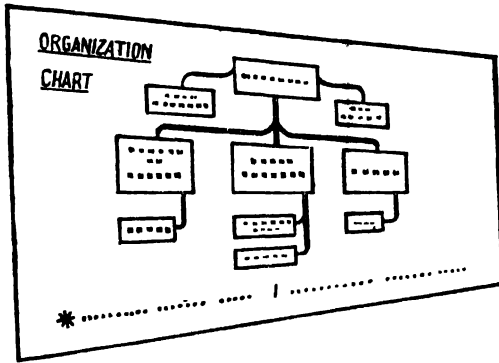
তলা পর্যন্ত কোন সংগঠনের কাঠামো স্পষ্ট ক'রে বোঝানোর জন্যে এই ধরনের চার্ট তৈরি করা হয়।
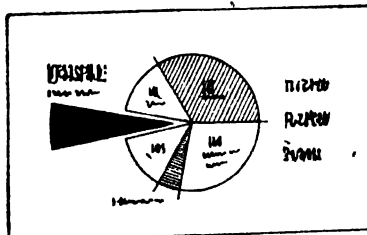
পাই চার্ট

৩। **পাই চার্ট (Pie Chart) ঃ** একটা গোটা জিনিসের বিভিন্ন অংশের পরিমাণ কতটুকু, সেটা পাই চার্টে দেখানো হয়। বছরের বাজেটে কোন্ কোন্ খাতে কতটা আয়ের সম্ভাবনা আছে এবং কোন্ কোন্ খাতে কতটা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তা পাই চার্টে সুন্দরভাবে দেখানো যায়, প্রতিটি অংশ বিভিন্ন রং দিয়ে চিত্রিত করতে হয়।

৪। **লাইন চার্ট (Line Chart) ঃ** বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির ধারা, তার কম-বেশি দেখানোর জন্যে লাইন চার্ট ব্যবহার করা হয়।
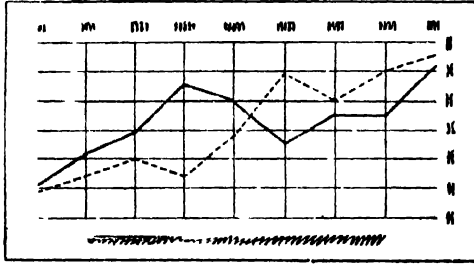
লাইন চার্ট

৫। **ফ্লো-চার্ট (Flow Chart) ঃ** পর পর কি পদ্ধতিতে একটা কাজ-সম্পাদন করতে হয় তা ফ্লো-চার্টে এঁকে দেখানো হয়।
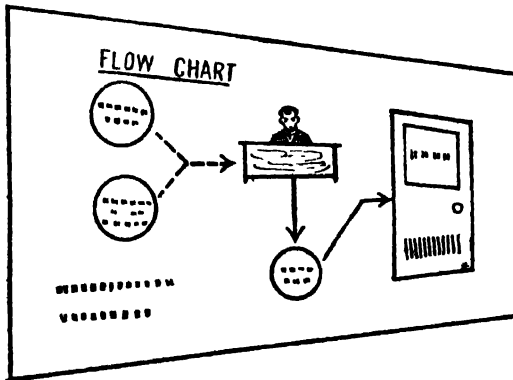
লিফলেট, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার (Leaflet, Pamphlets, Folders):

লিফলেট	প্যাম্ফলেট	ফোল্ডার
ছোট্ট একখণ্ড ছাপানো কাগজ। কোন বিষয়ে স্পষ্ট ও সোজা কথায় সংবাদ জানানো হয়।	কয়েক পৃষ্ঠা যুক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এক বা একাধিক তথ্য সহজ ভাষায় ছাপিয়ে প্রচার করা হয়।	দুই বা তিন ভাঁজ-করা ছাপানো কাগজ। একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

ছবি-গ্রাফ (Pictorial Graph): কোন বছরে বা বিশেষ কোন সময়ে কৃষি বা শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে কতটা অগ্রসর হওয়া গেছে, দেখবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছবির ও মূর্তির আশ্রয় নিয়ে দর্শকদের সামনে বিষয়টি পরিস্ফুট ক'রে তুলে ধরা হয়। আবার একই বিষয়ে পর পর কয়েকটি বছর ধরে অগ্রগতির ধারা কিরূপ চলছে, তা দেখাবার জন্য ছবি দিয়ে গ্রাফ এঁকে দেখানো যায়।
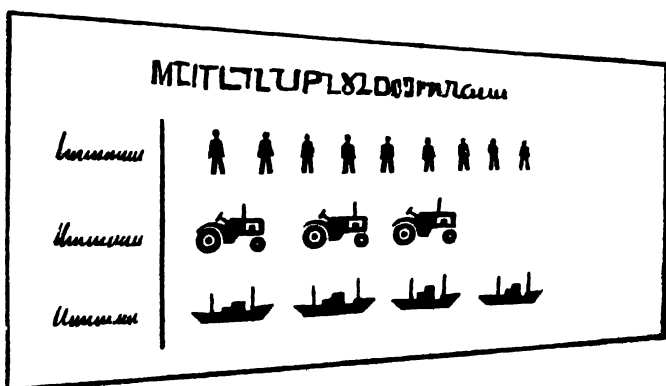
ছবি-গ্রাফ

চিহ্ন বা প্রতীক-গ্রাফ (Symbolic Graph): এই গ্রাফ ছবি-গ্রাফেরই প্রায় অনুরূপ। একই শস্য অথবা শিল্পজাত বা খনিজ কোন দ্রব্যের উৎপাদন দেশের বিভিন্ন অংশে কোন একটি বছরে

কেমন হয়েছে দেখাবার জন্য চিহ্ন বা প্রতীক-গ্রাফের সাহায্য নেওয়া হয়।
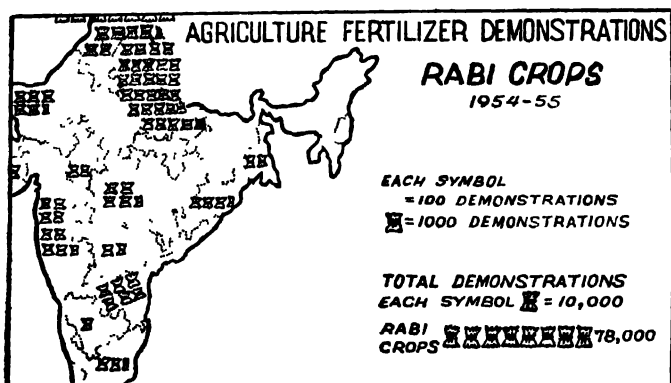
চিহ্ন বা প্রতীক গ্রাফ

কোন্ সময়ে কোন্ শস্য ও সব্জি লাগানো উচিত; সার মেশাবার আগে মাটি পরীক্ষা ক'রে দেখে নেওয়া প্রয়োজন কেন; রোগ ও কীটের হাত থেকে ফসল বাঁচাবার জন্যে কোন্ কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য কতটা ফলপ্রসূ হবে—এই ধরনের সংবাদ পল্লীবাসীকে জানাবার জন্যে লিফলেট, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার ব্যবহার করতে হয়। কোনও

মূল বইএর সার কথা এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সভা, মেলা ও প্রদর্শনীতে এগুলি বিতরণ করা হয়ে থাকে।

লিফলেট, প্যাম্ফলেট, ফোল্ডার যদি ছাপাতে চান—এই কয়টি কথা মনে রাখবেন :

(১) একই সময় একটা আইডিয়ার বেশি দেবেন না।

(২) খুব প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় আলোচনা করবেন না।

(৩) খুব সোজা ভাষায় আপনার বক্তব্য বলবেন।

(৪) উদাহরণ এবং দু'একটা ছবি দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করবেন।

(৫) যা করতে বলবেন তা স্পষ্ট ভাষায় বলবেন।

অসুবিধা :

অশিক্ষিতদের মধ্যে এগুলি তেমন কার্যকরী হয় না। সুচিন্তার সঙ্গে লেখা না হ'লে মনের উপরে অল্পই প্রভাব বিস্তার করে।

পরিপত্র বা সার্কুলার লেটার (Circular Letter) :

কৃষকদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখার একটি সুন্দর বাহক—সার্কুলার লেটার। কোন জরুরী বা দরকারী বিষয়ে অবহিত করার জন্যে একই রকম চিঠি অনেকের কাছে পাঠানো হয়। এই চিঠি খুব ছোট হবে, স্পষ্ট ভাষায় লেখা থাকবে এবং সহানুভূতি-সূচক হবে।

এখানে একটি সার্কুলার লেটারের নমুনা দেওয়া হলো।

শ্রী..

ঠিকানা..

পাট চাষীরা হুঁসিয়ার

ভাই,

পাটের ক্ষেতে ঘোড়া ও বিছাপোকা দেখা দিয়েছে। এই পোকারা পাটের ভীষণ ক্ষতি করে। যাদের জমিতে এই পোকা লেগেছে তারা এখনি একটিন জলে আধপোয়া জলে-গোলা

গ্যামাক্সিন বা ডি. ডি. টি. অথবা আধছটাক এনড্রেক্স মিশিয়ে মেসিন দিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিন। এতে ক'রে পোকা আর লাগবে না বা ক্ষতি খুব কম হবে। বিঘায় প্রায় ৫ টিন জল লাগবে।

ঔষধ ও মেসিনের জন্য নিকটবর্তী গ্রামসেবক, বার্মাশেলের পেট্রোলের দোকানে বা ব্লক অফিসে খোঁজ করুন। বিঘায় ওষুধের খরচ এক টাকা চার আনা পড়ে। (আনুমানিক)

গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, ফুলিয়া।

একটি চিঠিতে একাধিক বিষয় লিখবেন না। এ-ধরনের চিঠি প্রচারের কাজেও বেশ সাহায্য করে।

নমুনা, মডেল ও প্রদর্শন (Specimens, Models & Exhibits)

কোন নতুন শস্য ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে হ'লে, মাঠে নেমে যেতে হবে। কিন্তু সব সময় মাঠে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে

নমুনা (Specimen)

না। তাই নমুনা দেখিয়ে কাজ সারতে হয়। গাছের বাড়, শিকড়ের রকম, বীজের ধরন সবই নমুনা রেখে দেখানো যায়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যত বেশি সম্ভব নমুনা সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত। এতে শিক্ষাদানের কাজ সহজ ও সুন্দর হয়।

কার্ড বোর্ডের গায়ে নানারকম শস্যের নমুনা গেঁথে রাখতে পারেন। বিভিন্ন রকম বীজের নমুনা শিশিতে পুরে সাজিয়ে রাখতে পারেন। শস্যের ক্ষতিকারক নানারকম কীটের একটা ক'রে স্পেসিমেন কাচের শেলফে সাজিয়ে রাখতে পারেন। পাশে কাগজের লেবেলে নাম লিখে রাখুন।

মডেল শিক্ষাদানের, আর একটি সহায়ক বস্তু। কৃষি-যন্ত্রপাতি, দেহের কোন অরগান, আদর্শ গৃহ, পায়খানা, কোন জন্তু বা পাখির
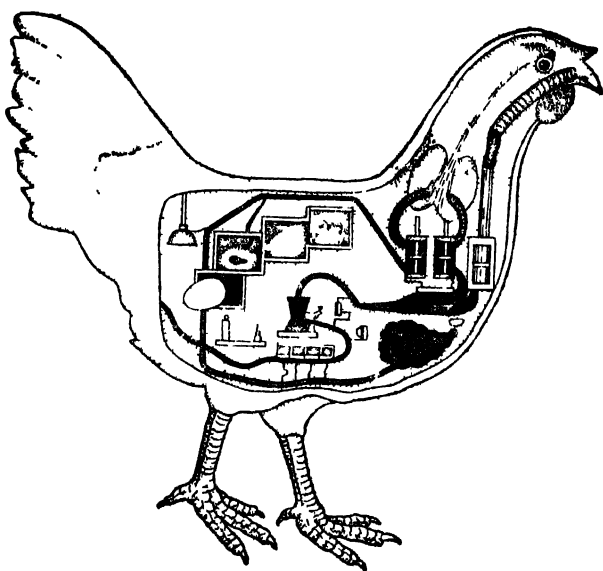
মডেল (Model

মডেল ব্যবহার করা যায়। তবে মডেল দিয়ে সাধারণতঃ ডিমনস্‌ট্রেশন দেওয়া যায় না। আসল বস্তু বা জীবন্ত জিনিসের প্রতিচ্ছবিই মডেল। মডেল মূল বস্তুর সমান, ছোট বা বড় ক'রে গড়া চলে।

জনসাধারণের মধ্যে কোন কিছু প্রচার ও ডিমনস্ট্রেশন দেওয়ার সব থেকে সুবিধা মেলার সময়। মেলার মধ্যে নানারকম জিনিসের মডেল এবং শস্যের নমুনা সাজিয়ে রাখলে, বহুলোকের নজরে পড়বে। একজিবিট্স্ এমনভাবে সাজিয়ে রাখা উচিত, যেন সেগুলি কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রাখে।

এ-বিষয়ে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখবেন :

১। নানাবিষয়ের একজিবিট্স্ একসঙ্গে রাখতে নেই। যে-কোন একটা বিষয়ের বিভিন্ন দিক দেখানো উচিত।

২। খুব ছোট জিনিস রাখতে নেই ; নজরেই পড়বে না।

৩। এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, যেন সহজেই সকলে বুঝতে পারে।

জীবন্ত জিনিস সব সময় যোগাড় করা যায় না বলেই মডেল ও নমুনার সাহায্য নিতে হয়।

পুতুল-নাচ (Puppetry)—পুতুল নাচ ভারতের একটি অতি প্রাচীন লোকশিল্প। আনন্দের মধ্যদিয়ে লোকশিক্ষাদানের এক সুন্দর কৌশল এই পুতুল নাচ। আমাদের প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এক শ্রেণীর পেশাদার রূপজীবীদের উল্লেখ আছে। তাদের নাম শৌভিক। পটের মাধ্যমে নাটকীয় রীতিতে নানা প্রাচীন কাহিনী ও আখ্যায়িকা চাক্ষুষরূপে উপস্থিত করা এবং মুখে বিবরণ ব'লে দর্শকের মন আকৃষ্ট করা হ'ত। কেরলে 'ছায়ানাটক' এখনও জীবিত। যবদ্বীপে ছায়ানাটকের বহুল প্রচলন আছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে আইডিয়া প্রচারের কাজে পুতুল-নাচ খুব ব্যবহৃত হয়। আমরা এই পুরাতন লোক-শিল্পকে প্রায় ভুলতে বসেছি।

পাপেট সাধারণতঃ চার রকমের করা হয়।

(১) হাত পুতুল (Glove puppet)।

(২) তারে লট্কানো পুতুল (String puppet) বা মারিওনেত্।

(৩) যষ্টি-পুতুল (Rod puppet)।

(৪) ছায়া-পুতুল (Shadow puppet)।

প্রত্যেকটার কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা আছে।

হাত-পুতুল—তৈরি করা খুব সোজা। হাতের আঙ্গুল তর্জনী পুতুলের মাথার মধ্যে ঢোকান হয় এবং পুতুলের দুই হাতের মধ্যে আপনার মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল ঢোকাতে হবে। তারপর সুকৌশলে আঙুল নাড়িয়ে পুতুলকে নাচাতে হবে। পুতুলের আকার খারাপ হ'লে কিছু যায়-আসে না; নাচ ও আপনার বলার মধ্যে যদি নাটকীয় ভাব থাকে, তাহ'লে দর্শক আগ্রহের সঙ্গে দেখবে। একটু চেষ্টা করলে দুই হাতে দুটি পুতুল নাচাতে পারবেন।

তার-পুতুল—ওপর থেকে পুতুলের মাথা ও হাতে সরু তার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

যষ্টি পুতুল—যষ্টির মাথায় পুতুল লাগানো থাকে। রড নাড়িয়ে আপনাকে পুতুল-নাচ দেখাতে হবে।

ছায়ার পুতুল—পর্দায় পুতুলের ছায়া ফেলে এবং সুকৌশলে পুতুলকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে মুখে নাটকীয় ভঙ্গীতে কাহিনী বলা।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহসজ্জা এবং কৃষি-বিষয়ক অনেক বিষয় এই পদ্ধতিব ভিতর দিয়ে লোককে জানানো যায়। অল্প খরচে আমোদ ও আনন্দেব মধ্যদিয়ে লোকশিক্ষাদানের এক চমৎকাব কৌশল এই পুতুল-নাচ। হাত-পুতুল তৈবিব কৌশল এই বইগুলি থেকে শিখে নেবেন।

1. The Multiplier Hand-book International Co-operation Administration.

2. Using Visuals in Agricultural Extension Programme—United States International Co-operation Administration.

পর্দায় ফেলা উপকরণ

ছায়াছবি—(Films)—সুপরিকল্পিত কোন কর্ম, কাহিনী বা ঘটনা প্রবাহের কতকগুলি গতিশীল ছবি। গতিশীল ছবির সঙ্গে শব্দ

যোজনা ক'রে ছবিকে জীবন্ত ক'রে তোলা হয়। অনেকে মিটিং-এ যেতে চান না, কিন্তু চলচ্চিত্র দেখতে যান। কোন বিষয়ে আগ্রহ জাগানো এবং লোকের মনোভাব পরিবর্তনের কাজে চলচ্চিত্র এক সুন্দর হাতিয়ার, শিক্ষাদানের চমৎকার উপকরণ। অবশ্য শিক্ষামূলক ছবির সংখ্যা এখনও এদেশে খুবই কম। সাধারণ চলতি ছবিরও একটা মস্ত সুবিধা আছে; চিত্র দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে বহু লোকের সমাবেশে কাজের কথাও কিছু জানাতে পারেন।

ছায়াছবির সুবিধা ঃ

(১) একজায়গায় বহুলোককে অতি সহজে জমায়েত করা যায়।

(২) কোন নতুন বিষয়ে আগ্রহ জাগায়; পুরাতন চিন্তাধারা ও বিচারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়।

(৩) 'চিত্তাকর্ষকভাবে জনসাধারণের কাছে তথ্য বা ঘটনা উপস্থাপিত করে।

(৪) শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই একসাথে মনোরঞ্জন করে।

(৫) কোন নতুন পদ্ধতি আমদানি করার পথ খুলে দেয়।

(৬) অতি অল্পসময়ের মধ্যে কোন কর্মপদ্ধতির আদ্যপান্ত সমস্ত দেখানো যায়। বাস্তবক্ষেত্রে দেখাতে গেলে হয়তো কয়েকদিন বা কয়েকমাস সময় লাগতো।

(৭) ছবির মানুষের সঙ্গে দর্শকরা নিজেদের একাত্ম ক'রে দেখে ও মিল খোঁজে।

(৮) বহুরকম বিষয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে লোকের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে।

রোগীর পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়, গর্ভবতী মাতা ও প্রসূতির কেমন ক'রে যত্ন নিতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে, জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর উপায় কি, কুটির ও হস্তশিল্পের বহু বিস্তৃত শাখা, বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনার সুফল, শস্যের রোগ ও কীট দমন-পদ্ধতি, উন্নত প্রথায় চাষ-পদ্ধতি, গবাদি পশুর পরিচর্যা-প্রণালী

—কর্মচঞ্চল কল-কারখানার কার্যরীতি—এই রকম বহু বিষয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়।

পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া কোথাও একদিন খানকয়েক ছবি দেখালে দর্শকের মনে সেটা ভালভাবে রেখাপাত করে না। কোন একটি বিশেষ বিষয় প্রচার বা চালু করার জন্যে পোস্টার, লিফলেট, প্যামফ্‌লেট ডিমন্‌ট্রেশনের সঙ্গে চলচ্চিত্র যোগ করলে কাজ সহজতর ও তরান্বিত হ'তে পারে।

কতকগুলি অসুবিধা:

চলচ্চিত্র বেশ ব্যয়বহুল। ঠিক আপনার পছন্দসই ফিল্ম সব সময় পাবেন না। অনেকগুলি উপকরণের সমাবেশ ক'রে তবে চিত্র প্রক্ষেপন করতে হয়। এ বিষয়ে টেকনিশিয়ানের সাহায্য প্রয়োজন। আবার ভাষার অসুবিধা অনেক সময় বিঘ্ন ঘটায়।

ফিল্ম স্ট্রিপ (Film Strip):

ফিল্ম স্ট্রিপ হচ্ছে পরপর সাজানো কতকগুলি নিশ্চল ছবির রোল। একটা কাহিনীর আকারে ছবিগুলি সাজানো হয়। কোন উন্নত পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় ছবির সাহায্যে চোখের সামনে তুলে ধরে মুখে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এতে সব থেকে বড় সুবিধা এই যে, একটা সম্পূর্ণ কার্যরীতি কমসময়ের মধ্যে দেখানো যায়। উন্নত জাতের মুরগী পালন-পদ্ধতি, জাপানী প্রথায় ধানচাষ, শিশুপালন-পদ্ধতি, বিভিন্ন কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি বহু বিষয় এতে দেখানো যায়।

ফিল্ম স্ট্রিপ দেখাবার জন্য একটা প্রক্ষেপক-যন্ত্রের প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়াও কেরসিন প্রোজেকটর দিয়েও দেখানো যায়।

ফিল্ম স্ট্রিপ ব্যবহারের সুবিধা:

(১) প্রক্ষেপক-যন্ত্র মোটেই জটিল নয়, চালানো সোজা।

(২) ছবি পর্দায় যতক্ষণ খুশি রেখে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে বলা যায়।

(৩) প্রক্ষেপক-যন্ত্র ও ফিল্ম স্ট্রিপ বয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়।

(৪) একসেট স্ট্রিপ শিক্ষাদান কাজে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা চলে।

(৫) সম্প্রসারণ-কর্মীর কাছে যদি ক্যামেরা থাকে, স্থানীয় কাজকর্মের ছবি তুলে তা থেকে অল্প খরচে ফিল্ম স্ট্রিপ তৈরি ক'রে নিতে পাবেন।

(৬) প্রতি ছবি নিয়ে দর্শকরা প্রশ্ন করতে পারে, আবার আলোচনারও সুযোগ পায়।

অসুবিধা :

১। যে ফটো তুলতে পারে সেই ফিল্ম স্ট্রিপ তৈরি করতে পারে না। এতে বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় আবার এবিষয়ে দক্ষতাও অর্জন করা চাই, তাছাড়া স্ট্রিপ করা যায় না।

২। ডার্করুম বা অন্ধকার ঘর দরকার হয়।

৩। এটা কিছুটা খরচাবহুল ব্যাপার।

৪। একদেশের ফিল্ম স্ট্রিপ অন্য দেশে তেমন আর্কষণীয় হয় না।

নিম্ন লিখিত স্থান থেকে আপনি ফিল্ম স্ট্রিপ সংগ্রহ করতে পারেন—

1. National Institute of A. V. E., Indraprastha Estate, New Delhi.

2. I. C. A. R. New Delhi.

স্লাইড (Slide) :

ফিল্ম স্ট্রিপ যেমন নিশ্চল ছবির রোল, স্লাইড হচ্ছে নিশ্চল ছবি যুক্ত কাচের এক-একটি সেট। একটা সেটে একটি কাহিনী বা পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় কয়েকটি স্লাইডের মাধ্যমে দেখানো হয়। ফ্রেমের সামান্য একটু পরিবর্তন ক'রে নিলে একই প্রক্ষেপক-যন্ত্রে স্লাইড ও ফিল্ম স্ট্রিপ উভয়ই দেখানো যায়। স্লাইডে রঙিন ছবি আঁকা যায়।

একই উদ্দেশ্যে স্লাইড ও ফিল্ম স্ট্রিপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্লাইড তৈরি করতেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। ফিল্ম স্ট্রিপের বেলায় যে-সব সুবিধা ও অসুবিধা আছে স্লাইডের বেলাতেও সেই সুবিধা ও অসুবিধা আছে।

ওপেক প্রোজেক্টার (Opaque Projector) :

এই প্রক্ষেপক-যন্ত্র দুই রকম হয়—এপিস্কোপ (Episcope) ও এপিডাইস্‌কোপ (Epidiascope)। কাগজে আঁটা ছবি যন্ত্রের মধ্যে রেখে স্ক্রীনে ফেলা হয়। এপিডাইস্‌কোপে স্লাইডও দেখানো যায়। এই প্রক্ষেপক-যন্ত্রের সুবিধা এই যে, ছোট লেখা বা ছবি অনেক বড় ক'রে পর্দায় ফেলা যায়। ছোট ক'রে আঁকা চার্ট, গ্রাফ, ডায়গ্রাম, ছবি এই যন্ত্রের সাহায্যে বেশ বড় ক'রে দেখানো যায়। অনেক লোকও একসংগে দেখতে পাবে। যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তি নেই সেখানে দেখানো সম্ভব হবে না।

রেডিও, গ্রামফোন, মাইক, বক্তৃতা—এসবের আবেদন প্রধানতঃ কানের কাছে। টেলিভিশন অবশ্য কান ও চোখ উভয়েব কাছেই আবেদন জানায়। টেলিভিশন ছাড়া অন্যগুলির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। কিন্তু লোকশিক্ষাব কাজে এগুলি সুচারুরূপে ব্যবহার করতে আমরা এখনও শিখিনি।

রেডিও (Radio) :

এ-যুগে রেডিও বিলাসদ্রব্য নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় প্রীতি, জ্ঞান প্রসার এবং সংবাদ-প্রচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করলে প্রতি গ্রামে একাধিক রেডিও থাকা বিশেষ দরকার। রেডিওর ব্যাপক প্রসার যে কত দরকার তা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না।

রেডিওর সুবিধা :

(১) অল্পখরচে দেশের সর্বত্র একই সময়ে জরুরী ও প্রয়োজনীয় খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

(২) বাজার ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেশবাসীকে আকস্মিক বিপদের হাত থেকে অনেক সময় রক্ষা করে।

(৩) দেশের বিদ্বান ও গুণীদের আকাশবাণীতে ডেকে এনে সহজেই দেশবাসীকে তাঁদের জ্ঞানের অংশভাগী করা যায়।

(৪) মানুষের চিত্তে সঙ্গীতের ক্ষুধা প্রবল; রেডিও স্টেশন এই ক্ষুধা বহুলাংশে পূরণ করতে পারে।

ব্রডকাস্টিং স্টেশনের সঙ্গে এখনও পল্লীজীবনের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ হয়নি। ফলে, পল্লী-সমস্যা সঠিকভাবে চিত্রিত করা হয় না এবং সমাধানের পথও সুন্দরভাবে বাতলানো হয় না। সম্প্রসারণের কাজে রেডিওর অবদান আমাদের দেশে এখনও খুবই কম।

এই অসুবিধা সত্ত্বেও আপনি পল্লীর সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র বা স্কুলের রেডিওকে কেন্দ্র ক'রে একটা কর্মপ্রবাহ চালু করুন। স্থানীয় কৃষকদের পল্লীমঙ্গলের আসরে নিয়ে আসুন। কয়েক দিন প্রোগ্রাম শোনবার পর নিজেদের মতামত তাদের আকাশবাণী আপিসে পাঠাতে বলুন। গ্রামে বিদ্বান ও গুণী লোক থাকলে তাঁকে আকাশবাণী আপিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। চিত্তাকর্ষক কোন প্রোগ্রামের বিষয় আগেই পল্লীবাসীদের জানিয়ে দিন। এইভাবে আকাশবাণীর সংগে পল্লীর সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে।

রেকর্ড করে রাখা (Recording) :

শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে কথা বা গান রেকর্ড ক'রে রাখার মূল্য বড় কম নয়। বক্তা বা গায়কের কণ্ঠ বহু দূরদূরান্তরের লোকও শোনবার সুযোগ পায়। তাছাড়া, মৃত্যুর পরেও মৃতব্যক্তির কণ্ঠ শোনার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে।

গলার স্বরকে তিনভাবে রেকর্ড করা যায় :

(১) **যান্ত্রিক-পদ্ধতি** (Mechanical process)—গ্রামফোনের রেকর্ডিং এই পদ্ধতিতে করা হয়।

(২) **চুম্বক-পদ্ধতি** (Magnetic process)—টেপ রেকর্ড ও ওয়্যার রেকর্ড এই পদ্ধতিতে করা হয়।

(৩) **চাক্ষুষ-পদ্ধতি** (Optical process)—চলচ্চিত্রের ফিল্ম-এ এই পদ্ধতিতে শব্দ যোজনা করা হয়।

মাইক—সব রকম কাজে এখন মাইক না হ'লে আর চলে না। বিবাহ, পূজাপার্বণ আমোদ-উৎসব, মেলা, খেলাধূলা, সভাসমিতি, প্রচার ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই এখন মাইক ব্যবহার করা হচ্ছে। মাইক্রোফোন, অ্যামপ্লিফায়ার ও লাউড স্পিকার মিলিয়ে একটি মাইক সেট যে কোনও শব্দকে জোরালভাবে প্রকাশ করে। মাইকে ড্রাই ব্যাটারী ও বৈদ্যুতিক শক্তি দুই-ই ব্যবহার করা চলে।

বক্তৃতা (Talk or Lecture):

লোক শিক্ষাদানের জন্য বক্তৃতা অতি প্রচলিত ও অতি পুরাতন পদ্ধতি। কিন্তু বিনা প্রস্তুতিতে বক্তৃতা দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রস্তুতি ও অভ্যাস প্রয়োজন।

কোন বিষয়ে বক্তৃতা দিবার সময় এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখবেন—

যে বিষয়ে আলোচনা করবেন শুরুতেই শ্রোতাদের তার ইঙ্গিত দিয়ে দিবেন।

কোন প্রশ্ন বা সমস্যার কথা তুলে, কোন চ্যালেঞ্জ সবার কাছে রেখে অথবা একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার বক্তব্য শুরু করতে পারেন।

তারপর আপনার বক্তব্যের বিষয় বিস্তারিতভাবে বলুন।

শেষে এক দুই ক'রে সংক্ষেপে পয়েন্টগুলো পুনরালোচনা করুন। আপনি এমন জায়গায় দাঁড়াবেন যেন সকলে আপনাকে দেখতে পায়। কণ্ঠস্বর এমন মাত্রায় রেখে কথা বলবেন যেন কারো শুনতে কোন অসুবিধা না হয়।

শ্রোতাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনাকে আগেই জেনে নিতে হবে। আপনার নির্বাচিত বিষয়টি তাদের উপযোগী কিনা এবং তাদের মনে আগ্রহ জাগাবে কিনা, তা ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে তবে মুখ খুলবেন।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করবেন। পারত-পক্ষে কখনও বেশি সময় নেবেন না।

চাক্ষুষ উপকরণসমূহ তৈরির সময় কয়েকটি পয়েণ্ট অবশ্যই মনে রাখবেন—

১। অল্পকথায় ব্যক্ত করতে হয় (Brevity) ঃ

লেখকের এবিষয় অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত। শিল্পীও (Artist) বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে পারেন। মূলকথা পোস্টার, ফ্ল্যাশকার্ড, প্যাম্ফলেট, ফ্লিপবুক জাতীয় চাক্ষুষ উপকরণে লেখার বিষয় থাকবে খুবই কম। বক্তব্য যত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করবেন, ততই ভাল। এর সুবিধা—(ক) মুহূর্তে পড়ে ফেলা যায় ; (খ) অল্প জায়গার মধ্যে সার কথা বড় করে দেখানো যায়।

২। যেন সাদাসিদে হয় (Simplicity) ঃ

লেখার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাচ রাখবেন না। সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষায় লিখবেন এবং কয়েকটি পয়েণ্ট মনে রাখবেন—

পরিসংখ্যা যতটা সম্ভব কম রাখতে চেষ্টা করবেন।

অক্ষর ও চিত্রগুলো বড় করবেন।

অতিরিক্ত লেখা দিয়ে ভর্তি ক'রে ফেলবেন না।

নানারকম ডিজাইনের পরিপাটির দিকে ঝোঁক দিবেন না।

৩। আইডিয়া বা কল্পনা যেন থাকে (Idea) ঃ

আইডিয়ার অনুসন্ধান জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষ ক'রে থাকে। কাজের মধ্যে লোক দেখতে চাইবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী, আপনার চিন্তা, আপনার কল্পনা ও ধারণা। কাজেই, যে সকল চাক্ষুষ উপকরণ লোকের সামনে উপস্থাপিত করতে যাবেন, তাতে যেন নতুনত্ব ও অভিনবত্বের আভাস, চাতুর্য ও কৌতুকের ইঙ্গিত, তথ্যের সমাবেশ ও নাটকের রসাস্বাদ থাকে।

৪। বিন্যাস ক'রে কাজে হাত দেওয়া (Layout) ঃ

চাক্ষুষ উপকরণ যেভাবে তৈরি করবেন, তার একটা প্ল্যান বা ব্লুপ্রিণ্ট-জাতীয় জিনিস আগে কাগজে ছকে নেবেন। এতে কাজ করা সহজ হবে। প্রথমে কি লেখা থাকবে, তারপর কি লেখা হবে, চিত্র কেমন হবে—সব যদি

আপনি সাজিয়ে দেন এবং তা ডিজাইন ক'রে দেন, তবে জিনিসটা নজরে ধরার মতো হবে।

৫। রং ও তুলি (Colour) :

রঙের মূল্য আপনি জানেন। মানুষের মনের কাছে এর আবেদন কত, এর সৌন্দর্য কি, তা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কোন বিশেষ পয়েন্টকে সবার সামনে তুলে ধরা ও লোকের দৃষ্টি টেনে নেওয়ার পক্ষে রঙের তুলনা বোধহয় আর কিছুতে নেই। ভিন্ন ভিন্ন কাগজে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ ক'রে আগে দেখে নেবেন—কোন্‌টা ঠিক যুৎসই মত হবে। তারপর আপনি রং ও তুলি ছোঁয়ান।

এই ক'টি কথা স্মরণ রাখলে আপনার আঁকা চাক্ষুষ উপকরণ সুন্দর ও কার্যকরী হবে।

ফিল্ম স্ট্রিপস্ ও অন্যান্য চাক্ষুষ উপকরণের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযোগ করতে পারেন :—

(1) National Institute of Audio-Visual Education, (Ministry of Education), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi.

(2) Ama Educational Private Ltd, Canada Building, Hornby Road, Bombay.

(3) Al Mervyn Studio, Lucky Mansion, 79, Ghoga Street, Fort, Bombay.

(4) Calcutta Pure Drug Co 2, Coopper Lane, (Mission Row Exten.)

(5) Communications Media Centre, U.S. Technical Co-operation Mission to India, New Delhi-1

(6) Film Library, Ministry of Food & Agriculture, (Directorate of Extension), New Delhi.

(7) United States Information Service, New Delhi, Bombay, Calcutta & Madras.

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হ'তে-16 mm. films সাময়িকভাবে সংগ্রহ ক'রে এনে দেখানো যেতে পারে :—

(1) United States Information Service, New Delhi,

Bombay, Calcutta, Madras, Lucknow, Hyderabad, Bangalore & Trivandram.

(2) British Information Service, New Delhi, Calcutta, Bombay & Madras.

(3) Burmah Shell Co., New Delhi, Bombay, Calcutta & Madras.

(4) Central Film Library, National Institute of Audio-visual Education, (Ministry of Education), Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi,

(5) Film Library, Ministry of Food & Agriculture, (Directorate of Extension), New Delhi.

(6) Publicity Department, Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal, Writers' Buildings, Calcutta 1.

(7) District or Sub-Divisional Publicity Officer, Govt. of West Bengal.

(8) Communication Media Centre, U. S. Technical Co-operation Mission to India, New Delhi.

(9) Film Secretary, Office of the High Commissioner for Canada, 4 Aurangzeb Road, New Delhi.

(10) Office of the High Commissioner for Austrelia, Connaught Place, New Delhi.

একাদশ অধ্যায়

মূল্যায়ন শব্দের অর্থ কি ?

মূল্যায়ন শব্দের অর্থ মাপা, অনুসন্ধান করা এবং পর্যালোচনা করা। Evaluation মানে—'to find the value of' অর্থাৎ কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ কবা। এই মাপ-জোখ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজে জড়িয়ে আছে। স্থপতি মাপ-জোখ ক'রে নিখুঁতভাবে ব'লে দেন গৃহটিব উচ্চতা কত মিটার, কত সেন্টিমিটার। রসায়নবিদ্ কোন্ বস্তুতে কতটুকু খাদ বা ভেজাল আছে তার নির্ভুল হিসাব ব'লে দেন। কতটা সময় অতিবাহিত হ'ল, কতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হ'ল, একটা ইঞ্জিন কত শক্তি সৃষ্টি করছে সবই মেপে বলা যায়। রেল, স্টিমার, মোটর ও এরোপ্লেন কখন কত বেগে ধাবিত হচ্ছে, তা ব'লে দিতে এখন আর একটুও অসুবিধা হয় না। এমন কি, মানুষ ও পশুর বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা, সংবেদনশীলতা আজকাল মেপে মোটামুটি বলা যায়। তাছাড়া, বাৎসরিক জাতীয় আয় কত এবং কি হারে বাড়ছে, অনুসন্ধান ক'রে ব'লে দিতে অর্থনীতিবিদ্‌দের আর মুশকিল হয় না। কোন বড় শিল্পসংস্থা বা বড় কৃষিফার্মের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত খবর কস্ট এ্যাকাউন্টিং পদ্ধতি (Cost Accounting Method)-তে বের করা হচ্ছে। মূল্য বিচার করে না দেখলে সব কাজই অসম্পূর্ণ থাকে।

মূল্যায়ন সম্প্রসারণ প্রোগ্রামেরও এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ। অনুসন্ধান ও মূল্য-নিরূপণের ব্যবস্থা না থাকলে বোঝা যাবে না কাজের মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি ঘটছে, প্ল্যান অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কিনা, কতটা সফলতা লাভ করা গেছে এবং প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে কোথায় কি সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে,

সম্প্রসারণে অনুসন্ধানের বিষয়টি কেবল বস্তুগত নয়, গুণগতই প্রধান। উৎপাদন কত বেড়েছে, ঘরদোর কত তৈরি হয়েছে, রাস্তাঘাট কত কিলোমিটার বানানো হয়েছে এসব তো অনুসন্ধান করতেই হবে, সংগে সংগে দেখতে হবে নিজের গরজে কতটা কাজ হয়েছে, আর কতটা হয়েছে বাইরের চাপে। খতিয়ে দেখতে হবে, উন্নয়ন প্রোগ্রাম স্থানীয় লোকের চিন্তাধারা ও পুরাতন অভ্যাসের মধ্যে কতটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম-কুশলতার মধ্যে পরিবর্তন-সাধন সম্প্রসারণের মূল কথা। কাজে কাজেই নিছক বস্তুগত উন্নতির তথ্যবহুল রিপোর্ট দাখিল করলেই সম্প্রসারণের মূল্যায়নের কাজ সমাধা হবে না। তথ্যের ভিতর থেকে ছেঁকে বের করতে হবে স্থানীয় লোকের জ্ঞান ও আচরণে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে। "Evaluation is a continuous process of examining and analysing the strong and weak points of a programme in order to make the programme successful."—কোন উন্নয়ন প্রোগ্রামের মধ্যে কোথায় ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে, আর কোথায় আশানুরূপ চমৎকার কাজ হচ্ছে সেটা অবিরাম অনুসন্ধান করা ও বিশ্লেষণ করাই মূল্যায়ন। প্রোগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই মূল্যায়নের প্রয়োজন।

সম্প্রসারণ কাজে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা :

প্ল্যানহীন কাজে মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় না। সুপরিকল্পিত কাজের ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত কাজে টার্গেট রাখতে হয়। অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপে ধাপে অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হয়, টার্গেটের দিকে ঠিকমত চলছে কিনা। সম্প্রসারণ কাজের ধারা সব সময় সুপরিকল্পিত হবে। সুতরাং মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন তা নিম্নে উল্লেখ করছি :—

১। কাজের গতি অব্যাহত আছে কিনা এবং উন্নতির দিকে ঠিকমত এগিয়ে যাচ্ছে কিনা তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা যায়।

২। যে লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজে নামা হয়েছে, সেদিকে কেমন অগ্রসর হওয়া গেছে পরখ করে দেখা যায়।

৩। বাস্তবসম্মত কর্মসূচী তৈরির উপযোগী তথ্য পাওয়া যায়।

৪। সম্প্রসারণ-পদ্ধতি কতটা কার্যকরী হচ্ছে বুঝতে পারা যায়।

৫। সাফল্যের পরিমাপ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়। এতে কর্মী ও নেতা উভয়েই আনন্দ ও তৃপ্তি পান, তাঁদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

৬। কোন প্রোগ্রামের ভাল ও মন্দ দিক বুঝতে সাহায্য করে।

৭। মূল্যায়ন যত সুন্দর হবে, কাজ তত বিজ্ঞানসম্মত হবে।

৮। কর্মীরা নিজেদের কর্মদক্ষতার পরিমাপ মূল্যায়নের সাহায্যে করতে পারেন।

প্রত্যেক স্তরে মূল্যায়ন ঃ

কোন সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর তিনটি অংশ থাকে—(১) প্রোগ্রাম-গঠন, (২) প্রোগ্রাম-রূপায়ণ এবং (৩) প্রোগ্রামের সাফল্য-নির্ণয়। প্রতি স্তরেই মূল্যায়ন ক'রে দেখতে হয়।

প্রোগ্রাম গঠনে মূল্যায়ন ঃ

(ক) অবস্থার বিশ্লেষণ—সার্ভের ভিতর দিয়ে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা এই পর্যায়ে কর্মীকে ভালভাবে বিচার করে দেখতে হয়। যেমন—খবর যা সংগৃহীত হয়েছে তা অবস্থা বোঝার পক্ষে কি যথেষ্ট? তথ্যগুলো নির্ভুল তো? এগুলো নতুন খবর, না পুরানো খবর? এইভাবে তথ্যকে যাচাই ক'রে প্রোগ্রাম তৈরির প্রথমেই অবস্থাটা বুঝে নিতে হয়।

(খ) সমস্যা নির্ণয়—সঠিকভাবে অবস্থা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—স্থানীয় লোক কোন্‌ বিষয়ে বেশি আগ্রহী? কি তাদের প্রয়োজন? এখন প্রশ্ন, যে সমস্যা আপনার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হচ্ছে, সেটা কি প্রকৃতই গ্রামবাসীর অনুভূত সমস্যা? এই সমস্যার সব সমাধান

কি এখনই করা সম্ভব? অন্তত: আংশিক সমাধানও কি করা সম্ভব? বহু লোকের স্বার্থ কি এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত? এটা কি অগ্রাধিকার পাবার মতো? নাগালের মধ্যে যে সম্বল আছে তা দিয়ে কি সমস্যার সঙ্গে যুঝতে পারা যাবে? সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতার মধ্যে কি এটা পড়বে? এইভাবে মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে এক বা একাধিক সমস্যা বেছে নিতে হয়।

(গ) লক্ষ্য নির্ণয়—কোন্ আচরণের পরিবর্তন আপনি চান? সাধারণ জ্ঞানের কতটুকু প্রসার চান? কোন্ প্র্যাকটিসের প্রবর্তন ও কতটা প্রচলন করতে পারবেন ব'লে আশা রাখেন? এতে সাধারণ চাষী বা কারিগরের কর্মকুশলতা কতটা বাড়বে ব'লে মনে করেন? কোন্ ধরনের লোকের মধ্যে কি প্রচলন করতে চাচ্ছেন? লক্ষ্য স্থির করার সময় এইসব প্রশ্ন ভালভাবে বিচার ক'রে দেখতে হবে।

প্রোগ্রাম রূপায়ণে মূল্যায়ন :

(ক) কাজের শুরুতে—প্ল্যান অনুযায়ী কাজে নামবার আগে একবার পরখ ক'রে দেখা উচিত—যে লোকজন ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্ল্যানটাকে পুরোপুরি কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা; জরুরী অবস্থায় প্ল্যানের মধ্যে কিছু কিছু রদবদল করা যাবে কি না; যারা যে কাজের দায়িত্ব নেবে, সম্প্রসারণ-পদ্ধতির যেসব প্রয়োগ হবে সব ঠিক করা হয়েছে কিনা এবং কোন্ দিন, কোন্ সময়, কোন্ কাজ হবে, সকলে তা জেনেছে কি না।

(খ) কাজের মাঝে—কাজের অগ্রগতির মাঝে মাঝে অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে—সমস্যা সমাধানের পথে এবং লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ এগিয়ে চলছে কি না;—কেন না, প্ল্যান ভাল

হ'লেই যে কাজও ভাল চলবে তার কোন মানে নেই। কাজের ক্ষেত্রে, পরিচালক ও অন্যান্য সবার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা হচ্ছে কি না তা বিচার ক'রে দেখতে হবে।

সাফল্য নির্ণয়ে মূল্যায়ন :

কাজের শেষে—কাজটি সম্পন্ন হবার পর দেখতে হবে যেমনটি আশা করা হয়েছিল তেমন ফললাভ করা গেছে কিনা, নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না; যেসব সম্প্রসারণ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে।

কাজেই কার্যসূচী, পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সকল স্তরেই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের ব্যবস্থা যত ভাল হবে উন্নয়ন কাজ তত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

মূল্যায়নের সাধারণ নীতি :

(১) উন্নয়ন কাজের কার্যসূচী যেসময় তৈরি হবে মূল্যায়নের ব্যবস্থাও সেই সঙ্গে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খেয়াল-খুশিমত যখন তখন মূল্যায়ন করা যায় না।

(২) কাজের অগ্রগতির মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করে যেতে হয়।

(৩) মূল্যায়ন অর্থাৎ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য কখনও অস্পষ্ট রাখতে নেই।

(৪) যাদের কাছ থেকে খবর ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তারা যেন নির্ভর-যোগ্য প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ব্যক্তি হন।

(৫) যাঁরা প্রোগ্রাম গঠন ও রূপায়নে অংশ নেন, তাঁরাই বলতে পারেন কতটা সাফল্য লাভ করা গেছে।

(৬) যাঁদের শেখানো হচ্ছে, যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং যে অবস্থার মধ্যে সকল কাজ পরিচালিত হচ্ছে, সবটাই মূল্যায়নের সময় বিচার করতে হবে।

(৭) মূল্যায়ন করতে গিয়ে আর যেসব নতুন তথ্য ও সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়, তা বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে বিচার করা উচিত।

(৮) মূল্যায়নের রিপোর্ট সকলকে জানানো প্রয়োজন।

মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি :

কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে মূল্যায়নে বিভিন্ন-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। অগ্রগামী দেশে এ-ব্যাপারে বহুরকম মাপ-যন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করছি :

১। সার্ভে বা সমীক্ষা সর্বত্র বহুলপ্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি তেমন ব্যয়বহুল নয়, আবার এর মাধ্যমে খবরও খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা যায়। তবে সমীক্ষায় কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয়, যেমন,—

প্রথমতঃ, যে প্রোজেক্ট হাতে নেওয়া হবে সুরুতেই লিপিবদ্ধ করতে হবে তার উদ্দেশ্য কি, কতটা সময়ের মধ্যে কতটুকু ফল পাওয়া যাবার সম্ভাবনা, কি পরিমাণ খরচা হবে ব'লে মনে হয়, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, ঠিক করতে হবে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ও সংস্থার সংগে সংযোগে তথ্য সংগৃহীত হবে, ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণের কাজ নিয়মিতভাবে কারা চালাবেন, কি ধরনের প্রশ্নপত্র পাঠানো হবে।

তৃতীয়তঃ, স্থির করতে হবে প্রোজেক্টের শুরুতে, মাঝে ও শেষে কিভাবে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে।

চতুর্থতঃ, প্রাপ্ত তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার অভিমত নিতে হবে।

২। অগ্রগামী সকল দেশে কস্ট এ্যাকাউন্টিং পদ্ধতির (Cost Accounting Method) সাহায্যে আয় ও ব্যয়ের একটা পরিষ্কার চিত্র সবার সামনে তুলে ধরা হয়।

৩। কোন সামাজিক প্রশ্নে বা সমস্যায় সাধারণের মনোভাব কি জানবার জন্য যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় তাকে Attitude Scale বলে।

৪। কোন প্রশ্নের পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এক সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তাকে বলে Opinion Polls. এতে কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখে মত জানাতে হয়।

৫। কোন একটা বিষয়ের মুল্য বা গুরুত্ব কার কাছে কেমন ভাবে Value scale-এর সাহায্যে জানতে হ'বে, তা অনুসন্ধান করতে হয়।

৬। কোন এক বা একাধিক বিষয় কে কেমন বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পেরেছে, তা পরীক্ষা করা হয় Knowledge and Comprehension Test-এর সাহায্যে। স্কুল-কলেজে এ ধরনের টেস্ট করা হয়।

৭। কার কোন্ দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা আছে তা পরখ করা হয় Interest Check-এর সাহায্যে। এতে স্বভাব ও ঝোঁক অনুযায়ী জীবিকা-নির্বাচনের পথ সুগম হয়।

৮। কে কোন্ কাজে কেমন দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করেছে, তা জানা যায় Skill and Performance Ratings-এর মাধ্যমে।

৯। কোন্ নতুন প্র্যাক্‌টিস কতলোক গ্রহণ করেছে এবং যারা গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কতজন নিয়মিত অভ্যাস করছে, আর কতজন অনিয়মিত প্র্যাক্‌টিস করছে, কতজন ছেড়ে দিয়েছে, তা অনুসন্ধান করা যায় Adoption Practice-এর মাধ্যমে।

১০। কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ক্লাব অথবা কোন ব্যক্তি কিভাবে একটা নতুন প্র্যাক্‌টিস গ্রহণ ক'রে আয়ত্ত করেছে, তার কাহিনীকে Case History বা ঘটনার ইতিবৃত্ত বলা হয়। মূল্যায়নের এটা একটা সুন্দর উপায়, কারণ মানব-প্রকৃতি সকল দেশেই মোটামুটি একরকম।

রিপোর্ট দাখিল :

মূল্যায়নের মাধ্যমে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়, তা বিচার ক'রে খতিয়ে দেখবার ফলে যে চিত্র নজরে পড়ে, তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ ক'রে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হয়। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য নানাপদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে ; যেমন—

(১) লিফ্‌লেট বা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা চলে।

(২) টেবুলার ফর্মে সাজিয়ে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

(৩) গ্রাফ, সহজ কার্ড, পাইচার্ট, বারচার্ট, ছবিচার্ট ইত্যাদি নানাভাবে মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করা যায়।

সম্প্রসারণ কর্মীর আত্ম-বিশ্লেষণ (Self-evaluation) :

আত্ম-বিশ্লেষণের মতো ভাল জিনিস আর নেই। কাজ করতে গেলে ভুল হবে এবং ভ্রান্তিও ঘটবে। সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু ভুল

সংশোধনের যদি চেষ্টা না থাকে, সেটাই হবে মারাত্মক। বিভিন্ন স্তরের সরকারী ও বেসরকারী কর্মীরা যতই আত্মবিশ্লেষণ করবেন ততই কাজের মান উন্নত হবে এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সুন্দর হবে।

১। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক আত্মানুসন্ধান করবেন :

(ক) ব্লকের সকল কর্মীর সংগে কাজের মধ্য দিয়ে কেমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন ?

(খ) গ্রামবাসীর সংগে তাঁর সম্বন্ধ কেমন হয়েছে ?

(গ) এই এলাকার শিক্ষকমণ্ডলীর সংগে তাঁর সংযোগ কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছে ?

(ঘ) ব্লকে তাঁর যোগদানের পর গ্রামবাসী কতটা এগিয়ে এসেছে এবং উন্নয়ন কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছে ?

(ঙ) সরকারের উন্নয়ন স্কীমগুলো নিজ এলাকায় ভালভাবে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে কি ?

২। ব্লকের অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকগণ খতিয়ে দেখবেন :

(ক) গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের সংগে কাজের মাধ্যমে কতটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন ?

(খ) কোন্ কোন্ পদ্ধতি ও স্কীমে গ্রামবাসী বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে ?

(গ) এ ব্যাপারে কোন্ ধরনের লোক এগিয়ে আসছে এবং গ্রহণ করতে উদ্যোগী হচ্ছে ?

(ঘ) অনেকের সংগে সংযোগ স্থাপন কেন এখনও সম্ভবপর হয় নি : আবার যাদের সংগে সংযোগ হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ সাড়া দিয়েছে, কেউ সাড়া দেয়নি। কারণ কি ?

(ঙ) যারা উন্নয়ন প্রোগ্রামে সহজে সাড়া দেয় এবং যারা মোটেই গরজ দেখায় না, এমন লোককে চিনে ফেলা হয়েছে কি ?

(চ) কোন কোন গ্রাম কেন একেবারে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে, তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে কি ?

৩। গ্রাম পর্যায়ের কর্মীরা দেখবেন ঃ

(ক) ফল প্রদর্শন, পদ্ধতি প্রদর্শন, গ্রুপ সংযোগ ও ব্যক্তিগত সংযোগ—এ সবের মধ্যে কোন্‌টি বেশি কার্যকরী হয়েছে, কোনটিতে কেমন ফল পেয়েছেন ?

(খ) কয়েকজন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছে এবং কয়েকজন শুনেছে। কিন্তু তা গ্রহণ করেনি, আবার কেউ কেউ ববাবরই এড়িয়ে গেছে। এর কারণ কি ?

(গ) তাঁর কাজের মধ্যে এমন কি ত্রুটি রয়েছে যার ফলে এখনও অনেকের আস্থাভাজন হ'তে পারেন নি ?

(ঘ) তাঁর গ্রামে থাকায় কিছু ফল হয়েছে কি ? যদি অন্যত্র থাকতেন তাতে কি ফল ভাল হ'ত ?

ব্লকে টিম-ওয়ার্ক ঃ

অধিকাংশ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে টিম-ওয়ার্ক বড় দুর্বল। ছোট ছোট দল ; আর রেষারেষি খুব বেশি। একটু পরিচিত হ'লেই এটা সবারই নজরে পড়বে। উধ্বর্তন কোন অফিসাব যখন ব্লক পরিদর্শনে আসেন তখন বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না যে ভিতরে দারুণ ঘুণ ধরেছে। আত্মরক্ষার দায়ে ব্লক-স্টাফ তাড়াতাড়ি আটসাট হয়ে নেন, ভীতি কেটে গেলেই আবার যেই কে সেই। ব্লকে ব্লকে এবিষয়ে আত্ম-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। টিম-ওয়ার্কে বিঘ্ন ঘটায় কারণ প্রধানত চারটি :—

(১) **ব্লকের সকল কর্মী যে একটা সক্রিয় টিম, এই কথাই পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয় না।** এ-টিমের বৈশিষ্ট্য কি, লক্ষ্য কোথায়, কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি কেমন তা অনেকের কাছেই থাকে অস্পষ্ট। কর্মের দ্যোতনা ও সাফল্য টিমকে বলিষ্ঠ করে, পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক টিমের শক্তি যোগায়—এ-বোধ তীব্র থাকে না বলেই সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসে।

(২) **পদমর্যাদা সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনতা টিম গঠনের পথে একটি মস্ত বাধা।** মর্যাদার উচ্চ আসন ও নিম্ন আসনের বোধ যখন কর্মীদের চিত্তকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তখন টিম তৈরি হয় না বরং

ভাঙ্গন ধরে। এ-অবস্থায় পরস্পর মত বিনিময় ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসে। গ্রুপের প্রাণস্পন্দন নির্ভর করে গ্রুপের ভাব বিনিময়ের ওপরে।

(৩) **ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা টিম-গঠনের পক্ষে আর একটি বাধা।** কেউ কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য অনুযায়ী গ্রামের কাজে লিপ্ত হ'তে চান, কেউ আপন পদোন্নতির দিকে নজর রেখে সব কাজের প্ল্যান করেন, কেউ আবার ঠিক উপরের বড় সাহেবের মতিগতি বুঝে তাঁকে খুশি করার মতলবে কাজে নামেন। এ-ধরনের বিভিন্ন স্বার্থ সত্বেও সকলের মধ্যে একটা সাধারণ মিলন ভূমি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। টিমস্বার্থ গড়ে তোলার নিরন্তন প্রয়াস থাকলে ব্যক্তিস্বার্থ অস্বাভাবিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

(৪) **দলপতি অনেক সময় নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না।** বি. ডি. ও. এমন একজন দলপতি যিনি নির্লিপ্তও থাকতে পারবেন না, আবার হামেশা হুকুমদারীও করতে পারবেন না। সাফল্যের সঙ্গে টিমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই প্রকাশ পাবে তাঁর কৃতিত্ব। দলের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যাতে লাভ করতে পারেন সেই হবে তাঁর লক্ষ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্থানীয় নেতৃত্ব কেন চাই ?

মৃতপ্রায় পল্লীকে আমরা পুনরায় জাগিয়ে তুলতে চাইছি। পল্লীর পুনর্গঠন কাজে হাত দিচ্ছি। প্ল্যান করে কৃষিজ উৎপাদন বাড়াবার কথা ভাবছি। সংগে সংগে প্রশ্ন জাগছে এইকাজ পরিচালনের দায়িত্ব নেবে কে। একটি মাত্র কথাই মনে আসে— পল্লী-সংস্থাকে উদ্যোগী হতে হবে। ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে প্রকৃত লোকসংস্থা গড়ে তুলতে না পরলে আমাদের জাতীয় শক্তিকে মজবুত ভিতের ওপরে দাঁড় করান যাবে না। পুরাতন সমাজবন্ধন ও গোষ্ঠীবন্ধন এখন শিথিল হয়ে গেছে। নতুন ধাঁচের সংগঠন প্রয়োজন ; কেননা গণ-সংগঠন গণতন্ত্রের প্রকৃত বুনিয়াদ। লোকমত প্রকাশ পায় সংঘের মাধ্যমে। বিচ্ছিন্ন জনতার কোন মতও নেই, কোন শক্তিও নেই। লোক-শক্তি দানা বাঁধে সংগঠনের মধ্যে, কিন্তু কোন জোট বা দল বাঁধতে গেলে এবং সংগঠন গড়ে তুলতে হলে দলপতি বা নেতার দরকার হয়। নেতা সংঘ-শক্তিকে সুদৃঢ় করেন, সংঘের সকলকে সজাগ করে তোলেন এবং সুপরিকল্পিত কাজের মধ্যে সকলকে টেনে নিয়ে আসেন। স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে না পারলে বাইরের কোন লোকের পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। বহিরাগত কোন নেতা সাময়িক একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু স্থায়ী গতিবেগ এনে দিতে পারেন না।

দেশজুড়ে সমষ্টি উন্নয়নের যে কাজ সুরু হয়েছে, তাকে সফল করে তুলতে হলে সরকারী স্কীমগুলিকে ক্ষিপ্রতার সংগে কার্যকরী করা দরকার। সরকারী ও বেসরকারী উভয় তরফের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের কোন কর্মসূচিকে রূপদেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা সম্প্রসারণ-

কর্মীকে নিতেই হবে। তাঁদের প্রভাব অগ্রাহ্য করে একদিকে কাজ করা যেমন শক্ত অন্যদিকে তাঁদেব সহায়তা পেলে সম্প্রসারণ কর্মীর কাজের পরিধি সহজেই বিস্তার লাভ করবে। গ্রাম-সহায়ক ও গ্রাম-লক্ষ্মীর কথা এই কারণেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীবৃন্দের নেতৃত্ব থাকবে পরোক্ষ; প্রত্যক্ষ নেতৃত্বভার গ্রহণ করা তাঁদের ঠিক হবে না। সকল গঠন-মূলক কাজের পিছনে তাঁরা থাকবেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দেবেন, কাজের পদ্ধতি বলে দেবেন, সরকারী স্কীমগুলি জন-সাধারণকে বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু স্থানীয় সংগঠনীর মাধ্যমে কাজ যাতে পরিচালিত হয়, সেই চেষ্টাই তাঁরা করবেন—তা না হলে দেশবাসী সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

নেতা ও নেতৃত্ব ঃ

মানব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে আমরা লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রয়োজনের তাগিদে দলপতি নির্বাচন করেছে অথবা কোন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে সংঘবদ্ধ হয়েছে। দলবদ্ধ জীবনের প্রকাশ দেখতে পাই নেতৃত্বে। সংঘের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা, কর্মসূচি প্রণয়ন করা এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকলকে কাজে প্রবৃত্ত কবার দায়িত্ব নেতার। নেতার যোগ্যতা ও উদ্যমের ওপরে দলের শক্তি ও প্রভাব অনেকখানি নির্ভর করে। আবার কোন ব্যক্তি যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হন, যতই উদ্যমী হন না কেন যদি দলের সাধারণ সভ্যের সমর্থন হারান তবে তিনি তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারেন না। দলচ্যুত হ'লে নেতার প্রভাব নিষ্প্রভ হয়ে যায়। নেতৃত্ব এমন একটা গুণ বা ক্ষমতা, যার বলে কোন ব্যক্তি দলের অন্যান্য লোকদের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। যে ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী তাঁকে আমরা নেতা বলে থাকি। নেতৃত্বের প্রধান দুই দিক—(১) অনেক লোককে জোটবদ্ধ

করার ক্ষমতা, (২) সকলের গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি প্রণয়নের যোগ্যতা। নেতৃত্ব তখনই সুন্দর হয়, যখন দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলে সচেতন হ'য়ে ওঠে ; বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় এবং নেতা সকলের আস্থাভাজন হন। প্রভুত্ব করা আর নেতৃত্ব করা কিন্তু এক জিনিস নয়। প্রভুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে, বিকাশকে প্রতিহত করে। নেতৃত্ব মুক্তির সন্ধান দেয়, প্রকাশকে সহজ করে। হিটলার ও মুসলিনীর আচরণের মধ্যে নেতৃত্ব ছিল না, প্রভুত্ব ছিল ; আর আব্রাহাম লিঙ্কন, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রভুত্ব ছিল না, নেতৃত্ব ছিল। মানুষ প্রভুত্ব পছন্দ করে না, নেতৃত্ব চায়।

এক এক কাজে এক এক রকম নেতা :

নেতা বলতে যাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন তাঁদের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। রাজনীতি জীবনের যে একটা প্রধান দিক তাতে সন্দেহ নেই। সমাজ-জীবনের বহুক্ষেত্রে আপনি নানারকম নেতা পরিচয় পাবেন। অনেকের নেতৃত্বে হয়তো আপনাকেও সময়ে সময়ে কাজে জড়িয়ে পড়তে হবে। আমরা সমাজবদ্ধ মানুষ। আমাদের জীবনের অনেক দিক আছে—শিক্ষার দিক, খেলাধূলার দিক, রুজিরোজগারের দিক, ধর্মবিশ্বাসের দিক, রাজনীতির দিক, আমোদ-উৎসবের দিক, ভ্রমণের দিক, সঙ্গীতের দিক আরো কত কী! সকল দিকেই সংগঠন ও নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করবেন। কেউ নেতা হয়ে জন্মান, কেউ চেষ্টা করে নেতৃত্ব অর্জন করেন, আবার প্রয়োজনের তাগিদে কারো স্কন্ধে নেতৃত্বের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হয় ; তবে যোগ্য নেতৃত্বের জন্য সকলকেই অধ্যবসায়ী হতে হয়। বিভিন্ন সংগঠনকে কেন্দ্র করে নেতার কর্মক্ষেত্র গড়ে ওঠে।

সংগঠনী নেতা :

যে সব নেতা বা দলপতির প্রভাব আমরা সকলে অনুভব করে থাকি, তাঁদের কথা সংক্ষেপে পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করছি।

সেনাবাহিনী সকল দেশেই একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন। ফৌজী সংগঠন অতি প্রাচীন। সমস্ত বাহিনীর সব রকম কাজকর্ম চমৎকার নিয়ম-কানুন অনুসারে পরিচালিত হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগ এক একজন অধিনায়কের নিয়ন্ত্রাধীনে থাকে। সবার ওপরে থাকেন সর্বাধিনায়ক। নায়কবিহীন সেনাবাহিনী আমরা চিন্তা করতে পারি না।

কয়েকজন ধনী যখন একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তখন তাকে বলে ব্যবসায়-সংগঠন, যখন কারখানা স্থাপন করেন, তখন তাকে বলে শিল্প-সংগঠন। এ ধরণের সংগঠনে নিজ নিজ নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে নেয়। এক একটি প্রতিষ্ঠানে বহুলোক কাজ করে। ম্যানেজিং এজেণ্টদের আমরা প্রতিষ্ঠানের নেতা আখ্যা দিতে পারি। এই ধরনের ধনী নেতা বা ফৌজী নেতা নিজেদের কর্মী বা সৈনিকদের ওপরে প্রধানতঃ প্রভুত্ব করেন, সত্যিকারের নেতৃত্ব করেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-নিকেতনগুলি এক একটি প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ পণ্ডিতব্যক্তি ও শিক্ষাদবদীগণ এই ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালকদের আমরা নেতা বলতে পারি।

সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়ে থাকে। দলভুক্ত লোক সমাজসেবা ও রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। প্রত্যেক দলই স্থানীয় নেতা এবং সংগঠনের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করে। এই সব নেতা দলের কাজ পরিচালন করেন। এঁরা রাজনৈতিক নেতা।

রেড্‌ ক্রস সোসাইটি, সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন, খৃশ্চিয়ান মিশন, ভারত সেবাশ্রম, আর্যসমাজ, আন্‌জুমান-ই-ইসলাম, তব্‌লীগ্‌ ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নিয়ম-কানুন

অনুসারে পরিচালিত হয়। আর্তের সেবা ও শিক্ষাবিস্তাব করা এদের কাজ। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ-কর্ম নেতার অধীনে পরিচালিত হয়।

বংশ পরম্পরায় নেতা

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীন কালে বিবাদমান গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কোন বলিষ্ঠ ও শক্তিমান ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করে লড়াই করতো। পরবর্তীকালে এই দলপতিদের কেউ বাজা কেউ বা নবাব হ'য়ে বিভিন্ন জনপদে বসতেন। অধিপতির পদ ক্রমশঃ এইভাবে বংশগত হ'য়ে পড়ে। আমাদের দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর তালুকদাব ও জোতদারগণ জমির ওপরে বংশগত অধিকার লাভ করেন, ফলে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকাবী হন। গ্রাম ও তহশীলের মুখ্যর পদ ক্রমশ বংশগত হয়ে ওঠে; প্যাটেল, দেশাই দেশপাণ্ডে ইত্যাদি উপাধি তারই নিদর্শন।

সাময়িক প্রয়োজনে নেতা

যখন কোথাও আগুন লাগে, কোন অঞ্চল বন্যায ডুবে যায়, কোথাও মহামারি দেখা দেয়, ভূমিকম্প হয় অথবা দুর্ঘটনা ঘটে তখন দেখতে পাবেন দুর্গতদের সেবা করার জন্য কিছু লোক হঠাৎ ছুটে এসে পাশে দাঁড়ান। তাঁদের মধ্যে দু'চারজন প্রথমে কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। বাকী অন্য সকলে তাঁকে অনুসরণ করেন। আবার হয়তো দেখেছেন, দু'টি বিবাদমান দলের দীর্ঘদিনের মন কষাকষি হঠাৎ এক-দিন হাতাহাতিতে পরিণত হয়েছে। এই সময় একই সংগে সকলে দাঙ্গা সুরু করে না; যেইমাত্র দু'একজন লোক এগিয়ে এসে মারপিট সুরু করে, তখনি আরো অনেকে যোগ দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে বসে। এইসব দলপতিদের পেছনে সুগঠিত কোন দল থাকে না। সাময়িক অবস্থা বিপাকে তাঁরা সামনে এগিয়ে আসেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেই তাঁদের নেতৃত্বও লোপ পায়।

ধর্মীয় নেতা

যিশু, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য—এঁরা সকলেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলেছেন এবং সমাজ-জীবনে কতকগুলি নীতি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অসামান্য ব্যক্তিত্বের বলে বহুলোকের আনুগত্য লাভ করেছেন। হাজার হাজার লোক তাঁদের মত অনুসরণ করেছে। তাঁরা ক্ষমতালাভের জন্য উদগ্রীব হননি, জনসাধারণের ওপরে প্রভুত্ব করেননি। নিজের জীবন-সাধনায় জনচিত্তে স্থায়ী আসন দখল করেছেন। আজও অনেক মানুষের চিন্তা ও জীবনযাত্রা যথেষ্ট প্রভাবিত হচ্ছে সাধুসন্ত, ধর্মযাযক ও মৌলানাদের দ্বারা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরাই নেতা।

পেশার বলে নেতা

জেলা, মহকুমা ও ব্লক পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীরাও এক ধরণের নেতা। জনকল্যাণমূলক কাজ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে এঁদের নেতৃত্ব সকলেই অনুভব করে থাকে। সবকারী স্কীমকে কার্যকরী করতে গিয়ে তাঁরা জনচিত্তকে অনেকখানি প্রভাবিত করেন। তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নেতৃত্বের গণ্ডি ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। পেশাগত ভাবে এই নেতৃত্ব আসে; পেশা ত্যাগ করলে নেতৃত্ব আর থাকে না।

গণনেতার যোগ্যতা কি ?

এমন নেতা আমরা দেখতে পাই, যিনি দলের নিছক মুখপাত্রের কাজ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব কম, বোঝবার শক্তি কম, সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না এবং কোন কাজে হাত দিতে দ্বিধাবোধ করেন। এধরণের নেতার ভূমিকা গৌণ। সাধারণ সভ্যদের ভূমিকাই থাকে সেক্ষেত্রে প্রবল। আবার অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতাও আমরা দেখতে পাই। যাঁর নিজস্ব মতামতের কাছে দলের আর পাঁচজন কথা বলতেই পারে না। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর অভিমত এবং

তাঁর সিদ্ধান্ত, দলের ইচ্ছা, দলের অভিমত ও সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এখানে নেতার ভূমিকাই সব কিছু আচ্ছন্ন করে রাখে, দলের ভূমিকা থাকে নামমাত্র। দল ও নেতার মধ্যে ভারসাম্য উভয় ক্ষেত্রেই বজায় থাকে না।

গণনেতা দলের নিষ্ক্রিয় প্রতিনিধি নন, আবার দল ছাপিয়ে আত্মসর্বস্ব হয়ে তিনি কখনও ওঠেন না। দলভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি তিনি হুকুম চালান না, তাদের সংগে থেকে তাদের পরিচালন করেন। তিনি জানেন দলের সকলকে মিলিয়ে নিয়েই তাঁর শক্তি। একটা ফুটবল টিমের কথা অথবা ক্রিকেট টিমের কথা ভাবুন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থানে থেকে খেলার দিকে সতর্ক নজর রাখেন এবং পরস্পরকে সাহায্য করেন। এতে প্রত্যেকে আপন আপন সীমানায় নিজের দক্ষতা দেখাতে পারে। ফলে আপন' আপন টিমের শক্তি বৃদ্ধি করেন। টিমের অধিনায়ক একেবারে নিজের লোক। আবার একটা অর্কেষ্ট্রা পাটির কথা চিন্তা করুন। সকলের সমবেত প্রয়াসে একটা মনোরম সুরঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়। একজন পরিচালকের নিয়ন্ত্রাধীনে প্রত্যেকে সেই পার্টিকে সাহায্য করেন, আবার পার্টিও প্রত্যেকের আত্মপ্রকাশে সহায়ক হয়। গণনেতা অনেকটা শিল্পীর মত, যিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র নষ্ট না করে মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক মধুর ক'রে তোলার কুশলতা অর্জন করেছেন। নিজের সিদ্ধান্ত কখনও তিনি দলের ওপরে চাপিয়ে দেবেন না, দল যাতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, সর্বতোভাবে সেদিকে সহায়তা করবেন। এতে দলের সক্রিয়তা বজায় থাকবে। গণনেতা একাধারে বন্ধু ও সাথী। তিনি যদি ভাল বক্তা না হন, তেমন উচ্চ-শিক্ষিত না হন, দর্শনধারী সুপুরুষ না হন অথবা খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হন তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। দলের স্বার্থকে যিনি নিজের স্বার্থ বলে গণ্য করতে পারবেন, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সবসময় যিনি সচেতন থাকেন, তাঁরই পক্ষে সার্থক গণনেতা হওয়া

সহজসাধ্য হবে। পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সংঘশক্তির উৎস। নিজের চরিত্র, আচরণ ও কাজ দিয়ে গণনেতাকে অপরের আস্থা ও বিশ্বাসভাজন হ'তে হয়। গ্রামে গ্রামে আমাদের গণনেতার প্রয়োজন।

নেতার কাজ

দলের বাঁধুনি ও কাজকর্ম অনেকখানি নির্ভর করে নেতার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির ওপরে। গণনেতার দায়িত্ব গুরু, তাঁর কাজ অনেক। এখানে তারই একটু আভাস দিচ্ছি।

(১) তিনি দলের **মুখপাত্র**। দলের পক্ষে অধিকাংশ কথা তাঁকেই বলতে হয়। দলের স্বার্থ, দলের মর্যাদা এবং দলের আদর্শ যাতে রক্ষা পায় সে দায়িত্ব তাঁর। দলকে সাধারণের কাছে পরিচিত করেন তিনি।

(২) তিনি দলের **ঐক্যবিধায়ক**। কোন একটা আদর্শকে ভিত্তি করে অথবা কোন একটা লক্ষ্য সামনে রেখে এক একটা দল গড়ে ওঠে। আদর্শ বা লক্ষ্যের কথা সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে দলের মধ্যে একতা আনা নেতার কাজ। নানারকম মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, উপদল গজিয়ে উঠতে পাবে কিন্তু নেতা সব সময় দলে ঐক্য আনবার চেষ্টা করবেন।

(৩) তিনি দলের **প্ল্যানার**। দলের আদর্শকে সার্থক করে তোলবার চিন্তা তাঁর মানসপটে থাকবে। দলের আর পাঁচজনকে নিয়ে প্ল্যান করবেন, কর্মসূচী তৈরী করবেন, সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে দেবেন।

(৪) তিনি দলের **কর্ম-পরিচালক**। নেতা নিজে এগিয়ে এসে কাজে হাত দিবেন এবং সকলকে সক্রিয় করে তুলবেন। সকলকে কাজের মধ্যে টেনে নেওয়া, দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া নেতার প্রধান কাজ।

(৫) **তিনি পরিদর্শক।** বিভিন্ন বিভাগে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে যে কাজকর্ম চলে তা নিয়মিত পরিদর্শন করা নেতার কাজ।

(৬) **তিনি দলের প্রতিভূ।** প্রত্যেক দল বা সংঘের নিজস্ব আদর্শ ও নীতি থাকে। যাঁরা অন্তরের সংগে এই আদর্শ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই নেতা মনোনীত ক'রা হয়। নেতার ভিতর দিয়েই দলের আদর্শ সাধারণের মধ্যে প্রতিফলিত হবে।

(৭) **তিনি দলের শিক্ষক।** নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দলের সকলের মধ্যে বিস্তার করা, দলের বিচার-বুদ্ধির মান উন্নত করা নেতার একটা প্রধান কাজ। যে নেতা শিক্ষকের ভূমিকা নেন, তিনি কখনও ডিক্‌টেটার হ'য়ে উঠতে পাবেন না। উচ্চ শিক্ষনপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই কারণেই নেতা নির্বাচন করা উচিত।[১]

নেতা যে কথা মনে রাখবেন ঃ

নেতা হবার সাধ আমাদের অনেকেরই হয় কিন্তু সাধ্য অধিকাংশেরই থাকে না। নির্ভর করার মত নেতা সহজে পাওয়া যায় না। যোগ্য নেতা হতে হলে নিয়ত আত্মবিশ্লেষণ করতে হয়, দিনে দিনে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। যে কোন ক্ষেত্রে যিনি নেতৃত্বের আসনে যেতে চান, তাঁকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা খেয়াল রাখতে হবে।

(১) শারীরিক সুস্থতা যতদূর সম্ভব বজায় রাখা প্রয়োজন। রুগ্নদেহে নেতৃত্ব করা যায় না। দেহ ও মন কর্মঠ হওয়া চাই।

(২) মানসিক বল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই যোগ্য নেতা হ'তে পারেন। বুদ্ধিমান না হলে নেতৃত্ব করা যায় না।

(৩) দলের উদ্দেশ্য ও কোন কাজের লক্ষ্য সম্বন্ধে নেতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তাঁকে পথ বাতলাতে হবে।

---

(১) D. Sanderson ও Robert A. Polson নেতার কাজকে অনেকটা এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। Rural Community Organisation গ্রন্থের Ch. XII দ্রষ্টব্য।

(৪) নেতাকে পরমত সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে হবে। নিজের বক্তব্য যুক্তি-গ্রাহ্য করে গুছিয়ে বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

(৫) যিনি সংবেদনশীল, তিনি সহজে নেতৃত্বের আসনে যেতে পারবেন। দলভুক্ত ব্যক্তিদের সংস্কার, সুবিধা অসুবিধা, কর্মপদ্ধতি নেতার ভালকরে বোঝা প্রয়োজন। এই সংবেদনশীলতা উপযুক্ত লগ্নের জন্য অপেক্ষা করবার মত ধৈর্যশীল করে তোলে।

(৬) গণতন্ত্রের জয়গান করা এক কথা, আর গণতন্ত্রের মূলনীতি প্রতিদিনের জীবনে অনুসরণ করে চলা আর এক কথা। নেতার চালচলন আলাপ-আচরণে গণতন্ত্রের নীতি প্রকাশ পেতে হবে।

(৭) নেতারই প্রথমে নতুন কাজে হাত দেওয়া উচিত। পরিবর্তনের ঘণ্টা তাঁকেই প্রথমে বাজাতে হবে।

(৮) দলের অন্যান্যদের চিন্তার মান ও কর্মের উদ্যম নেতার জ্ঞান-দক্ষতা ও উৎসাহের ওপরে অনেকটা নির্ভর করে।

(৯) যে নেতা সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন, তিনি কখনও উপযুক্ত নেতা হতে পারেন না। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া নেতার একটা বড় দায়িত্ব।

(১০) নেতার সৎ ও চরিত্রবান হওয়া উচিত। মনে ও মুখে তাঁকে এক হতে হবে। আপন চরিত্রবলে ও ব্যক্তিত্বের প্রভায় বিরোধী-শক্তিকে আয়ত্তে রাখতে হবে।

(১১) যে কাজের পেছনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকে না সেকাজে কখনও শক্তি সঞ্চয় হয় না। গভীর আত্মবিশ্বাস একক দাঁড়াবার শক্তি যোগায়। নেতার আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন।

নেতৃত্বের সংকট কি ভাবে দেখা দেয় ?

ক্ষমতার জন্য অস্বাভাবিক লোভ, তর্ক-প্রবণতা, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত ভীতি প্রভৃতি নেতৃত্বের বিঘ্ন ঘটায়।

(২) প্রায়ই দেখা যায়, দলের জনকতক লোক নিষ্ঠার সঙ্গে কোন কাজ করছে আর কিছু লোক বেমালুম এড়িয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত তিনটি কারণে এরকম ঘটে থাকে—(ক) দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলীয় কলহ; (খ) বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি আস্থার অভাব; (গ) ফাঁকিবাজ লোকের অনুপ্রবেশ।

(৩) কর্মীদের ভাল কাজের সময়মত প্রশংসা যখন নেতা করেন না ও স্বীকৃতি দেন না তখন তিনি সাধারনের আস্থা হারান। ভাল কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা সবার মধ্যে কর্মপ্রেরণা এনে দেয়।

(৪) বিরোধী সমালোচনা অনেক নেতা সহ্য করতে পারেন না; কেবল স্তুতি কামনা করেন। নেতার পক্ষে এটা মস্ত ত্রুটি। বিরোধী সমালোচনা সব সময় বিচার করে দেখা উচিত, তার মধ্যে সত্য কতটুকু আছে। প্রকাশ্যে না বলে গোপনে সমালোচনা করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। ক্রোধের সময় কথা না বলাই ভাল। রাগ পড়লে সব বিষয় বিচার-বিবেচনা করে দেখা উচিত। এতে বহু সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(৫) মিথ্যা গুজব রটনা, দলের কাজে অনেক সময় নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নেতার উচিত দলভুক্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত বিষয় জানিয়ে দেওয়া এবং গুজবে যাতে কেউ কান না দেয় সেই চেষ্টা করা।

যোগ্য নেতা চিনবার উপায় ঃ

নেতা কি ধরণের কাজ করছেন, কতটা সময় সাধারণের কাজে ব্যয় করছেন এবং কীভাবে কাজ পরিচালনা করছেন এই তিন দিক থেকে তাঁকে বিচার করা দরকার। সবকাজ এক লোক দিয়ে হয় না। বিশেষ ধরণের কাজের জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজন। বর্তমানে যাঁর হাতে নেতৃত্ব আছে, তিনি বিশেষ গুণের অধিকারী কিনা তা পরখ করে দেখবেন। লাজুক ও আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক এমন বহুব্যক্তি গ্রামে দেখতে পাবেন যাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে। যাঁকে অনেক লোক দলপতিরূপে পেতে চায় এবং যিনি বহুলোকের আস্থাভাজন তিনিই যোগ্য নেতা। সম্প্রসারণ

কর্মীর সব কাজের মধ্যে চেষ্টা থাকবে যাতে যোগ্য নেতা সামনে এগিয়ে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অযোগ্য নেতার প্রভাব ক্রমশ গ্রামে কমে আসে। যিনি সব সময় নতুন কিছু শেখার জন্য আগ্রহী, মনে রাখবেন তার মধ্যে সম্ভাব্য নেতৃত্ব লুকিয়ে আছে।

নেতার যোগ্যতা বাড়াবার উপায় ঃ

সকলে সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না সত্যি, কিন্তু অধ্যবসায়ের সাহায্যে কর্মকুশলতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিধি সকলেই বাড়িয়ে নিতে পারে। অনুকূল বাতাবরণ যোগ্যতা বাড়াবার মস্ত সহায়ক। নীচে তারই দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ—

ক্যাম্প সংগঠন ঃ—বিভিন্ন গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের সল্প-সময়ের জন্য এক জায়গায় জমায়েত করা উচিত। পরস্পরের সংগে পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ মিলবে এই ক্যাম্পে। একাধিক এলাকার নানারকম সমস্যার সম্বন্ধে সকলে ওয়াকিবহাল হবেন, কাজ-কর্মের ধরন জানতে পারবেন। সুপরিকল্পিত ভাবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্পস্থায়ী ক্যাম্প করতে পারলে গ্রামের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রমশ পরিবর্তন আসবে এবং তাতে যোগ্যতা বাড়বে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন ঃ—যে সব অঞ্চলে গঠনমূলক কোন কাজ সাফল্যজনক ভাবে করা সম্ভব হয়েছে, সে সব জায়গায় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ঘুরিয়ে আনা উচিৎ। এতে একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বাড়বে আবার অন্যদিকে নতুন কাজে প্রেরনা আসবে।

অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ঃ—পল্লীর উন্নয়নমূলক কোন কাজে যখন গ্রামবাসী আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন নেতার সামনে এগিয়ে আসা উচিৎ। এই ধরনের অনুকূল পরিবেশে দলপতি কাজের মধ্য দিয়ে সহজেই নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

স্বীকৃতি দান ঃ— সরকারী কর্মচারীরা উন্নয়ন মূলক কাজকর্মে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেব সংগে পরামর্শ করলে তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়বে। পাঁচজনে চিনুক, জানুক ও স্বীকার করুক, মনে মনে প্রত্যেকেই এটা কামনা করে।

গ্রামে নয়া নেতৃত্বের সূচনা ঃ

ভারতের গ্রামগুলি ছিল অনেকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ। সম্বৎসরের খোরাক ও পরিধেয় বস্ত্রসংগ্রহেব কথা চিন্তা করে কৃষকগণ চাষ-আবাদের শস্য নির্বাচন করতো। পুকুরের মাছ, গরুর দুধ ও জমির ফসল এই নিয়ে ছিল পল্লীবাসীর শান্তির নীড়ের কল্পনা। দূর দেশে বেশী কেউ বড় একটা যেতে চাইত না। পথ-ঘাটের যে অবস্থা ছিল তাতে যাওয়াও দুবহ ব্যাপার হতো। পরিবাবগুলি প্রায়ই ছিল যৌথ।

এক সংগে জোটবেঁধে কাজ করাই ছিল রেওয়াজ। খুড়ো, মেশো ভাই, বোন, পাশাপাশি বসে আহারাদি করতো। জাতিভেদের কড়াকড়িতে নিজেকে রপ্ত করে নিতে হতো এবং প্রধানতঃ কুলগত পেশার প্রচলন ছিল। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মাঝখানে সেতুর কাজ করতো কারিগর শ্রেণী। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পঞ্চায়েত পরিষদ ছিল। সাধারণত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কুলপতিদের নিয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠিত হতো। রুজিরোজগার, ধর্মবিশ্বাস, আচারআচরণ, সংস্কার, সামাজিক অনুষ্ঠান সব কিছু প্রত্যাশার ক্ষেত্র ছিল কুল-পঞ্চায়েত ও গ্রামপঞ্চায়েত। গ্রামের নেতৃত্ব করতো পঞ্চায়েত। পরে জমিদার ও তালুকদারগণ জমির মালিক হয়ে বসার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি পঞ্চায়েতের ক্ষমতাকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করে ফেলে। পল্লীবাসী অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা কৃষি হওয়ার ফলে জমিদার ও তার প্রতিভূগণ বিপুল ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী হয়েছিলেন। এইভাবে পল্লীর নেতৃত্ব ক্রমশ

বহুলাংশে জমিদার, বড়জোতদার ও মহাজনের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পল্লীর পুরাতন নেতৃত্বের এই হলো সংক্ষিপ্ত ছবি।

স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারী প্রথার বিলোপ-সাধন করা হয়েছে। জমির ঊর্ধ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জমিদার ও বড় জোতদার এখন শ্রেণী হিসাবে সমাজে প্রভাব হারিয়েছেন। সরকার ও সমবায় ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসবার ফলে মহাজনরাও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার প্রসার, নানারকম কর্মসংস্থানের সুযোগ, সহরগঞ্জের সংখ্যাবৃদ্ধি, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহন. ব্যবস্থায় উন্নতি, বাজারের চাহিদার দিকে নজর রেখে কৃষকদের শস্য নির্বাচন একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন এনেছে। গ্রাম থেকে অনেক যুবক শহর ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা ও রুজির জন্যে চলে যাচ্ছে। জাতিভেদের কঠোরতা দ্রুত কমে আসছে। গোষ্ঠিবন্ধন শিথিল হয়েছে, ফলে কুলপতির প্রভাবও কমেছে। শিক্ষিত লোকের হাতে নেতৃত্ব দেবার এখন ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। প্রগতিশীল কৃষক ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার জন-পতিনিধি নির্বাচনের পথ সুগম করে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা বাড়ছে ; তাঁরাও পঞ্চায়তের কাজে ধীরে ধীরে উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

নেতৃত্বের আসনে বসবার জন্যে নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যেও সাড়া জেগেছে। গ্রামের যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্ব করার সুযোগ এসেছে। শ্রেণীগত নেতৃত্ব ও কুলগত নেতৃত্বের জায়গায় শিক্ষিত ব্যক্তির নেতৃত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নয়া নেতৃত্বের একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় বসুর পরিচালনাধীনে পশ্চিমবঙ্গের আরাম-বাগ শহরের পাশে তিরোল অঞ্চলের হায়দপুর গোলতা ইত্যাদি গ্রামে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করার বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে নয়া নেতৃত্বে এই ইংগিতই পাওয়া গেছে। পুরাতন নেতৃত্ব পরিবর্তনের সংগে তালরেখে আর চলতে পারছে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সম্প্রসারণের পথে বাধাবিঘ্ন

বহু সমস্যা-পীড়িত গ্রাম ঃ

ইউরোপের যে কোন দেশে যান, শহর ও গ্রামের ব্যবধান প্রকট হয়ে নজরে পড়বে না। প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোটামুটি সবকিছুই গ্রামে পাবেন। কৃষকদের সমস্যা সেখানে একটা—কেমন করে ফলন আরো বেশী বাড়াবে এবং ভাল বাজার-দর পাবে। গো-পালন, মুরগী-পালন, ছাগ ও শূকর পালনকে অর্থকরী করে তোলার দিকে তাদের যেমন চিন্তা, তেমনি চেষ্টা। মার্কিন মুলুকে যান, সেই একই কথা। তফাৎ যেটুকু দেখবেন তা হচ্ছে, এখানকার আয়োজন যেমন বিপুল, ফার্মও তেমনি বিরাট। জাপানে চলে আসুন। আমাদেরই মত ছোট ছোট ফার্ম ওদের। এতদিন আমরা গ্রামে বিজ্ঞানকে বর্জন করেছি, ওরা প্রাণদিয়ে বিজ্ঞানকে অর্জন করেছে। তাই গ্রাম থেকে ওরা পালাতে চায় না, গ্রামের মাটিতে সোনা ফলাতে চায়। উৎপাদক শ্রমই যে লক্ষ্মীর জন্মদাতা এটা ওরা ভাল করে বোঝে। গ্রামকে ওরা অবহেলা করেনি।

এবার আমাদের গ্রামের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন, শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। পথ-ঘাট দুর্গম, পানীয় জল অপ্রতুল, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, রুজির বিকল্প কোন পথ খোলা নেই, বহুলোক নিরক্ষর, বহুলোকের গৃহ বাসোপযোগী নয়, বহুলোক চাষ করে কিন্তু জমি নেই—এমনি অসংখ্য সমস্যা আমাদের গ্রাম্য জীবনের মধ্যে জড়িয়ে আছে। অগণিত সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয় সম্প্রসারণ-কর্মীকে। একটার সমাধান কিছুটা করতে না করতে দশটা সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ায়। এত সমস্যা-সঙ্কুল

অবস্থার মধ্যে সম্প্রসারণের কাজ করা খুব দুরূহ ব্যাপার আর তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়াও সুকঠিন।

সমাস্যা অনেক ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি; শ্রেয়কাজে বিঘ্নও অনেক। আমরা পথের বাধাবিঘ্ন সম্বন্ধে যত জানবো, বাধা অতিক্রম করার শক্তি তত আয়ত্ত করতে পারবো। বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার মধ্যেই মানুষের সার্থকতা।

কয়েকটি সমস্যার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। কাজ করতে গিয়ে এগুলো আপনি হামেশা অনুভব করবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভয়ানক ক্রটি :

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্কীমের অর্থমঞ্জুরী কখনও সময়মত দেওয়া হয় না। বছর শেষ হবার আগে একের পর এক মঞ্জুরী এসে জমতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে এত টাকা ব্যয় করা ব্লকের কর্মীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এতে সত্যিকারের কাজ হয় না, কাজের অভিনয় হয়, অর্থের যথেচ্ছ অপচয় ঘটে অথচ সম্প্রসারণের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

সরকারী সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণ-কাজের সহায়ক বড় একটা হচ্ছে না বরং নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। বীজবোনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর উন্নত ধরণের বীজ ব্লকে এসে হাজির হয়। সময়মত চাষীর হাতে অনেক বীজই পৌঁছে দেওয়া যায় না। অঙ্কুর বার হবার হার না দেখেই অনেক সময় চাষীদের মধ্যে বীজ বিতরণ করা হয়। স্প্রেয়ার, ডাস্টার, সেচের পাম্প কাজের সময় অকোজো হয়ে পড়ে থাকে। রোগ ও কীটনাশক দ্রব্য চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যায় না। এই ধরণের অব্যবস্থার জন্য লোকে সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। সম্প্রসারণ কর্মীও নানাভাবে বিব্রত বোধ করছেন।

অনুকূল পরিবেশের অভাব :

Talcott Parsons এর মতে সমষ্টি উন্নয়ন হচ্ছে—'creating situations in which people must act'. সরকার এমন

অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবেন যেখানে পল্লীবাসী উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে উদ্যোগী হবে। দেশের জাতীয় সরকার কল্যাণকর বহু কাজ করছেন সন্দেহ নেই। অনেক পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়েছে, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কৃষির যন্ত্রপাতি এবং রোগ ও কীটনাশক দ্রব্য সরবাহের চেষ্টা চলছে, গ্রামে সমবায়-সমিতি গড়বার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। দেশজুড়ে সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লক খোলা হয়েছে, কৃষি জমির উর্ধসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাল কাজ, তবে এইসব উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকই সর্বতোভাবে সুবিধা পাচ্ছে। ব্লকস্কীমে দরিদ্রদের জন্য করবার কিছু নেই। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বিলি-বন্দোবস্ত এখনও করা হয়নি। সমবায়-সমিতির যা কিছু সুবিধা তা চালাক ও অবস্থাপন্ন চাষীরাই সমস্ত ভোগ করছে। সমাজ-বিজ্ঞানী ডাঃ এ. আর. দেশাই, ডাঃ তারলোক সিং এবং ডাঃ এস. সি. তুবের মতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান গ্রামে কমেনি বরং বেড়েই চলছে।

ভাবতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রদূত Mr. Chaster Bowles আমাদের চাষ-সমস্যাব কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,—"Land inequality is a bottleneck clogging the creative energy of the people; a bottleneck that must be broken and further, Land reform is not a solution, of course; it is the first essential step to agricultural improvement to consolidation of fragmented holdings and to the development of village co-operatives.' অর্থাৎ "অসম ভূমিব্যবস্থা চাষীদের সৃজনীশক্তিকে পদে পদে ব্যাহত করছে, উদ্যমকে

(১) Rural Sociology In India—A. R. Desai পৃঃ—১০৭

দমিয়ে দিচ্ছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই হবে। অবশ্য ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন নয়। জমি চক্‌বন্দী করা ও সমবায় গড়ে তোলার পক্ষে এটা প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় কাজ।" রাষ্ট্রদূতের এই অভিমত সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকতে পারে বলে মনে হয় না। একটা জমিতে দু'টো —সম্ভব হ'লে তিনটে ফসল তোলার কথা আমরা চিন্তা করছি; mixed farming-এর কথা বলছি—এ সব কিছুই সুপরিকল্পিতভাবে সম্ভব হবে না, যদি না জমি চকবন্দী করা যায় এবং পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

সম্প্রসারণের পক্ষে এই অনুকূল পরিবেশ এখনও গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।

আমলামহলের সাবেকী মেজাজ:

অপরের মতকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া গণতন্ত্রের মূল কথা। মন্ত্রীমণ্ডলী ও আমলা মহলের উঁচু কোঠায় এ-বোধ এখনও রপ্ত হয়নি। পদমর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন। উর্ধতন কর্মচারী আদেশ দিবেন কিন্তু পরামর্শ নেবেন না। অধস্তন কর্মচারী নীরবে আদেশ পালন করবেন এবং যথাসময়ে মামুলি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিবেন; ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা ও ক্ষয়-ক্ষতির কথা উল্লেখ করা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। বড় সাহেবই সব কথা বলবেন, অন্যেরা মুখ বুজে সব শুনবে। সরকারী দরবারে বক্তব্য বিষয়-বস্তুটি বড় কথা নয়, কে বললেন এটাই বড় কথা। পুরানো রেওয়াজ ও সাবেকী মেজাজ আজও পুরোদস্তুর চলছে। এই প্রভুত্ব-প্রবণ মনোবৃত্তি গণতন্ত্র-বিরোধী এবং সম্প্রসারন কাজের প্রতিকূল। প্রকৃত সমস্যা এতে সামনে আসে না, চাপা পড়ে। এই পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়ে ব্লক পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী সুস্থ ও স্বাভাবিক মেজাজে সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করবে কি করে? আমলাতন্ত্রের মধ্যে

পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সম্প্রসারণের উপোযোগী কর্মী তৈরী করা যাবে না। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে আস্থার সম্পর্কও উঠবে।

দায়সারা প্রদর্শন ঃ

মাত্র প্রচার-অভিযান বড় একটা কার্যকরী হয় না। নতুন কিছুর প্রবর্তন করতে হলে সেটা চোখের সামনে তুলে ধরে হাতে-কলমে দেখানো দরকার। প্রদর্শনের ওপরে এই কারণেই এত জোর দেওয়া হয়। সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লকের তরফ থেকে যেভাবে প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়ে থাকে, তাতে গ্রামে উৎসাহের কোন সঞ্চার হয় না। ঘুরেফিরে মুষ্টিমেয় লোকের কাছেই গ্রাম সেবকেরা যান; সরকারী যাকিছু সাহায্য তাদের কাছেই পোঁছে দেন। নিজ এলাকার অনেক লোকের সংগে তাঁরা যোগাযোগই রাখেন না। ক'টা কম্পোষ্ট পিট করা হয়েছে, ক'টা ডিমনস্ট্রেশন প্লটের ব্যবস্থা হয়েছে, কত সব্‌জী ও ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে—এই সংখ্যা জানবার দিকেই অফিসারের ঝোঁক।

কিভাবে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, কত টন কম্পোষ্ট সার তৈরী হয়েছে, কত লোক নতুন প্র্যাকটিস গ্রহণ করছে, বিতরণ করা চারার মধ্যে কত বেঁচেছে তার কোন হিসাব চাওয়া হয় না। ব্লক আপিসে কোন তালিকাও নেই। প্রদর্শন সম্বন্ধে কৃষকদের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে সম্প্রসারণের দিক থেকে সেটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কৃষকেরা মনে করে ঃ—

(ক) প্রতি বছর ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া সরকারের একটা মামুলি কাজ।

(খ) ডিমনস্ট্রেশনের জন্য সামান্য একটু জমি ছেড়ে দিলে যদি অর্ধেক মূল্যে সার, বীজ ইত্যাদি পাওয়া যায় সেটা নিয়ে নেওয়া মন্দ কি!

(গ) গ্রামসেবক বাবুদের অনুরোধ অনেক সময় এড়ানো যায় না, কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছুটা জমি ডিমনস্ট্রেশনের জন্যে ছেড়ে দিতে হয়।

অত্যন্ত যত্নের সংগে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রদর্শনের আয়োজন না করলে ডিমনস্ট্রেশনের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ডিমনস্ট্রেশন একবার দেওয়া হয়ে গেলেই কাজ ফুরিয়ে যায় না। চাষীর সংগে সংযোগ বজায় রাখতে হয়।

(৫) উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব :

জনদরদী নেতা গ্রামে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে যোল আনা নজর, এমন লোকই অধিকাংশ গ্রামে নেতৃত্ব করছে। পরস্পর মিলেমিশে পল্লীর পুনর্গঠন করার দিকে নেতার দৃষ্টি নেই। প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ নেতা আর করেন না। নেতাদের ওপরে কেউ আর ভরসা করতে পারছে না। স্বার্থসন্ধানী নেতার সংগে থেকে কেউ নির্ভরযোগ্য নেতা গড়ে উঠবার তালিমও পাচ্ছে না। নেতৃত্বের আসনে অসীন ব্যক্তিদের সংগে একদিকে সংযোগ রাখা, আবার অপরদিকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলা বেশ কঠিন কাজ। যে সকল প্রগতিশীল চাষী নতুন ধরণের বা উন্নত ধারায় চাষ প্রবর্তন করছেন, দেখা যাচ্ছে গ্রামের নেতৃত্ব তাঁদের হাতে নেই। সম্প্রসারণ-কর্মীর পক্ষে এটাও একটা মস্ত বড় সমস্যা। কারণ, যিনি নেতা, তিনি চাষবাসে হয়তো তেমন উৎসাহী নন। পঞ্চায়েতে বা সমবায়ে যোগ্য নেতা নির্বাচিত না হলে সম্প্রসারণের কাজ করা খুব মুশকিল।

(৬) গ্রামে সংগঠনীর অভাব :

আগে গ্রামে বেশ আঁট ছিল। কোন বিপদে আপদে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পঞ্চায়েতের অধীনে এক হয়ে দাঁড়াত। এখন রুজি-রোজগারের ধরণ বদলে গেছে। পুরাতন সংঘ-জীবন শিথিল হয়েছে

অথচ নতুন সংগঠন এখনও তেমন গড়ে উঠছে না। গ্রামে গ্রামে যে পঞ্চায়েত নির্বাচিত হচ্ছে, তার মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম্য দলাদলির পীঠস্থানরূপেই আত্মপ্রকাশ করছে। উৎপাদন বিপনন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় আজ যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার সংগে মোকাবিলা করতে হলে জোটবদ্ধ হয়ে রোক করে নামতে হবে, তাছাড়া ধনপতির শোষণের হাত হতে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু শক্তিশালী সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সক্রিয় লোকসংস্থা গ্রামে গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ পদে পদে ব্যাহত হবে। স্কুল, পঞ্চায়েত ও সমবায় এই তিনটি গ্রামের মূল ভিত্তি হয়ে উঠুক—সম্প্রসারণ-কর্মী সেই চেষ্টাই করবেন।

নিরক্ষরতা ঃ

ভারতের অধিকাংশ গ্রামবাসী আজও নিরক্ষর। নিরক্ষরতার ফলে নানাভাবে তাদের ঠকতে হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখার পরে অর্থভাবের দরুণ বহু বাপমাই ছেলেমেয়েদের আর পড়াতে পারেন না। কাজেই মুখে বলা এবং প্রদর্শনের সাহায্যে দেখানোর মধ্যেই সম্প্রসারণ-কর্মীকে সবকিছু সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। বই ও পত্রিকা থেকে জ্ঞান আহরণের পথ গ্রামবাসীর কাছে এখনও উন্মুক্ত হয়নি। এই সমস্যা ইউরোপ ও অমেরিকায় নেই। পত্রিকা ও বই থেকে কৃষকরা সেখানে অনেক সংবাদ আহরণ করে। নিরক্ষরতার ও শিক্ষার নিম্নমান আমাদের দেশ সম্প্রসারণের পথে একটা বড় বাধা।

পল্লীবাসীর মনোবৃত্তি ঃ

সরকার কৃষি ও সমবায়-বিভাগের মাধ্যমে লোন, সাবসিডি, গ্রাণ্ট ইত্যাদি নানাভাবে গ্রামে অর্থ সাহায্য করছেন। গ্রাম-বাসীদের অনেকেই টাকা নিতে হাত বাড়ায় কিন্তু শোধ দিতে

এগিয়ে আসে না। সরকারের টাকা যে জনসাধারণের টাকা এ-বোধ তীব্র হয়ে তাদের মনে গেঁথে যায়নি। ঋণের টাকা সময়মত পরিশোধ না করলে যে বারান্তরে আর পাওয়া যাবে না—এ কথা তারা খেয়াল রাখে না। যে উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া সেই বিষয়েই যে ব্যয় করা দরকার তা তারা বুঝেও বোঝে না। এ মনোবৃত্তির জন্যে সম্প্রসারণ-কর্মী সাহস করে কোন স্কীম নিয়ে এগিয়ে যেতে ভয় পান। গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে সুবিবেচনা ও সমদৃষ্টির পরিচয় এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

সমাজ সেবার যাবতীয় দায়িত্ব সরকারের, জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলের যেন এ-বিষয় এখন আর কোন করণীয় নেই—স্বাধীনতার পরে এই মনোভাব সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। গ্রাম্য নেতারা সরকারী কর্মচারীদের সমালোচনা করে থাকেন অথচ জনকল্যাণ-মূলক কাজের দায়িত্ব নিতে চান না, নিলেও আন্তরিকতার পরিচয় দেন না।

গ্রাম্য দলাদলি :

অধিকাংশ গ্রামই এখন ছোট ছোট বিবাদমান দলে বিভক্ত। মামলা মোকর্দমা ও দলাদলি গ্রামের প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। অন্ধ গোষ্ঠী-প্রীতি দল-প্রীতি ও সম্প্রদায়-প্রীতি, মাঝে মাঝে গ্রামে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ফলে গ্রামের জন্য ভাবনা ও গ্রাম-প্রীতি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম্য দলাদলি গ্রাম-উন্নয়ন কাজের পথে একটা প্রধান অন্তরায়। এই সর্বনাশা দলাদলি যাতে কমিয়ে আনা যায় সম্প্রসারণ-কর্মীকে নিরন্তর সে চেষ্টা করে যেতে হবে। গ্রামের বিবাদ মহকুমা বা জেলার কোর্টে যাতে না যায়, সম্প্রসারণ-কর্মীকে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রতি গ্রামবাসীর আস্থাহীনতা :

বৃটিশ আমলে সরকারী কর্মচারীদের গ্রামবাসীরা ভীতি ও আতঙ্কের চোখে দেখতো। স্বাধীনতার পরে ভীতি কেটে গেছে বটে, কিন্তু

অফিসার ও সম্প্রসারণ-কর্মী পল্লীবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন নি। তাদের ধারনা জন্মেছে সত্যিকারের কাজ করতে সম্প্রসারণ-কর্মীরা গ্রামে আসেন না। চাকরী বজায় রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা স্কীম নিয়ে হাজির হন। উর্ধতন অফিসারকে তুষ্ট করার দিকেই তাঁদের নজর থাকে বেশী। প্রতিশ্রুতি প্রায়ই তাঁরা রাখতে পারেন না।

বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক গ্রামবাসী ভাল জানে না। সরকাবের প্রতিনিধি হিসাবে তারা সম্প্রসারণ-কর্মীকে পায়। তাঁর কাছে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে, সমস্যার কথা জানায় এবং পেতে চায় সরকারের সাহায্য। কাজেই বিভিন্ন স্কীম সম্বন্ধে গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদের অবহিত থাকা উচিত। গ্রামবাসীর আস্থাভাজন হওয়া তাঁদের প্রথম দরকার।

গ্রামবাসীর প্রতি সম্প্রসারণ-কর্মীর আস্থাহীনতা ঃ

অধিকাংশ গ্রামবাসী নিরক্ষর বলে সম্প্রসারণ-কর্মীদের অনেকে মনে করেন তারা অজ্ঞ, ভালমত প্ল্যান করে কাজ করতে জানে না, সময়মত সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। আর প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের অনুভূতি কম। কোন পথে তাদের কল্যাণ হবে সেটা শহরবাসী শিক্ষিতরাই বলে দিতে পারেন। আমরা ভুলে যাই, যে পেশায় তারা বংশানুক্রমিক ভাবে নিযুক্ত আছে তাতে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সামাজিক কাজকর্মে সুবিবেচনার সুন্দর পরিচয় তারা দিয়ে থাকে। যোগ্যতার বিচারে গ্রামবাসী যে শিক্ষিত শহরবাসীর তুলনায় কোন অংশে কম নয় এই বোধ প্রত্যেক সম্প্রসারণ-কর্মীর থাকা উচিত। সুযোগ পেলে শিক্ষিতও তারা হতে পারতো। নিজ এলকায় ভূমির উর্বরতা, ফসলের ধরণ, ফলনের ধরণ, ফলনের পরিমাণ, সেচের সমস্যা, বন্যার প্রকোপ, বেচাকেনার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তারা মোটামুটি ভালই জানে।

তারা যে অজ্ঞ নয় এটা বিশেষভাবে সম্প্রসারণ-কর্মীর মনে রাখা উচিত। কঠিন জীবন-সংগ্রামে তারা যে ভাবে টিকে আছে, মারি নিয়ে নানারকম অসুবিধা ভোগ করছে, তা প্রত্যেক কর্মীর ভেবে দেখা উচিত। চোখ ও মন খোলা রেখে দেখলে, তাদের মধ্যে থেকে অনেক সদ্‌গুণ ও সৎবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

জনসংযোগের সমস্যা ঃ

জনসংযোগের কথা ইদানিং খুব বলা হচ্ছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী জনসাধারণের সংগে বেশী মাখামাখি করলে, স্থানীয় দলাদলি ও কলহ বিবাদে কোন পক্ষভুক্ত হয়ে পরার সম্ভাবনা। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একবার গড়ে উঠলে, নিরপেক্ষ থাকা খুব কঠিন হয়। যার সংগে বন্ধুত্ব হবে, স্বভাবতই তার দল ও গোষ্ঠির সংগেও হৃদ্যতা জমে উঠবে। কোন-না-কোন দলভুক্ত হয়ে পড়ার আশংকা অমূলক নয়। সম্প্রসারণ-কর্মীর জনসহযোগিতা নিশ্চয় চাই, তাই বলে কারো সংগে অতিরিক্ত মেলামেশা করা ঠিক হবে না। সকলের সংগে যতদূর সম্ভব সহানুভূতিশীল ও সুন্দর আচরণ করা উচিত। যেখানে নাগরিক বোধ কম, সমাজ চেতনা দুর্বল, সেখানে জন-সংযোগের কাজ খুব কঠিন। সম্প্রসারণ-কর্মীকে এই সমস্যার সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয়।

সম্প্রসারণ কাজের পথে এমনিতর বহু বাধা-বিপত্তি ঘটছে, আরো হয়তো ঘটবে। কাজটি তো সহজ নয়। নিষ্ঠার সংগে লেগে থাকতে হবে। নিজের ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিছক প্রচারে সম্প্রসারণ হয় না সম্প্রসারণ শিক্ষাদান শ্রেষ্ঠদান। জাতিগঠনের কাজে, সুনাগরিক গড়ে তোলার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর উপায় আর নেই।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. Planning In India—V. T. Krishnamachari.
2. Community Development In India— „
3. Fundamentals of Planning in India— „
4. Community Development In India—B. Mukharjee.
5. A Guide to Community Development—Ministry of Community Development and Co-operation, Govt. of India.
6. Community Development Programme : Third Five Years Plan 1961. „
7. Revised Programme of Community Development— „
8. Community Development of at Glance— „
9. India's Changing Villages—S. C. Dube
10. The Silent Revolution—B. Rambhai.
11. Pilot Project In India (The Story of Rural Development at Etawah, Uttar Pradesh)—Albert Mayer.
12. Agricultural Production Since Independence—Ministry of Food & Agriculture, Govt. of India.
13. The Changing Pattern of Agricultural Extension In West Bengal—Santi Priya Bose.
14. পল্লী-প্রকৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
15. স্বদেশী সমাজ— „ „
16. রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
17. বাংলার লোক-সাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
18. Social Welfare In India—The Publication Division, Govt. of India.
19. Towards A Welfare State—The Directorate of Extension Training Govt. of India.

20. Community Development— S. K. Dey.

21. Panchayat-i-Raj— „

22. Indian Population Problem—Dr. S. Chandrasekhar. A. I. C. C. Economic Review : Vol. XIV No. 8. Sept, 7, '62.

23. Some Thoughts On Agricultural Extension Methods And Community Development Programmes InIndia—Department of Agriculture in Mysore Information, Booklet No. 6.

24. Notes On Extension In Agriculture—Ivan G. Fay

25. Building Our Villages—M. K. Gandhi.

26. They Showed The Way—S. N. Bhattacharjee.

27. বুনিয়াদী শিক্ষাদ্বারা বিপ্লবাত্মক সমাজসেবা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

28. গান্ধীমত ও পথ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

29. বুনিয়াদী শিক্ষার কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত।

30. Manual on Community Development Programme—Development. Department, Govt. of West Bengal.

31. Second Five Years Plan—Govt. of India.

32. Third Five Years Plan— „

33. Extension Education In Community Development—Directorate of Extension, Ministry of Food & Agriculture, Govt. of India.

34. Agricultural Extension & Community Development—Prof. J. S. Garg.

35. The Scope of Extension—National Institute of Community Development, Govt. of India.

36. Gaon Sathi—Experiment In Extension.

37. Co-operative Extension Work—Lincoln David Kelsey and Cannon Chiles Hearne.

38. Extension For Extension Worker—Earl I. Bacon.

39. Extension Teaching Methods—Meredith C. Wilson and Gladys Gallup.

40. Methods and Programme Planning in Rural Extension —Edited by J. M. A. Penders.

41. Report On International Development Centre On Methods and Programme Planning in Rural Extension —Wagenin, The Netherlands, July 10—Aug 7. 1956 —George R. Puckett T. E. M. Advision.

42. Farm Production Plan—Dr. G. D. Agrawal, Directorate of Economics & Statistics, Ministry of Food & Agriculture, New Delhi.

43. Guide for Village Worker—Ministry of Food and Agriculture & The Community Projects Administration in Co operation with Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, June 1955

44. How to Conduct Result Demonstration
45. The Method Demonstration
46. How to Achieve Group Action—
47. All India Work Seminar Report, Hydrabad July 13-24, 195৯.

(44–47) Indo-American Technical Co-operation Programme. Pamphlet No. 11. 12. 13.

48. খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কাজে গ্রাম সেবকের হাতবই—পশ্চিম বঙ্গ সরকার

49. গ্রামসেবকের হাতবই— „ „

50. Summary Records—Extension Education Institute, Nilokheri, Punjab.

51. Agricultural Extension—C. W. Chang, FAO Regional Agricultural Adviser for Asia and the Far East. The National Agricultural Extension Training Centre Pyinmana, Burma, 13th. April to 20th May, 1961.

52. Extension Education—Why and How (an article)— J. Paul Leagans, In the Journal Extension, Quarterly Supplement. September, 1960.

53. A Hand Book of Audio-Visual Aids—Bibhuti Bhusan Mohanti.

54. Using Visuals In Agricultural Extension Programme—United States International Co-operation Administration.

55. The Multiplier Hand book—International Co-operation Administration.

56. Report of the European Seminar on Evaluation of Home Economics Extension Programme—Vienna, Austria 9 to 21 May, 1960. Food and Agriculture Organisation of United Nations.

57. Six Keys to Evaluating Extension Work—United States Department of Agriculture Federal Extension Work, Pp-371, Nov. 1958.

58. Extension Evaluation—Allahabad Agricultural Institute.

59. The Innovator, Research Bulletin No 1—Satadal Das Gupta.

60. The Adoption Process, Extension Bulletin No 1—Santi Priya Bose & Satadal Das Gupta.

61. Eadpur—A West Bengal Village-Research Bulletin—Santi Priya Bose. Department of Agriculture, Govt. of West Bengal.

62. Training Manual for Village Level Workers—Dr. Jack Grey, Government of West Bengal, Development Department.

63. Rural Community Organisation—Dwight Sanderson and Rebert A. Polson.

64. Group Organisation And Leadership In Rural Life—Lawrence Happle.

65. How to be a Modern Leader—Lawrence K. Frank.

66. Leadership And Dynamic Group Action—Beal Bohlen Raudabaugh.

67. Rural Sociology In India—A. R. Desai.

68. Diffusion of Innovations - Everell M. Rogers.

69. The Village Development Plan—Its Preparation and Execution—The Development and Panchayet Departments, Government of Punjab.

70. গ্রামসেবকের চিঠি—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা।

71. Extension In Asia—No. 7. May 1961—FAO.

ভ্রম-সংশোধন

৪ পৃঃ ১৭ লাইনে '২৫ কোটি ২ লক্ষ' স্থলে **'২৫ কোটি ২০ লক্ষ'**; ২০ লাইনে '৪৩ কোটি' স্থলে **'৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ'**; ২২ ও ২৩ লাইনে '৬৩ কোটি ৮ লক্ষ' স্থলে **'৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ'** এবং ৩০ লাইনে '১,২২১,০০০ বর্গমাইল স্থলে **'১,১৭৮, ৯৯৭ বর্গমাইল'** হবে।

১৩ পৃঃ ২৩ লাইনে 'তার' জায়গায় **'আর'** হবে।

১৭ পৃঃ চার্টের ৩য় লাইনে **ক**, ৪র্থ ও ৫ম লাইনে **খ**, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম লাইনে যথাক্রমে **গ, ঘ, ঙ** ও **চ** বসাতে হবে।

১৮ পৃঃ তৃতীয় লাইনের শেষে 'কৃষির উন্নতি' স্থলে **'কৃষির উন্নতির'** হবে।

পঞ্চম লাইনের স্বরুতে 'শেষে'র জায়গায় **'মধ্যে'** হবে।

বাইশ লাইনে ০˙৩ মি. কিলো ওয়াটের আগে **'পরিমাণ'** শব্দটি বসবে।

২১ পৃঃ দ্বিতীয় কলমে ১ম ও ২য় লাইনে '৩০-৬৬০' স্থানে **'৩০-৬-৬০'** হবে।

চতুর্থ কলমে ৭ম লাইনে '১˙৪' এর জায়গায় **'১˙৪৯'** হবে।

চতুর্থ কলমে ২১ লাইনে '৪২˙৬৯' এর জায়গায় **'৪২˙৯৬' হবে।**

২২ পৃঃ ১৮ লাইনে 'বর্গমাইল' স্থলে কেবল **'মাইল'** হবে।

২৩ পৃঃ ৬ লাইনে '১৬˙৯' স্থানে **'১৬৪৯'** হবে।

১৬ লাইনে 'পরিমাণ' স্থানে **'পরিমাপ'** হবে।

২৪ পৃঃ Foot note-এর "দৈনিক আনন্দবাজার.........in India" অংশটুকু **'১৯ পৃষ্ঠার'** foot note যাবে।

২৫ পৃঃ ১৯ লাইনে 'Ministers'-এর স্থানে **'Ministries'** হবে।

২০ লাইনে 'Government'-এর স্থানে **Governments** হবে।

২৬ পৃঃ ১৩ লাইনে 'এই' স্থানে **'এর'** হবে।

২৭ পৃঃ ২১ লাইনে 'কংসকার' স্থানে **'কাংসকার'** হবে।

৩১ পৃঃ ৬ লাইনে 'বিপণ-ব্যবস্থা' স্থানে **'বিপনন-ব্যবস্থা'** হবে।

৭ম লাইনের শেষে 'কিন্তু' স্থানে **'কাজেই'** হবে।

৩২ পৃঃ ১ম লাইনে 'আবরণ' স্থানে **'আচরণ'** হবে।

৩৪ পৃঃ ৯ লাইনে 'অপ্রাতীকর' স্থানে **'অপ্রীতিকর'** হবে।

৪৩ পৃঃ ২৪ লাইনে **'ভরিদাবাদ'** স্থানে **'ফরিদাবাদ'** (ভ স্থানে ফ) এবং ২৭ লাইনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-র পরে **'মাননীয়'** এবং এস. কে. দে-র পরে **'মহাশয়'** কথাটি বসবে।

৪৬ পৃঃ ২৫ লাইনে এলাকাকে-র পরে 'তিনটি ব্লকে ভাগ করা হয়'। কথাটি বসিবে।

৯৬ পৃঃ শেষ অংশ শব্দগুলির সন্নিবেশ ভুল ভাবে হয়েছে। সঠিক পদ্ধতি হবে Attention (দৃষ্টি আকর্ষণ); Interest (আগ্রহ); Desire (আকাঙ্খা); Conviction (প্রত্যয়) Action (কর্ম) ; Satisfaction (তৃপ্তি)।

১১০ পৃঃ ১৫ লাইনে "rarly" স্থানে "Early" হবে।

১১৩ পৃঃ পৃষ্ঠা শুরুতেই কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে।

ছাড় অংশটুকু এই—"চীনদেশের উকিয়াং জেলায় উন্নত জাতের তুলোর চাষ প্রবর্তনের কাহিনীঃ ১৯২১ সালের বসন্ত কাল। নানকিং ইউনিভারসিটির কৃষি কলেজেব দুটি বয়স্ক ছাত্রকে কুড়ি মাইল দূরে উকিয়াং জেলায় একবার পাঠান হয়। ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত উকিয়াং জেলার প্রধান চাষ তুলা। দুই ব্যাগ উন্নত-জাতের আমেরিকান তুলার বীজ এই…………"

১২১ পৃঃ ১২ লাইনে চিনে 'দেন' স্থানে চিনে **'নেন'** হবে।

১৩৮ পৃঃ ৫ম লাইনে 'পরিকল্পিত হয়ে' স্থানে **'সুপরিকল্পিত ভাবে'** হবে।

১৪২ পৃঃ ৫ম লাইনে 'সন্দেহ কেটে' স্থানে **'সন্দেহ কাটে'** এবং ১০ লাইনে 'গপে' স্থানে **গ্রুপে** হবে।

১৪৭ পৃঃ ৬ লাইনে 'বঠক' স্থানে **'বৈঠক'** হবে।

১৫৯ পৃঃ ১৯ লাইনে 'বীজ শোষণ' স্থানে **'বীজ শোধন'** হবে।

১৭২ পৃঃ 'Project' স্থানে **'Projector'** হবে।